নুড়িপাথরের
দিনগুলি
প্রচেতগুপ্ত

নুড়ি পাথরের দিনগুলি

প্রচেত গুপ্ত

boierpathshala.blogspot.com

নুড়ি পাথরের দিনগুলি

প্রচেত গুপ্ত

boierpathshala.blogspot.com

নুড়ি পাথরের দিনগুলি

প্রচেত গুপ্ত

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

আহিরীর মাথা গরম। যত সময় যাচ্ছে সেই গরম ভাব বাড়ছে। এখন দশটা বেজে চল্লিশ মিনিট। সকাল থেকে এই নিয়ে মোট তিন দফায় আহিরীকে মাথা গরম করতে হল। আহিরীর মনে হচ্ছে, এই ভাবে চলতে থাকলে বিকেলের দিকে তার মাথা থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরোলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। সুতরাং যা করবার বিকেলের আগেই করতে হবে। শর্মিষ্ঠা দত্তর ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকতে হবে। তিনি যদি বলেন, "আহিরী, একটু পরে এস। আমি একটা জরুরি কাজের মধ্যে রয়েছি। তুমি বরং বিকেলের দিকে এস," তখন

boierpathshala.blogspot.com

বলতে হবে, “সরি ম্যাডাম। বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না। আমার কথা আপনাকে এখনই শুনতে হবে।”

কটকটে রোদের মধ্যেই গাড়ি পার্ক করল আহিরী। পার্ক করতে বেশ অসুবিধে হল। বার কয়েক আগুপিছু না করে জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। গাড়ি থেকে বেরিয়ে সানগ্লাস খুলে গাড়ির দিকে তাকাল আহিরী। গাড়ির আদ্ধেকটা রোদে রয়ে গেছে। লাল টুকটুকে এই গাড়ি তার অতি পছন্দের। কলেজে চাকরি পাওয়ার পর কিনেছে। ব্যাঙ্ক লোন নিয়েছে। কমলেশ রায় মেয়েকে বলেছিলেন, দরকার হলে তিনি ডাউন পেমেন্টের সাপোর্ট দিতে পারেন। আহিরীর দরকার হয়নি। সে নিজের অ্যাকাউন্ট থেকেই দিয়েছে। কমলেশ রায় বললেন, “ভেরি গুড। নিজের উপার্জনে কেনা গাড়ি কনফিডেন্সে থাকে। যা বলবি শুনবে।”

আহিরী মিটিমিটি হেসে বলেছিল, “কী রকম কনফিডেন্স?”

কমলেশ রায় সিরিয়াস মুখ করে বললেন, “এই ধর, মাঝপথে তেল ফুরিয়ে গেল, সে কিন্তু থামবে না। ঠিক কাছাকাছি কোনও পেট্রল পাম্পে তোকে নিয়ে যাবে। অন্য কারও গাড়ি হলে এই সুবিধেটা পেতিস না, তেল ফিনিশ, তার ছোটাছুটিও ফিনিশ।”

আহিরী হেসে বলে, “উফ বাবা, তুমি না একটা যা–তা। আমি ভাবলাম কী না কী বলবে। তেল ফুরোলে গাড়ি চলে?”

কমলেশ রায় বলেন, “আলবাত চলে, ভালবাসা থাকলেই চলে। গাড়ি তো কোন ছাড়, দুনিয়ায় কত কিছু ভালবাসা দিয়ে চালিয়ে দেওয়া যায় তার ঠিক আছে?”

boierpathshala.blogspot.com

গাড়িটা সত্যি আহিরীর খুব প্রিয়। সেই গাড়িকে রোদ খেতে দেখে আহিরীর মেজাজ আরও বিগড়োল। গাড়ি লক করে ইট-বাঁধানো পথ ধরে হঁাটতে লাগল সে। এই সুন্দর দেখতে মেয়েটির মুখের দিকে তাকালে এখন মনে হবে, কঁাচা আমের শরবত ভেবে ভুল করে সে খানিকটা নিমপাতার রস খেয়ে ফেলেছে। সেই কারণে চোখ মুখ কুঁচকে আছে।

চোখমুখ কঁুচকে থাকলেও আহিরী রায়কে সুন্দর দেখাচ্ছে। কে বলবে, বয়স তিরিশ শেষ হতে চলল? হঠাৎ দেখে এখনও ইউনিভার্সিটির ছাত্রী বলে ভুল হতে পারে। সে স্লিম এবং লম্বা। গড়পড়তা বাঙালি মেয়ের থেকে একটু বেশিই লম্বা। গায়ের রঙ ক্যাটক্যাটে ফরসা নয়, আবার কালোও নয়। তামাটে ভাব রয়েছে। তার মায়ের মতো। এ সবের থেকে বড় কথা, চোখ বুদ্ধিদীপ্ত, ঝকঝকে। লম্বা গলা, তীক্ষ্ণ মুখে জেদ আর তেজ দু'টোই রয়েছে। এ ধরনের রূপে কমনীয়তা কম থাকবার কথা। আহিরীর বেলায় ঘটনা উলটো। তার উপস্থিতির মধ্যে এক ধরনের স্নিগ্ধতা রয়েছে। হালকা কিছু যোগব্যায়াম ছাড়া আহিরী এক্সারসাইজ বিশেষ কিছু করে না। এক বার জিমে ভর্তি হয়েছিল, বেশি দিন টানতে পারেনি। নিয়ম করে যাওয়া খুব কঠিন। প্রথমে সকালে ক'দিন গেল। ক'দিন পরে ঘুমই ভাঙত না। তার পর বিকেলের শিফট নিল। তাও হল না। কোনও না কোনও কাজে আটকে যায়। আহিরী রূপচর্চাতেও নেই। রাতে শোওয়ার সময় নাইট ক্রিম আর বিয়েবাড়িটাড়ি থাকলে এক বার পার্লারে ঢু মেরে আসা। ব্যস, তার 'রূপ-লাবণ্যের রহস্য' এখানেই শেষ। তার পরেও অনেকে মনে করে, এই মেয়ে মুখে যাই বলুক, শরীরের জন্য অনেকটা সময় খরচ করে। এ সব কথায় আহিরী মাথা ঘামায় না।

boierpathshala.blogspot.com

এ দিক থেকে কলেজের মেন বিল্ডিং-এ ঢুকতে হলে একটা হাফ সার্কল পাক দিতে হয়। তার পর কলেজে ওঠার চওড়া সিঁড়ি। কলেজ কম্পাউন্ডের ভিতরে জায়গা অনেকটা। বেশিটাই নেড়া। লন একটা আছে বটে, কিন্তু সেখানে ঘাসের থেকে আগাছা বেশি। ইট–পাথর, ছোটখাটো গর্ত-টর্তও রয়েছে। একটা সময়ে বাগান করা হত। এখন সে পাট চুকেছে। কলকাতায় এতটা জায়গা নিয়ে কলেজ খুব বেশি নেই। বাউন্ডারির বাইরে খেলার মাঠটাও বড়। পুরনো কলেজ বলেই এত বড় কম্পাউন্ড।

মুখে রোদ পড়ছে। আহিরী কপালের কাছে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করল। কলেজ কম্পাউন্ডে ঢুকে পড়লে সে আর সানগ্লাস পরে না। ছেলেমেয়েরা থাকে। হয়তো ভাববে, ম্যাডাম ফ্যাশন করছে। শাড়ি আর সালোয়ারেও এক ধরনের পার্সোনালিটি মেনটেন করতে হয়। আহিরীর মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, প্যান্ট-শার্ট পরে আসতে। অনেক সুবিধে, কমফর্টেবলও। চটপট তৈরি হওয়া যায়। কত পেশাতেই তো মেয়েরা শার্ট, প্যান্ট পরছে। টিচাররা পারবে না কেন? আহিরী ঠিক করেছে, এক দিন প্যান্ট-শার্ট পরে দেখবে রিঅ্যাকশন কী হয়। সবে একটা বছর হয়েছে। আরও ক'টা দিন যাক।

এই এক বছরে আহিরী ছাত্রছাত্রীদের কাছে খুবই পছন্দের হয়ে উঠেছে। তার বেশ কয়েকটা কারণও আছে। সব থেকে বড় কারণ হল, সে পড়াচ্ছে খুবই ভাল। আহিরীর নিজেরও ধারণা ছিল না, এতটা ভাল পারবে। বরং একটু ভয়ে ভয়েই ছিল। বড় কলেজ, অনেক ছেলেমেয়ে। এর আগে পার্ট টাইম যেখানে পড়িয়েছে, সেই কলেজ এর তুলনায় কিছুই নয়। কলকাতা শহরের মধ্যেও ছিল না। ট্রেনে করে যেতে হত। সেখানে ছোট ক্লাস। ম্যানেজ করাও সহজ ছিল। মেয়েরাও পরীক্ষা পাশ করার মতো নোটস পেলেই সন্তুষ্ট থাকত।

boierpathshala.blogspot.com

এখানে গোড়ার দিকে ফঁাকিবাজ ছেলেমেয়েরা তার ক্লাসে ঢুকত না, এখন তারাও ক্লাস করতে চাইছে। কেউ চাইলে ক্লাসের পরেও পড়া বুঝিয়ে দেয় আহিরী। অনেকে স্পেশাল নোটস চায়, নতুন নতুন রেফারেন্স বইয়ের নাম চায়। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আহিরী মেশেও সহজ ভাবে। কলেজের বড় অকেশনে তো বটেই, ছেলেমেয়েরা ছোটখাটো কিছুতে ডাকলেও গিয়ে বসে থাকে। এই তো ক'দিন আগে ডিপার্টমেন্টে ডিবেট হল। আহিরী জাজ হয়েছিল। ডিবেটের মোশনও ঠিক করে দিয়েছিল। বুক নয়, ফেসবুক। খুব হইহই হল। 'আহিরী ম্যাডাম'-এর বয়স তুলনামূলক ভাবে অন্য টিচারদের থেকে কম বলে ছেলেমেয়েরা তার কাছে হয়তো বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে। সব মিলিয়ে এক ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে।

স্বাভাবিক ভাবে উলটো ফলও হয়েছে। কিছু কলিগ আহিরীকে হিংসে করে। আড়ালে বলছে, "নতুন তো, তাই বেশি ফরফরানি। গোত্তা খেয়ে পড়লে বুঝবে। এ রকম কত দেখলাম!" নানা রকম বাঁকা কথা। সামনেও এটাসেটা মন্তব্য। এরা বেশির ভাগই সিনিয়র। কেউ কেউ আবার কলেজের মাতব্বর। আহিরী না শোনার ভান করত। এত অল্প দিনে কিছু বলা ঠিক নয়। তবে গত মাসে আর নিজেকে সামলাতে পারেনি। সে দিন টিচার্স রুমে দুম করে কেমিস্ট্রির প্রফেসর অর্কপ্রভ সেন বলে বসলেন, "আহিরী, তুমি না কি কাল স্টুডেন্টস ক্যান্টিনে গিয়েছিলে?"

দু–এক জন পার্ট-টাইমার বাদ দিলে আহিরী অধ্যাপকদের মধ্যে সবার থেকে ছোট। অধিকাংশই তাকে 'তুমি' সম্বোধন করে। অর্কপ্রভ সেনের ষাট বছর হতে দেরি নেই। টিচার্স কাউন্সিলের মাথা। সব ব্যাপারে ওস্তাদি। শোনা যায়, টিচার ইন চার্জের সঙ্গে সঁাট আছে। আড়াল থেকে অনেকটাই

boierpathshala.blogspot.com

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কন্ট্রোল করেন। সে দিন ভদ্রলোকের প্রশ্নের মধ্যে এক ধরনের শাসনের ভঙ্গি ছিল। এর আগেও উনি গার্জেনগিরি করেছেন। অনেকের ওপরেই করেন। তারা ভয়ে চুপ করে থাকে। আহিরীর কোনও দিনই পছন্দ হয়নি। তার পরেও কিছু বলেনি। সহ্য করেছে। সে দিন আর পারল না। উত্তর দিয়ে বসল।

"স্যর, শুধু কাল তো নয়, আমি এর আগেও ওখানে গিয়েছি। মাঝেই মাঝেই যাই।"

অর্কপ্রভ সেন ভুরু কঁুচকে বললেন, "তাই না কি! কেন যাও জানতে পারি?"

আহিরী হেসে বলল, "স্টুডেন্টস ক্যান্টিনে চা–টা খুব ভাল। ছেলেমেয়েদের হুজ্জুতির ভয়ে বোধহয় ভাল করে বানায়।"

অর্কপ্রভ ভুরু তুলে বললেন, "টিচার্স রুমের চায়ের থেকেও ভাল? স্ট্রেঞ্জ! যাই হোক, হতে পারে, তা বলে তুমি চা খেতে ছাত্রদের ক্যান্টিনে গিয়ে বসবে? মাধবকে বললেই তো সে এনে দিত। আমরা সকলেই নাহয় খেয়ে দেখতাম। নো নো, ওদের ক্যান্টিনে যাওয়াটা তোমার ঠিক হয়নি আহিরী। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে টিচারকে একটা ডিসটেন্স মেনটেন করতে হয়। নইলে ওরা মাথায় চেপে বসে। তা ছাড়া... তা ছাড়া এখনকার ছেলেমেয়েরা অ্যাগ্রেসিভ ইন নেচার, বিশেষ করে কলকাতা শহরের ছেলেমেয়েরা। কথায় কথায় স্ল্যাং ইউজ করাটা এদের কাছে কোনও ব্যাপার না। শিক্ষকদের সম্মান কী ভাবে দিতে হয় জানে না, জানতে চায়ও না। ছেলেমেয়েরা কী ভাবে মেলামেশা করে দেখো না? কম্পাউন্ডের ভিতর ঘাড়ে হাত দিয়ে, কোমরে হাত দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! ছি ছি! আমরা ভাবতেও পারতাম না। ওদের মাঝখানে গিয়ে বসাটা তোমার একেবারেই ঠিক হয়নি। কখন কী অপমান করে দেবে তার ঠিক আছে?"

boierpathshala.blogspot.com

কথা শুনতে শুনতেই আহিরীর মনে হল, মানুষটাকে হালকা শিক্ষা দেওয়া দরকার। সে কোথায় যাবে না যাবে, এই লোক তা বলবার কে? চাকরিতে ঢোকার সময় কোথাও তো বলা ছিল না, শিক্ষকরা স্টুডেন্টস ক্যান্টিনে যেতে পারবে না! সে যখন কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ত, কত বার স্যর-ম্যাডামরা তাদের ক্যান্টিনে গিয়েছে। একসঙ্গে আড্ডা হয়েছে। সেই আড্ডায় টপিক হিসেবে সাহিত্য, থিয়েটার, সিনেমা এমনকী সেক্সও থাকত। ইনি কোন আমলে পড়ে আছেন?

পর্ব ২

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

আহিরী বোকা বোকা মুখ করে বলল, “স্যর, মাধবদাকে বললে এখানে চা এনে দিত নিশ্চয়ই, কিন্তু ক্যান্টিনের চা ক্যান্টিনেই বসে খেতে হয়। নইলে টেস্ট পাওয়া যায় না। চায়ের দোকানের চা যদি আপনি বাড়ি নিয়ে গিয়ে সোফায় বসে খান, ভাল লাগবে? তা ছাড়া আমি যত ক্ষণ থাকি, ওরা খুবই সম্মান

boierpathshala.blogspot.com

করে। সব থেকে বড় কথা, চমৎকার সব গল্প হয়। এখনকার ছেলেমেয়েরা কত কী জানে! ওদের সঙ্গে না মিশলে হিশাম মাতার বা কার্ল ওভ নসগার-এর মতো লেখকদের কথা আমি জানতেই পারতাম না। জানতেই পারতাম না, কিউ বা টেন মিনিট্স-এর মতো দারুণ সব শর্ট ফিল্ম তৈরি হয়েছে। থার্ড ইয়ার ইকনমিক্সের একটি ছেলের সেতার শুনে তো আমি থ! ইউটিউবে দিয়েছে। আপনি কি শুনবেন, স্যর?"

অর্কপ্রভ সেন গলাখাঁকারি দিয়ে বলেন, "ও, তুমি ইনটেলেকচুয়াল এক্সারসাইজ করতে ছেলেদের ক্যান্টিনে যাও?"

আহিরী হেসে বলল, "এক্সারসাইজ না বক্সিং জানি না, তবে ভাল লাগে। আমির খান, প্রিয়ঙ্কা চোপড়া নিয়েও আড্ডা হয়। আমি আবার হিন্দি মুভির পোকা কিনা! একটা সময়ে কলেজ-ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা দেওয়া হয়ে গেলেই হল-এ ছুটতাম।"

অর্কপ্রভ সেন ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে বললেন, "তা হলে তো ছেলেমেয়েরা মনের মতো শিক্ষক পেয়েছে। যা খুশি বলতে পারে।"

আহিরী বলল, "অল্প বয়সে নিজেদের মধ্যে একটু স্ল্যাং ইউজ করবে না? কান না দিলেই হল! আমি তো ওদের মোরাল শিক্ষা দিতে যাই না। আর ভালমন্দের সীমারেখাটাও এখন অত স্পষ্ট নয়। আমরা এমন অনেক কিছু ভাল বলে জানতাম, যেগুলো আসলে খুব খারাপ।"

টেবিলের কোণের দিকে বসে খাতা দেখছিলেন পলিটিক্যাল সায়েন্সের ব্রততী মুখোটি। মুখ না তুলে বললেন, "আহা অর্কপ্রভদা, বুঝতে পারছেন না কেন, আহিরীর এখনও প্রেসিডেন্সির ঘোর কাটেনি। ওখানেই পড়ে আছে। নিজেকে স্টুডেন্ট ভাবছে। ছোট মেয়ে তো। তাই না আহিরী?"

boierpathshala.blogspot.com

আহিরী বিদ্রুপের হাসি হেসে বলল, “একদম ঠিক বলেছেন ব্রততীদি। যত দিন স্টুডেন্ট থেকে স্টুডেন্টদের বোঝা যায় আর কী। বড় হয়ে গেলে তো টিচার হয়ে যাব। তখন আর ছাত্রদের বোঝার ঝামেলা থাকবে না। আমাদের দেশে এই একটা সুবিধে। ছাত্রদের না বুঝেও দিব্যি শিক্ষক হয়ে থাকা যায়।”

অর্কপ্রভ সেনের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলেন, “তা ক্যান্টিনে বসে তুমি ছাত্রদের কী বুঝলে?”

আহিরী ক্লাসে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল। শান্ত গলায় বলল, “পুরোটা বুঝতে পারিনি স্যর। এটুকু বুঝেছি, পড়াতে গেলে মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতে হবে। ওদের মধ্যে গিয়ে বসতে হবে। ওদের মুখের, মনের ল্যাংগোয়েজ জানতে হবে। পৃথিবীর সব বড় কলেজ-ইউনিভার্সিটিতেই শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মেশেন। এই বিষয়ে কোনও ট্যাবু থাকা ঠিক নয়। কলকাতা শহরের কোনও কলেজে স্টুডেন্টস ক্যান্টিনে এক জন টিচারের বসা নিয়ে এত আলোচনা, ভাবতেই অবাক লাগে। ভেরি আনফরচুনেট। যাই স্যর, ক্লাস আছে।”

অর্কপ্রভ সেন তার পর থেকে আহিরীর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন। ব্রততী মুখোটি ঘটনাটা চাউর করে দিয়েছিলেন। বেশির ভাগ পুরনো অধ্যাপকই আহিরীর কথা ভাল মনে নেননি। কয়েক জন অবশ্য ওকে সমর্থন করেছে। যেমন শ্রীপর্ণ বলেছে, “বেশ করেছ। অর্কপ্রভ সেন লোকটা খারাপ। ঝামেলায় ফেলার চেষ্টা করবে। সাবধানে থাকবে।” শ্রীপর্ণ এখানে দু’বছর হল বদলি হয়ে এসেছে। হিস্ট্রি পড়ায়। ভিতু, কিন্তু ভালমানুষ। আহিরী মৃদু হেসে বলেছিল, “চিন্তা করবেন না। আমাকে ঝামেলায় ফেললে নিজেকেও ঝামেলায় পড়তে হবে।”

boierpathshala.blogspot.com

অর্কপ্রভ সেনকে যেমন ছাড়েনি, শর্মিষ্ঠা দত্তকেও তেমনই আহিরী আজ ছাড়বে না বলে ঠিক করেছে। মহিলার পিছনে অন্য কেউ আছে। আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছে। অর্কপ্রভ সেনই হবে। তাকে ঝামেলায় ফেলছে। কথাটা ভেবে আরও মাথা গরম হয়ে আছে। আহিরী আজ ঘুম থেকে উঠে প্রতিজ্ঞা করেছিল, ঠান্ডা মাথায় কলেজে ঢুকবে। একটু ঠান্ডা নয়, ফ্রিজে-রাখা ঠান্ডা। অতিরিক্ত ঠান্ডা মাথা ছাড়া শর্মিষ্ঠা দত্তর সঙ্গে ঝগড়া করা যায় না।

শর্মিষ্ঠা দত্ত কলেজের টিচার-ইন-চার্জ। তিন বছর ধরে উনিই কলেজ সামলাচ্ছেন। বেশির ভাগ সময়েই নিজের ইচ্ছে মতো চলেন এবং বিভিন্ন জনকে নানা ভাবে জ্বালাতন করেন। কেউ আপত্তি করতে গেলে শান্ত ভঙ্গিতে এমন সব কথা বলেন যে মাথায় আগুন ধরে যায়। লজিক গোলমাল করতে থাকে। কিছু ক্ষণের মধ্যে 'আপনার যা খুশি হয় তাই করুন' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে আসা ছাড়া উপায় থাকে না। এটা মহিলার এক ধরনের ফাঁদ। 'রাগিয়ে দাও' ফাঁদ। যাতে কথা ভেস্তে যায়। তাই আগে থেকে সতর্ক থাকতে হয়। মাথা এতটাই ঠান্ডা করে যেতে হয় যাতে গরম হতে সময় লাগে। কোনও বিষয়ে আপত্তি করতে গেলেই উনি বড় গোলপানা মুখটা এমন দুঃখী-দুঃখী করে রাখেন যে মনে হয়, উনি বড় অসহায়। নিজের কোনও স্বার্থ নেই, দেশ ও দশের সেবায় এই কলেজের টিচার-ইন-চার্জ হয়ে বসে আছেন। অন্য কেউ দায়িত্ব নিলে গঙ্গায় গিয়ে ডুব দেবেন। গঙ্গার কোন ঘাটে গিয়ে ডুব দেবেন তাও ঠিক করা আছে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। এই সামান্য কথাটা কেউ বুঝতে চাইছে না। ভাবছে তাদের ইচ্ছে করে ঝামেলায় ফেলা হচ্ছে। কলেজের টিচিং, নন-টিচিং স্টাফরা অবশ্য অন্য কথা বলে।

boierpathshala.blogspot.com

বলে, ঝামেলা নয়, একে বলে বংশ বিতরণ। শর্মিষ্ঠা দত্তের আলিপুরের ফ্ল্যাটে একটা ছোটখাটো বাঁশঝাড় আছে। কলেজে আসার সময় তিনি সেখান থেকে বাছাই কিছু বাঁশ কেটে নিয়ে আসেন। কলেজে এসে সেই বাঁশ বিলি করেন। বিলি করার সময় মুখ এমন গদগদ করে রাখেন যে মনে হয়, বাঁশ নয়, হাতে করে ফুল এনেছেন। আসলে মহা ধুরন্ধর মহিলা। যে বিশ্বাস করবে সেই ঠকবে।

যে তিনটি কারণে আজ আহিরীর মাথা গরম হয়েছে তার একটার জন্যও সে নিজে দায়ী নয়। দায়ী তার মা, বাথরুমের গিজার এবং ডার্ক গ্রে রঙের একটা উটকো গাড়ি।

মা সকাল থেকেই ঘ্যানঘ্যান শুরু করেছিল। সেই এক সাবজেক্ট। বিয়ে, বিয়ে আর বিয়ে।

একমাত্র সন্তানের সুযোগ্য পাত্রের জন্য নিজের মতো সন্ধান চালাচ্ছিলেন নবনী। পেয়েও গিয়েছেন। এক বান্ধবী-কাম-দিদির পুত্র কম্পিউটার নিয়ে লেখাপড়া করে আমেরিকার পোর্টল্যান্ডে থাকে। সেখানেই তার কাজকর্ম, একশো চোদ্দো তলার ওপর ফ্ল্যাট, মার্সেডিজ-বেঞ্জ গাড়ি। নবনীকে সেই দিদি শুকনো মুখে বলেছিল, “ছেলেটার সবই আছে, নেই শুধু বউ।”

নবনী চোখ কপালে তুলে বলেছিলেন, “সে কী! এমন হিরের টুকরো ছেলের বউ নেই কেন?”

“সেটাই তো কথা। ছেলে না পারে প্রেম করতে, না কোনও মেয়েকে তার মনে ধরে।”

boierpathshala.blogspot.com

নবনী বললেন, “এ আবার কেমন কথা? আমেরিকার মতো অত বড় দেশে বিয়ে করবার মতো কোনও মেয়ে পাচ্ছে না!”

“বলেছিল, বাঙালি মেয়ে ছাড়া বিয়ে করবে না। এখন বলছে, বিয়েই করব না। অপছন্দের মেয়েকে বিয়ে করে ছাড়াছাড়ির হয়ে যাওয়ার থেকে বিয়ে না করাই ভাল।”

ছেলের নাম অর্জক। চেহারা গোলগাল, ফর্সা। হাবভাব নরমসরম। নিচু গলায় কথা বলে। আমেরিকার মতো শহরে বাস করেও খানিকটা লাজুক। বান্ধবী-কাম-দিদিকে ম্যানেজ করে নবনী অর্জককে এক দিন বাড়ি নিয়ে এলেন। মেয়ের ছুটি দেখেই ব্যবস্থা করেছিলেন। কিছুই তেমন ভাঙেননি। মেয়েকে শুধু বলেছিলেন ‘বন্ধুপুত্র’। অর্জককে লাঞ্চ খাওয়ালেন। মেনুতে বড়ি দেওয়া শুক্তো, ডাঁটা চচ্চড়ি, মৌরলা মাছের ঝোলও ছিল। ছেলে পরিপাটি করে খেল।

ক্রমশ

পর্ব ৩

boierpathshala.blogspot.com

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

নবনী মেয়ের সঙ্গে আলাপ করালেন। খেতে খেতে দু'জনের কথা হল। বেশির ভাগটাই দেশ–বিদেশের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে। এখানকার ভাল ছেলেমেয়েরা কেন টিচিং প্রফেশনে আসতে চাইছে না, তাই নিয়ে আলোচনা। ইউনিভার্সিটির পড়া শেষ করে, কলেজে চাকরি পেতে পেতে অনেকটা সময় চলে যাচ্ছে। মাঝখানে নেট পাশ করে, গবেষণা শেষ করতে হবে। তার পর কলেজ সার্ভিস পরীক্ষা। স্কুলেও তাই। বিএড-এ চান্স পেতেই দু'টো বছর লেগে যায়। পাশ করে বসে থাকো, কবে স্কুল সার্ভিসের পরীক্ষা হবে। ইন্টারভিউ, রেজাল্ট, পোস্টিং নিয়ে লম্বা সময়ের ব্যাপার। কোন ছেলেমেয়ে এতটা সময় বসে থাকবে? কাঁহাতক স্কলারশিপের সন্ধানে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায়? এর সঙ্গে তো ধরা-করা আছেই।

এই বিষয়ে আহিরী–অর্জক দু'জনেই মোটের ওপর একমত হল। তবে একেবারেই শুকনো, কেজো কথা। আহিরী যে খুব কিছু বলেছে এমনটাও নয়, অর্জকই বলছিল। বাইরে থাকলেও সে দেশের খবর রাখে। আহিরীর বেশ ভাল লাগল। ছেলেমেয়েরা বাইরে গেলে, দেশের কিছু নিয়ে আর মাথা ঘামায় না। ফেসবুক, হোয়াটস্‌অ্যাপে চলতি বিষয় নিয়ে হালকা কমেন্টস দেয়, নয়তো জোকস্‌ ফরোয়ার্ড করে। এই ছেলে একটু আলাদা মনে হচ্ছে।

এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। সমস্যা শুরু হয়েছে তার পর থেকে। এই সামান্য সময়েই অর্জক আহিরীকে পছন্দ করে ফেলেছে। সাধারণ পছন্দ নয়, বাড়াবাড়ি ধরনের পছন্দ। এক দিনের আলাপে এতটা পছন্দ অবশ্যই 'বাড়াবাড়ি' বলে আহিরীর মনে হয়েছে। তবে নবনী এই খবর জানার পর এত খুশি হয়েছেন যে কী করবেন বুঝতে পারছেন না। অর্জকের মায়ের অবস্থাও পাগল-পাগল।

boierpathshala.blogspot.com

পাগল হওয়াটাই স্বাভাবিক। ছেলে শেষ পর্যন্ত 'মনের মতো মেয়ে' খুঁজে পেয়েছে বলে কথা। মেয়েও রূপে-গুণে ছেলের যোগ্য। আমেরিকা পৌঁছে এই মেয়ে অনায়াসে স্কাইপে তার মায়ের কাছ থেকে হাতে-কলমে বড়ি-শুক্তো, সজনে ডাঁটা, মাছের ঝোল রান্না শিখে নেবে। কিচেনে ল্যাপটপ রেখে দেখে নেবে, কেমন করে বড়ি-শুক্তোয় ফোঁড়ন দিতে হবে, সজনে ডাঁটায় কতটা নুন–মিষ্টি লাগবে, মাছের ঝোলে কত ক্ষণ ঢাকা লাগবে।

এ দিকে অর্জক ফিরে গেছে পোর্টল্যান্ডে, রেখে গেছে আহিরীর কাছে গোপন বার্তা— "তাড়াহুড়োর কিছু নেই। যদি কোনও দিন ইচ্ছে হয়, আমাকে কল করবেন। এই আমার ফোন নম্বর। আমি অপেক্ষা করব। সম্পর্ক এমন একটা অনুভূতি যা কোনও কিছু দিয়ে মাপা যায় না। সময় দিয়ে তো নয়ই। তাই খুব অল্প সময়ের জন্য আপনার সঙ্গে আলাপ হলেও আমি অপেক্ষা করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বাকিটা আপনার সিদ্ধান্ত।"

অর্জক কোথা থেকে মোবাইল নম্বর পেল? মা'কে জিজ্ঞেস করে স্পষ্ট জবাব পায়নি আহিরী। সে নিশ্চিত, এ কীর্তি মায়ের। নবনী মেয়েকে চাপ দিতে শুরু করেছেন। কখনও ঠান্ডা মাথায়, কখনও রেগে। আহিরী সামলে চলেছে। কিন্তু কত দিন পারবে বুঝতে পারছে না। এত দিন বলে আসছিল, আগে চাকরিতে সেট্‌ল করবে, তার পর বিয়ের কথা। চাকরির এক বছর হয়ে গেল। ফলে সেই অজুহাত আর চলছে না। এ দিকে বিতানের কথা বাড়িতে এখনও জানাতে পারেনি আহিরী। সমস্যা আছে। বিতান ঠিকমত কোনও কাজকর্ম করে না। তার ওপর বয়সে তার থেকে প্রায় দেড় বছরের ছোট। বাবা মুখে কিছু বলবে না, কিন্তু প্রায়-বেকার কাউকে মেয়ের জন্য মেনে নিতে নিশ্চয়ই মনে মনে কষ্ট পাবে। মানুষটা এই কষ্ট যাতে না পায় তার জন্য আহিরী অপেক্ষা করে আছে।

boierpathshala.blogspot.com

বিতান ঠিকঠাক একটা কাজ পাক। মা অবশ্য বেকার এবং কম বয়স, দু'টোর একটাও মানবে না। তবে এ সবের থেকেও বড় সমস্যা বিতান। আহিরীর মনে হয়, বিতান নিজে দ্বিধায় রয়েছে। কনফিউজড। যদিও বিয়ের কথা তার সঙ্গে কখনও হয়নি। তার পরেও বোঝা যায়, ছেলেটা এক ধরনের সংশয়ে আছে। আহিরীর মতো মেয়েকে বিয়ে করবার মতো যোগ্যতা তার আছে কি না, এই নিয়ে সংশয়।

আহিরী নিজে না বললেও নবনী তার মেয়ের সঙ্গে বিতানের যোগাযোগের খবর রাখেন। কানে খবর এসেছে, তার অধ্যাপিকা মেয়ে এক জন ওঁচা ছেলের সঙ্গে মিশছে। তিনি ঠারেঠোরে মেয়েকে প্রায়ই বলেন, "ভুল সঙ্গী বাছাই জীবনের সবচেয়ে বড় গোলমাল। বেমানান, অযোগ্য সঙ্গী নিয়ে কেউ কোনও দিন সুখী হয়নি। কেবল আপশোসই করতে হয়েছে।"

আহিরী রেগে গিয়ে বলে, "মা, তুমি কি কলেজ ছেড়ে আমেরিকায় গিয়ে আমাকে হেঁশেল ঠেলতে বলছ? সেটাই আমার জন্য ঠিক হবে? কোনও আপশোস থাকবে না?"

নবনী থমথমে গলায় বলেন, "হেঁশেল ঠেলতে হবে কেন? ও দেশে কলেজ-ইউনিভার্সিটি নেই? সেখানে বাঙালি ছেলেমেয়েরা পড়ায় না? আমেরিকায় গিয়ে কেরিয়ার করা, নাকি এখানে অভাব-অনটনের সংসার করা, কোনটা আপশোসের সেটা নিজেই বিচার করো। বিচারবুদ্ধি করার মতো শিক্ষা তোমাকে আশা করি আমরা দিতে পেরেছি।"

আজও ব্রেকফাস্ট টেবিল থেকে এক কথা শুরু হয়েছিল। বেশির ভাগ সময়েই এই ঘ্যানঘ্যানানি আহিরী কানে ঢোকায় না। নিজের মতো ভাবনাচিন্তা চালায়। যাকে বলে প্যারালাল থিকিং। আজ দুম করে মাথাটা গেল গরম হয়ে। শর্মিষ্ঠা

boierpathshala.blogspot.com

দত্তর জন্য আগে থেকেই তেতে ছিল। মায়ের ঘ্যানঘ্যানানিতে বেড়ে গেল। শুরু হল উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়।

নবনী বললেন, “এ বার একটা কিছু ফাইনাল কর। ছেলেটা কত দিন অপেক্ষা করবে?”

আহিরী বলল, “মা, আমি তো কাউকে অপেক্ষা করতে বলিনি।”

“এ রকম করে বলছিস কেন আহি? অর্জক তো কোনও অন্যায় করেনি।”

আহিরী বলল, “আমিও তো কোনও অন্যায় করছি না। কাউকে অপেক্ষা করতে বলিনি, শুধু সেই কথাটাই বলছি।’

নবনী বললেন, “অবশ্যই অন্যায় করছিস। এত ভাল একটা ছেলে, মাথা কুটলে পাবি?”

আহিরী বলল, “মাথা কুটে দেখব পাই কি না। তবে এখন তো কুটতে পারব না মা। এগারোটা থেকে কলেজে পরীক্ষার ডিউটি। পর পর চার দিন ডিউটি দিয়ে টিচার-ইন-চার্জ আমাকে টাইট দিচ্ছে। এর আগেও এই কাণ্ড করেছে।”

নবনী বললেন, “তুই কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিস আহি? আমি বলছি বিয়ের কথা, আর তুই বলছিস পরীক্ষার ডিউটি!”

আহিরী বলল, “হ্যাঁ করছি। রোজ এক কথা বললে ঠাট্টা ছাড়া আর কী করব? সিরিয়াস মুখে আলোচনাসভা বসাব? আমি তো তোমাকে বলেছি, আমি এখন বিয়ে করব না। তুমি তাও বলে যাচ্ছ।”

boierpathshala.blogspot.com

“তিরিশ বছর বয়েস হয়ে গেল, তার পরেও কেন বিয়ে করবি না জানতে পারি? বিয়ের বয়স তো পেরিয়ে গেছে। এই বয়েসে আমার বিয়ে তো কোন ছার, তুই হয়ে হঁাটতেও শিখে গেছিস।”

আহিরী বলল, “কী করা যাবে মা, সবাই তো সমান নয়। আমার ছেলেপুলে হলে তারা না-হয় কিছু দিন পরেই হাঁটতে শিখবে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ডেস্টিনেশনে পৌঁছনো নিয়ে কথা। তাড়াহুড়ো করে খরগোশের কী হাল হয়েছিল মনে নেই?”

নবনী থমথমে গলায় বললেন, “ফাজলামি বন্ধ কর। কেন বিয়ে করবি না জানতে পারি?”

“না, পারো না। মা, তিরিশ কেন, এখন যদি আমার বয়স তিরানব্বইও হয়, তা হলেও আমি বিয়ে করব না।”

নবনী গলা তুলে বললেন, “চুপ কর। এটা তোর কলেজ নয়, আমিও তোর ছাত্রছাত্রী নই যে যা বলবি শুনতে হবে। তুই কি ভেবেছিস আমি কিছু জানি না? সব জানি। জানি তুই কেন এই বিয়েতে রাজি হচ্ছিস না । জেনে রাখ, আমিও আটকাব।”

আহি বলে, “কী জানো তুমি?”

নবনী বলেল, “সময় হলেই বলব কী জানি।”

এর পরে না রেগে উপায় আছে? এই ছিল দিনের প্রথম রাগের সূত্রপাত।

দ্বিতীয় বার মাথা গরম হল বাথরুমে ঢুকে। আহিরী গিজার অন করে দিয়েছিল আগেই। স্নানের জন্য শাওয়ার খুলতে দেখল, জল গরম হয়নি। গিজার গোলমাল করেছে। যতই গরম পড়ুক, সকালবেলার স্নান অল্প গরম জলে

boierpathshala.blogspot.com

করাটা আহিরীর অভ্যেস। সন্ধেয় কলেজ থেকে ফিরে গা ধোয়ার সময় গরম জল লাগে না। মা এই নিয়ে কম বকাবকি করেনি।

“এ আবার কী ব্যাড হ্যাবিট বানিয়েছিস আহি? দিনে গরম রাতে ঠাণ্ডা! শরীর খারাপ করবে যে।’

আহিরী বলে, “গরম জলে তেজ বাড়ে, ঠান্ডা জলে ক্লান্তি দূর হয়। মা, সকালে আমার তেজ দরকার। সারা দিনের ফুয়েল।”

“বাজে বকিস না। অসুখে পড়লে বুঝবি।”

আজ সকালে ঠান্ডা জলেই স্নান সারতে হল। গ্যাসে যে একটু জল গরম করে নেবে সে সময়ও ছিল না।

তিন নম্বর রাগের কারণ একটা ছাই রঙের গাড়ি। কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে তার গাড়ি পার্ক করার জায়গায়।

আহিরী বঁাক নিল। ছাতাটা নেওয়া উচিত ছিল। মাথা গরমের কারণে ছাতা গাড়ি থেকে নিতে ভুলে গেছে। কম্পাউন্ডের পশ্চিম দিকে বিশাল বাড়ি তৈরি হচ্ছে। তার ছায়া এসে পড়েছে লনে। আগাছা, ইট, গর্তের জন্য লন দিয়ে হঁাটা যায় না। গেলে একটু শর্ট-কাট হত। আহিরী হঁাটার স্পিড বাড়াল।

কলেজের নতুন ভবন হচ্ছে। সাত না আট তলা হওয়ার কথা। চারতলা পর্যন্ত উঠে কাজ থমকে গেছে। টাকা–পয়সা নিয়ে কী নাকি গোলমাল। বাড়িটা শেষ হলে কলেজ অনেকটা বড় হয়ে যাবে। নতুন ফ্যাকাল্টি হবে। অনেক ডিপার্টমেন্ট সরে আসবে। পুরনো বাড়িতে জায়গার সমস্যা হয়। ছাত্রছাত্রী অনেক বেশি হয়ে গেছে। অনেক সময় ক্লাসরুম পাওয়া যায় না। নতুন ভবনের কাজ বন্ধ হওয়া নিয়ে কলেজে টেনশন আছে। বেশ কয়েক বার গর্ভনিং বডির

boierpathshala.blogspot.com

এমার্জেন্সি মিটিং হয়েছে। স্টুডেন্টস অ্যাজিটেশনও হয়েছে। কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে, শিগগিরই বড় গোলমাল পাকবে। আহিরী এ সব নিয়ে মাথা ঘামায় না। টিচার্স রুমে কেউ কিছু বললে চুপ করে থাকে। চাকরিতে জয়েন করার আগে বাবা বলেছিল, "আহি, এই প্রথম চাকরি করতে যাচ্ছিস, কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখবি।"

সব কথা না মানলেও বাবার পরামর্শ শুনতে আহিরীর ভাল লাগে। আসলে মানুষটাকেই তার খুব ভাল লাগে। মায়ের ঠিক উলটো। ঠান্ডা মাথা। 'পারফেক্ট জেন্টলম্যান' বোধহয় একেই বলে। এক জন ভদ্রলোকের যা যা গুণ থাকা দরকার, বাবার মধ্যে তার সব ক'টাই আছে বলে আহিরীর ধারণা। এমনি এমনি তো মানুষ বড় হয় না। কমলেশ রায় আজ যে এত বড় চাকরি করেন, তার জন্য অনেক যোগ্যতা লাগে। বাষট্টি বছর বয়স হয়ে গেল, কোম্পানি তাকে ছাড়ার কথা ভাবতে তো পারছেই না, উলটে দায়িত্ব বাড়াচ্ছে।

ছোটবেলা থেকেই আহিরী দেখে আসছে, বাবা অন্য মানুষকে মর্যাদা দেয়। আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা পছন্দ না হলে চুপ করে যায়, কিন্তু অপমান করে না। বাবা কখনও ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করেছে বলে আহিরী বিশ্বাস করে না। তার 'না' বলাটাও মার্জিত। আবার কেউ বলতে পারবে না মানুষটা দাম্ভিক। হালকা বা তরল মনেরও নয়। তার চারপাশে সব সময়ে একটা কঠিন অথচ মধুর ব্যক্তিত্বের দেয়াল। একেই বোধহয় বলে প্লেজেন্ট পার্সোনালিটি। নিজের নীতি, আদর্শ থেকে মানুষটাকে সরানো কঠিন। আহিরী কত বার দেখেছে, চাকরি চাইতে বাড়ি পর্যন্ত লোক চলে এসেছে। আত্মীয়স্বজন, নেতাদের রেফারেন্স, এমনকী মায়ের পরিচিতজনও। হাতেপায়ে ধরেছে। বাবা ভদ্র ভাবে ফেরত পাঠিয়েছে। ছোটবেলার একটা ঘটনা খুব মনে পড়ে। আহিরী তখন

boierpathshala.blogspot.com

ক্লাস নাইনে। ঠিক হল, ফান্ড তোলার জন্য তাদের স্কুলে বড় ফাংশন হবে। স্যুভেনিরে বিজ্ঞাপনের জন্য অনেক স্টুডেন্টের সঙ্গে আহিরীর হাতেও ফর্ম দেওয়া হল। যাদের বাবা-মা বড় চাকরি করে বা নিজে ব্যবসা করে, তাদের কাছ থেকে মোটা টাকার বিজ্ঞাপন চাই। বাবা বিজ্ঞাপন দেয়নি। আহিরী অনেক আবদার করেছিল। কান্নাকাটি করতেও ছাড়েনি। বাবা তার পরও দেয়নি।

পর্ব ৪

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

আমি যদি টাকার ব্যবস্থা করে দিই, স্কুল তোমাকে আলাদা চোখে দেখবে। তোমার ভুল ত্রুটি চট করে ধরবে না। শাসন করবার প্রয়োজন হলে দশবার ভাববে,” বাবা বলেছিল।

আহিরী বায়না করেছিল, “বাবা, এটা আমার প্রেস্টিজ। প্লিজ তুমি দাও।”

boierpathshala.blogspot.com

“বাবার বিজ্ঞাপন দেওয়াটা কোনও মেয়ের প্রেস্টিজ হতে পারে না। লেখাপড়া করে নিজের প্রেস্টিজ তৈরি কর, আহি।”

আহিরী বলেছিল, “অনেকেই তো দিচ্ছে।”

বাবা বলেছিল, “অনেকে করলেই ভুল কাজ কখনও ঠিক হয় না। স্কুলের ফান্ড রেজ করবার জন্য স্টুডেন্টদের জড়ানো ঠিক নয়। এটা ভুল। আমি সমর্থন করি না। যে মেয়েরা দিতে পারবে না তারা হীনম্মন্যতায় ভুগবে। আইসোলেটেড ফিল করবে।”

সেই বয়সে যে প্রশ্ন করা যায় না, সে দিন আহিরী সেই প্রশ্ন করেছিল। সে ছোটবেলা থেকেই আর পঁাচ জনের থেকে পরিণত।

“ভুল করেই নাহয় দাও। বাবা, তুমি কি কখনও ভুল করোনি?”

আহিরীর মনে আছে, কমলেশ রায় সে দিন একটু চুপ করে গিয়েছিলেন। তার পর বলেছিলেন, “যদি করেও থাকি, আরও ভুল করবার জন্য সেটা কোনও লাইসেন্স নয়। এই বয়সেই সবটা বুঝতে পারবে না। বড় হলে পারবে।”

আহিরী বাবার কথা সে দিন বিশ্বাস করেনি। অসম্ভব, বাবা কখনও ভুল করতে পারে না। আহিরী স্কুল ছাড়ার পর এই মানুষটাই নিজে থেকে প্রতি বছর স্কুলে বড় অ্যামাউন্টের ডোনেশন পাঠিয়ে দেয়। কেউ জানতেও পারে না। বছর তিন হল জানতে পেরেছে আহিরী। স্কুলের এক পুরনো টিচারের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। বাবাকে জিজ্ঞেস করায় কিছু বলেনি, মুচকি হেসেছে শুধু। একে খুব পছন্দ না করে উপায় আছে?

কলেজে জয়েন করবার আগে বাবা যখন পরামর্শ দিয়েছে, আগ্রহ নিয়ে শুনেছে আহিরী। কমলেশ রায় বলেছিলেন, “কাজের জায়গায় গিয়ে সব বিষয়ে মাথা

boierpathshala.blogspot.com

ঘামাবি না। নিজের কাজে মন দিবি। আগে কাজের ব্যাপারে নিজেকে উপযুক্ত প্রমাণ করবি, তার পর অন্য কথা।”

এখনও পর্যন্ত বাবার কথা মেনে চলার চেষ্টা করে আহিরী। ছাত্রছাত্রীদের ছাড়া কোনও কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না। নতুন ভবনের গোলমাল নিয়েও কখনও কথা বলে না। তবে বাড়ি আটকে থাকার ঘটনাটা যে ধীরে ধীরে জট পাকাচ্ছে সেটা টের পায়।

আহিরী কবজি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল। সে মিনিট পাঁচ-সাত লেটে আছে।

২

কলেজ বিল্ডিং–এ ঢোকার সিঁড়িতে গোপাল রক্ষিতের মুখোমুখি হল আহিরী। থমকে দাঁড়াল।

“গোপালবাবু, গাড়িটা কার?”

গোপাল রক্ষিত অন্য কিছু ভাবছিল। থতমত খেয়ে বলল, “কোন গাড়ি দিদি?”

ভুরু কুঁচকে আহিরী বলল, “ওই যে পিছনে পার্ক করে রেখেছে। ছাই রঙের গাড়ি।”

গোপাল রক্ষিত বলল, “লাইব্রেরির পিছনে? শেডের নীচে?”

আহিরী বিরক্ত গলায় বলল, “আবার কোথায় হবে? এক বছর ধরে তো আমি ওখানে গাড়ি রাখছি। এত দিন তো কেউ ওখানে যায়নি। আজ হঠাৎ কার সাধ হল?”

boierpathshala.blogspot.com

গোপাল কলেজের সিকিয়োরিটি ইন-চার্জ। নতুন বাড়ি তৈরির সময় থেকে সে টেনশনে আছে। লক্ষ লক্ষ টাকার ইট, বালি, সিমেন্ট, লোহা পাহারার দায়িত্ব তার ঘাড়ে। মোটে ছ'জনের টিম নিয়ে এই কাজ করতে হয়। কোটি টাকার মালপত্রের তুলনায় এই সংখ্যা কিছুই নয়। তবে একটা সময় প্রায় তিরিশ-চল্লিশ জন লেবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে থেকে গেছে। বাড়ি যেখানে তৈরি হচ্ছিল তার পিছনে দরমা-বেড়ার ঘর বানিয়েছিল। অত লোক থাকলে চোর-ডাকাত ঢোকার সাহস পায় না। কাজ বন্ধ হয়ে যেতে এখন তারাও কেউ নেই। সবাই চলে গেছে। কলেজ ছুটি হয়ে গেলে শুনশান। পর পর ছুটির দিন থাকলে তো কথাই নেই। যতই কলকাতার মতো শহর হোক, যতই উঁচু পাঁচিলে ঘেরা কম্পাউন্ড আর বড় গেট থাকুক, কলেজ তো আর বড় রাস্তার ওপরে নয়! একটু ভেতরে ঢুকতে হয়। সামনের রাস্তাটা ফাঁকা। এ দিকে নতুন তিনটে তলায় জানলা-দরজা, গ্রিল, টাইলস বসে গেছে। সে সবও দামি জিনিস। কেউ খুলে নিয়ে গেলে ভাল দামে বিক্রি করতে পারবে। ফলে চাপ বেড়েছে। এই সময়ে সিকিয়োরিটির সংখ্যা বাড়ানো দরকার। অথচ কলেজ মানতে চাইছে না। এইমাত্র শর্মিষ্ঠা দত্তের সঙ্গে তার খানিকটা কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। মহিলা খালি নিজেরটুকু দেখে। সে গিয়েছিল সিকিয়োরিটি বাড়ানোর আর্জি নিয়ে।

"ম্যাডাম, এই ক'জন সিকিউরিটি দিয়ে এত বড় বাড়ি পাহারা দেওয়া অসম্ভব।"

শর্মিষ্ঠা দত্ত অবাক হওয়ার ভান করে বললেন, "এত বড় বাড়ি কোথায়? আটতলার মধ্যে মাত্র তিনটে তলা হয়ে পড়ে আছে। বাকি তো দাঁত বের

boierpathshala.blogspot.com

করা ইট আর আখাম্বা কতকগুলো লোহার রড। বাড়ি কোথায় গোপাল? চুরি করবার মতো কী আছে ওখানে?”

গোপাল বলল, “ম্যাডাম, মালপত্র তো অনেক। মাত্র ছ’টা লোকে নজর রাখা যায়? দিনে তিন জন, রাতে তিন জন থাকি। তার ওপর ছুটিছাটা আছে। কম করে আরও চার জন লাগবে। পুরনো এই বাড়িটাও তো দেখতে হয়। এখানেও তো কম্পিউটার, ল্যাবরেটরি ইকুপমেন্ট, এসি মেশিন, ফার্নিচার— সব আছে।”

শর্মিষ্ঠা দত্ত বললেন, “তুমি কি খেপে গেলে? আটকে থাকা বাড়ির জন্য এক ডজন পাহারাদার রাখব? সরকার আমাকে ছেড়ে কথা বলবে? সরকার কলেজে টাকা দেয় লেখাপড়া করার জন্য না পাহারাদার পোষার জন্য? এক কাজ করো, কাজ যখন আটকে গেছে, তুমিও দু’জন লোক কমিয়ে দাও। আবার কাজ শুরু হলে দেখা যাবে।”

গোপাল আর্তনাদ করে ওঠে, “পাগল হয়েছেন ম্যাডাম? দরজা-জানলা সব খুলে নিয়ে যাবে!”

শর্মিষ্ঠা দত্ত শান্ত ভাবে বললেন, “অডিটের লোকজন এক দিন ঠিক তোমার মতোই বলবে, আপনি কি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন মিসেস দত্ত? খোদ কলকাতায় একটা আধ-তৈরি বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য মাইনে দিয়ে এতগুলো লোক রেখেছিলেন! না গোপাল, তুমি দেখো লোক কী ভাবে কমানো যায়। ডিউটি ডবল করে দাও। জানলা-দরজা চোরে খুলে নিয়ে গেলে আবার হবে। সেটা অপচয় নয়। তার দায় আমার নয়। সেটা চুরি, পুলিশ দেখবে। টাকাপয়সার অপচয় হলে সব আমার ঘাড়ে পড়বে। উফ, এই আপদের জায়গা ছেড়ে যে কবে যাব! যা লেখাপড়া করেছিলাম সব তো ভুলতে বসেছি। লোহা,

boierpathshala.blogspot.com

সিমেন্ট নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। কে জানে, এর পর হয়তো রাতে এসে তোমার সঙ্গে লাঠি হাতে বাড়ি পাহারা দিতে হবে।”

গোপাল মনে মনে গাল দিতে দিতে আসছিল। আহিরীর কথা পুরোটা বুঝতে সময় লাগল তার।

“আপনার জায়গায় কেউ গাড়ি রেখেছে দিদি?”

এ বার একটু থমকে গেল আহিরী। ‘আপনার জায়গা’ কথাটা ঠিক নয়। কলেজে প্রথম দিকে গাড়ি এনে দেখেছিল, গেটের দিকে পার্ক করার উপায় নেই। ইতিমধ্যেই অনেকে গাড়ি রেখেছে। সকলেই চায় সিঁড়ি থেকে নেমে গাড়িতে উঠে বসতে। একটুও যেন হাঁটতে না হয়। এক দিন জায়গা খুঁজতে খুজতে আহিরী শেষ পর্যন্ত কলেজের পিছনে গিয়ে একটা শেডও খুঁজে পেল। তার ছোট গাড়িটা অনায়াসে রাখা যাবে। রোদ-জল লাগবে না। সমস্যা একটাই, গাড়ি রেখে খানিকটা হাঁটতে হবে। সে আর কী করা। যারা আগে থেকে আছে তারা তো সামনেই গাড়ি রাখবে। আহিরী সেই শেডের নিচেই গাড়ি রাখছে। এক বছর পর আজ হঠাৎ দেখছে, শেডের নিচে অন্য গাড়ি। যতই রাগ হোক, জায়গাটাকে ‘নিজের’ বলা যায় না। কলেজের জায়গা।

“গোপালবাবু, আপনি কাউকে কিছু বলবেন না। শুধু কার গাড়ি খোঁজ নিয়ে আমাকে জানাবেন।”

গোপাল রক্ষিত বলল, “আচ্ছা দিদি, জানাব।”

আহিরী সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মুখ ফিরিয়ে আবার বলল, “কাউকে কিছু বলবেন না যেন।”

boierpathshala.blogspot.com

শর্মিষ্ঠা দত্তর কাছে যাওয়া হল না আহিরীর। পরীক্ষার সময় হয়ে গেছে। অফিস থেকে জানল, তার ডিউটি থ্রি বি-তে। মানে তিন তলায়। অফিসের কর্মচারী নির্মাল্য খাতা গুছিয়ে দিয়ে বলল, "কী ম্যাডাম, পর পর চার দিন ডিউটি পড়ে গেল?"

আহিরী ঠোঁটের কোণে বিদ্রুপের হাসি হেসে বলল, "কী করব বলুন নির্মাল্যদা, জুনিয়র হওয়ার খেসারত দিচ্ছি।"

নির্মাল্য গলা নামিয়ে বলল, "হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্টকে বললেন না কেন? আর কারও তো পর পর ডিউটি পরেনি। মাঝখানে একটা দিন অফ পড়েছে। আপনার একার কেন পড়বে?"

আহিরী বলল, "বলেছিলাম। উনি বললেন, এগজাম ডিউটি নাকি শর্মিষ্ঠা দত্ত নিজে দেখছেন। তিনি চেয়েছেন, আমি রোজ ডিউটি দিই।"

নির্মাল্য বলল, "ও, তা হলে আর কী করবেন।"

আহিরী দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "ঠিক করেছি, আজ ওঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করব। আমার কোয়ালিফিকেশনের কোন অংশটা দেখে ওঁর মনে হয়েছে, পরীক্ষা-হলে আমি ভাল গার্ড দিতে পারি? অনার্স-মাস্টার্সে ভাল রেজাল্ট করলে বুঝি এক দিনও গ্যাপ ছাড়া পরীক্ষা-হলে টহল মারতে হয়?"

নির্মাল্য চাপা গলায় বলল, "অবশ্যই জিজ্ঞেস করুন। এ সব আর কিছুই নয়। বদমাইশি। দেখবেন এই মহিলা শিগগিরই খুব বড় ঝামেলায় ফাঁসবে।"

পরীক্ষার মাঝখানেই গোপাল এসে খবর দিয়ে গেল, সাদা গাড়ি জিয়োগ্রাফির প্রমিত তরফদারের। এত দিন ড্রাইভার এসে ছেড়ে যেত, এ বার থেকে গাড়ি কলেজে থাকবে। আহিরীর বিরক্তি বাড়ল। সামান্য বিষয়, কিন্তু নতুন ফ্যাকড়া

boierpathshala.blogspot.com

তো বটেই। দূর, আর গাড়িই আনবে না সে। ক্যাব ডেকে চলে আসবে। এমএ পাশ করার পর বাবাই গাড়ি চালানো শিখিয়েছিল। মায়ের আপত্তি ছিল। মা পুরনো বিশ্বাস-অবিশ্বাস থেকে বেরোতে পারে না। মেয়েদের সম্পর্কে তার মত হল, "লেখাপড়া শেখো, চাকরি করো, কিন্তু অতিরিক্ত লাফালাফি কোরো না। মনে রেখো, শেষ পর্যন্ত তোমাকে ভাল একটা বিয়ে করে সংসারে থিতু হতে হবে।"

একমাত্র সন্তান আহিরীকেও তিনি এই প্রাচীন বিশ্বাসে চালাতে চান। পারেন না। কলেজে পড়ার সময়েই সে মাকে বলে দিয়েছে, "মা, অনেক কাল বাঙালি মেয়েরা বসে বসে জীবন কাটিয়েছে, এ বার তাদের লাফাতে হবে। কত লাফ বাকি তোমার ধারণা আছে? সব সুদে-আসলে তুলতে হবে না?"

"যা গিয়ে লাফা। গোল্লায় যা।"

আহিরী মায়ের দু-'কঁাধে হাত রেখে হাসিমুখে বলেছিল, "চিন্তা কোরো না, লাফ শুরু করে দিয়েছি। আজ কলেজে সিগারেট খেয়েছি। গোটা একটা সিগারেট। ছেলেরা বলেছিল, দু'টানেই কাশতে কাশতে মরে যাবি। একটুও কাশিনি। বাট ভেরি ব্যাড টেস্ট। আর খাব না। বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা, আমার মুখের গন্ধ শুঁকে দেখো।"

মেয়ে মুখ এগোলে নবনী ছিটকে গিয়েছিলেন। আহিরী হেসে বলেছিল, "এ বার তোমাকে আর একটা লাফানোর খবর দেব। পোল ভল্ট টাইপ। এই সামারে আমি আর কেমিস্ট্রির তপা যাচ্ছি জুলুক। তিব্বতের বর্ডার। জায়গাটা ছবির থেকেও একটু বেশি সুন্দর। গরমের সময়ে জুলুক রডোডেনড্রনে ছেয়ে যায়। আমি এবং তপা, আমরা দু'জনেই সুন্দরী এবং অ্যাট্রাকটিভ বলে কলেজের অনেক

boierpathshala.blogspot.com

ছেলে আমাদের সঙ্গে ভিড়তে চাইছে। তুমি শুনে খুশি হবে মা, আমরা তাদের মধ্যে দু'জনকে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে বেছে নিয়েছি। দু'জন মেয়ের সঙ্গে দু' জন ছেলে।'

পর্ব ৫

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

নবনী আঁতকে উঠে বলেছিলেন, "কী বলছিস!" আহিরী মা'কে ছেড়ে দিয়ে ধপাস করে বিছানায় বসে পড়ে বলল, "ঠিকই বলছি। ইন্টারভিউতে প্রশ্ন ছিল খুবই সহজ। একটা পাজল। পাজলটা হল— পাহাড়ি পথের ধারে, বলো দেখি কে অপেক্ষা করে? মোট কুড়িটা ছেলে উত্তর দিয়েছে। কেউ বলেছে ফুল, কেউ বলেছে ঝরনা, কেউ বলেছে কুয়াশা, কেউ বলেছে প্রেমিকা। সব ক্যানসেল। মাত্র দু'জনের জবাব আমাদের মনে ধরছে। তাদের আমরা নিয়েছি। এরা কে কী বলেছে জানতে চাও?"

নবনী বিস্ফারিত চোখে বলেন, "তুই ছেলেদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছিস!"

boierpathshala.blogspot.com

আহিরী মুচকি হেসে বলে, “শুধু তাই নয়, টেন্টেও আমরা ভাগাভাগি করে থাকব। ওনলি ফর লেডিজ বলে কিছু থাকবে না। পাহাড়ে নারী পুরুষে ভাগাভাগি করা যায় না। প্রকৃতি জেন্ডার ডিভিশন পছন্দ করে না।”

সে দিন আর কথা বাড়াননি নবনী। এই মহিলা যে মেয়ের গাড়ি চালানো নিয়ে আপত্তি করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী! নবনী স্বামীকে বলেছিলেন, “আহি গাড়ি চালিয়ে কী করবে? আমাদের ড্রাইভার আছে, তোমার অফিসের গাড়ি আছে, তুমি নিজে গাড়ি চালাতে পারো। আর কী লাগবে?”

কমলেশ রায় হেসে বলেছিলেন, “তোমার যদি মাঝরাতে ময়দানে হাওয়া খেতে ইচ্ছে করে নবনী? অত রাতে
তো ড্রাইভার পাবে না। আমিও ঘুমোব। মেয়েই তখন ভরসা। তোমাকে নিয়ে যাবে।”

“কলকাতার রাস্তাঘাট এখন খুব বাজে। সারা ক্ষণ শুধু অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে।”

আহিরী বলেছিল, “মা, স্ট্যাটিসটিক্স বলছে, মেয়েরা অনেক কম অ্যাক্সিডেন্ট করে। তারা বেশি অ্যালার্ট, ধীরস্থির। ডোন্ট ওরি।
খুব শিগগিরই তোমাকে আর বাবাকে নিয়ে আমি লং ড্রাইভে যাব। চলো, দোলের সময় আমরা শান্তিনিকেতন যাই।”

নবনী জোর গলায় বলেছিলেন, “যাব না।”

শেষ পর্যন্ত অবশ্য যাওয়া হয়েছিল। বর্ধমান পর্যন্ত কমলেশ গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যান। বাকি পথ স্টিয়ারিং ধরেছিল আহিরী। সুন্দর নিয়ে গেছে। রাস্তা কোনও কোনও জায়গা খারাপ ছিল। তার পরেও ঝাঁকুনি কম দিয়েছে। যদিও নবনীকে প্রথম দিকটা দেখে মনে হচ্ছিল, দম বন্ধ করে বসে আছেন।

boierpathshala.blogspot.com

গাড়ি নিয়ে কলেজে এলে সুবিধে হয়। খরচ কম। তার থেকে বড় কথা, দেরি করে বাড়ি থেকে বেরনো যায়। বাস, ক্যাব, মেট্রোর জন্য তাড়াহুড়ো করতে হয় না। কলেজের পর দরকার মতো এ দিক-সে দিক যাওয়া যায়। বিতানের সঙ্গে দেখা করাটা সহজ হয়। দু'জনে এ দিক-ও দিক চলে যায়। বিতান রসিকতা করতে ছাড়ে না।

"রূপকথায় পড়েছি, রাজকুমার ঘোড়া নিয়ে এসে দাঁড়াত, রাজকন্যা লাফ দিয়ে উঠত পিঠে। রাজকুমার তখন ঘোড়া ছোটাত টগবগ টগবগ। এখন হচ্ছে উলটো। রাজকন্যা গাড়ি নিয়ে আসছে, রাজকুমার দরজা খুলে লাফ দিয়ে উঠছে। রাজকন্যা গাড়ি ছোটাচ্ছে সাঁইসাঁই করে।"

আহিরী গিয়ার বদলে গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দেয়। বলে, "তাও তো তুমি নিজেকে রাজকুমার ভাবতে পারছ।"

বিতান হেসে বলে, "বেকার রাজকুমার।"

নিজের গাড়িতে চড়ে অভ্যেস হয়ে গেছে আহিরীর। এখন গাড়ি ছাড়া চলাচল করতে অসুবিধে হয়। গাড়ি ছাড়া কলেজে এলে সিস্টেমে গোলমাল হয়ে যাবে।

পরীক্ষা চলার সময় দোতলা থেকে হালকা হট্টগোল ভেসে আসছিল। আহিরী গা করল না। কে জানে, ঝগড়া-টগড়া লেগেছে হয়তো। তিন নম্বর রো–এ একটা মেয়ে ওড়নার নীচে মোবাইল রেখে উত্তর টুকছিল। আহিরী তাকে হাতেনাতে ধরল। পুরুষ ইনভিজিলেটর হলে ধরা কঠিন ছিল। ছাত্রী হোক আর যাই হোক, সে তো একটা মেয়েকে বলতে পারত না, " দেখি তোমার ওড়নাটা সরাও তো।" বললে তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যেত। এই মেয়ে সম্ভবত সেই ভাবেই তৈরি হয়ে এসেছিল। ভাবতে পারেনি, তার ঘরেই

boierpathshala.blogspot.com

কোন ম্যাডাম

গার্ড দেবে।

আহিরী কাছে গিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, “দাও, মোবাইলটা দাও।”

“আর হবে না ম্যাডাম।”

আহিরী কড়া গলায় বলল, “মোবাইলটা দাও।”

মেয়েটি কঁাপা হাতে মোবাইল এগিয়ে দিল।

“তোমার নাম কী?”

“আর করব না।”

আহিরী কড়া গলায় বলল, “নাম কী তোমার? কোন ইয়ার?”

মেয়েটি মাথা নামিয়ে বলল, “উর্বী সেন। সেকেন্ড ইয়ার।”

আহিরী বলল, “এখনই এ সব শুরু করে দিলে? মোবাইলে কে তোমাকে উত্তর পাঠাচ্ছে?”

উর্বী নামের মেয়েটি চুপ করে রইল। আহিরী বলল, “আর ক’দিন পরীক্ষা বাকি আছে?”

“দু’দিন ম্যাম।”

আহিরী বলল, “ইচ্ছে করলে আমি তোমার খাতায় নম্বর মাইনাস করে দিতে পারি। খাতা ক্যানসেলও করে দিতে পারি। কিন্তু আমি সে সব কিছু করছি না। পরীক্ষা দাও। মোবাইল আমার কাছে রইল। অফিসে জমা থাকবে। দু’দিন পরে পাবে। এটাই তোমার পানিশমেন্ট।”

boierpathshala.blogspot.com

পরীক্ষা শেষ হলে, অফিসে খাতা দিল আহিরী। বাজেয়াপ্ত করা মোবাইল ফোন জমা দিতে গেলে নির্মাল্য বলল, “এটা কী?”

“সেকেন্ড ইয়ারের উর্বী সেন। ফোন দেখে টুকছিল। এক দিন আটকে রেখে দিয়ে দেবেন।”

নির্মাল্য হেসে বলল, “বাপ রে, মোবাইল নিয়েছেন! এর থেকে ওকে আটকে রাখলে বেঁচে যেত। এখনকার ছেলেমেয়েরা মোবাইল ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারে না।”

আহিরী বলল, “শুধু ছেলেমেয়েদের দোষ দিয়ে কী হবে? আমরাও কি পারি?”

টিচার্স রুমে এল আহিরী। ব্যাগ গুছিয়ে নিল। এ বার শর্মিষ্ঠা দত্তর কাছে যাবে। গিয়ে বলবে, পরীক্ষার আর দু’দিন বাকি রয়েছে। আর যেন তাকে ডিউটি না দেওয়া হয়। এ বার যারা দেয়নি, তারা দেবে। তার পরেও যদি রোস্টারে তার নাম রাখা হয়, সেও ব্যবস্থা নেবে। সিক লিভ নিয়ে নেবে।

যতটা সম্ভব মাথা ঠান্ডা করে টিচার্স রুম থেকে বেরল আহিরী। দোতলায় টিচার-ইন-চার্জের অফিস। সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই শুনতে পেল, ওপরে হইহট্টগোল হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা চিৎকার করছে। কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না। থমকে দাঁড়াল আহিরী। ঝনঝন করে কাচ ভেঙে পড়ল। কিছু ক্ষণের মধ্যেই মাটির কিছু একটা ভাঙা হল। তার পর চেয়ার ওলটানোর আওয়াজ। আহিরী কী করবে বুঝতে পারছে না। সে কি ওপরে যাবে? আবার ভাঙচুরের আওয়াজ। এ বার নীচেও ছেলেমেয়েরা ছোটাছুটি করছে। দুদ্দাড় করে ওপরে উঠছে। আহিরী এগোতে গিয়ে দেখল, গোপাল রক্ষিত দু’জন সিকিয়োরিটি গার্ডকে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে আসছে।

boierpathshala.blogspot.com

“কী হয়েছে?” উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল আহিরী।

“জানি না দিদি। শর্মিষ্ঠা ম্যাডাম ফোন করে ডেকে পাঠালেন। সায়েন্সের কোয়েশ্চেনে কী গোলমাল হয়েছে বলে ছেলেমেয়েরা নালিশ করতে গিয়েছিল, ম্যাডাম ভাগিয়ে দিয়েছে। ওরা ঘরের বাইরে এসে ভাঙচুর শুরু করেছে। আপনারা ওপরে যাবেন না।”

তত ক্ষণে আরও টিচাররা চলে এসেছে। সিঁড়ির মুখে জটলা। জানা গেল, অর্কপ্রভ সেন সিলেবাসের বাইরে থেকে প্রশ্ন করেছেন। পরীক্ষা চলার সময়ে ছেলেমেয়েরা তাঁকে জানায়। উনি বলেছেন, “এটা প্রাইমারি স্কুল নয় যে যা পড়াব তাই পরীক্ষায় আসবে। পরীক্ষা দিলে দেবে, না দিলে না দেবে।” পরীক্ষার পর ছেলেমেয়েরা টিটার-ইন-চার্জের ঘরে গেলে তিনি যাচ্ছেতাই বলে প্রায় গলাধাক্কা দিয়েছেন। ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এসে দরজার কাচ ভেঙেছে। করিডরে রাখা মাটির টব ভেঙেছে।

এ বার ওপরে স্লোগান শুরু হল, “নতুন ভবনের কোটি টাকা কোথায় গেল, শর্মিষ্ঠা দত্ত জবাব দাও।”

সিকিয়োরিটির লোকরা ওপরে গেলে ছাত্রদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। কিছু ক্ষণের মধ্যেই ঘটনা জটিল দিকে বঁাক নিল। ছাত্রদের মারা হয়েছে এবং ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে, এই অভিযোগে কলেজের মেন গেট আটকে ছেলেমেয়েরা সিঁড়িতে বসে পড়ে। টিচারদের কলেজ থেকে বেরতে দেওয়া হবে না। জানা গেল, শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছে সেকেন্ড ইয়ারের উর্বী সেন নামে এক ছাত্রী। নাম শুনে আহিরী অবাক হল। এই মেয়ে মোবাইল থেকে টুকছিল না?

boierpathshala.blogspot.com

কর্মজীবনে এই ধরনের পরিস্থিতিতে আহিরী আগে কখনও পড়েনি। আজ বিতানের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। সে ফোন বের করে নম্বর টিপল।

“যেতে পারছি না।”

বিতান মুখে চুকচুক আওয়াজ করে বলল, “ইস, আমি সেভ করে, চুল আঁচড়ে, ভাল শার্ট পরে তৈরি হলাম আর তুমি বলছ যেতে পারছি না। একটু পরেই না হয় এলে!”

“ঠাট্টা কোরো না। বেরতে রাত হতে পারে।”

বিতান আঁতকে উঠে বলল, “অ্যাঁ! কলেজের প্রফেসরদেরও কি নাইট ডিউটি শুরু হল? ভাগ্যিস লেখাপড়া শিখিনি!”

আহিরী গলা নামিয়ে বলল, “ঘেরাও হয়েছি। স্টুডেন্টরা গেট আটকে বসে পড়েছে। চিৎকার শুনতে পাচ্ছ না?”

বিতান বলল, “এই রে! আমি যাব?”

আহিরী বলল, “কী করবে? আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে?”

বিতান চিন্তিত হওয়ার ভান করে বলল, “তাও তো বটে। আমি গিয়েই বা কী করব? তার পরেও যদি বলো, তোমার বিপদের সময় পাশে না থাকাটা কি ঠিক হবে...”

বিতানের নাটকীয় ভাবে বলার ঢঙে আহিরী হেসে ফেলল। বলল, “আমার কোনও বিপদ হয়নি। ঠাট্টা বন্ধ করে তুমি নেক্সট উইকের জন্য ঠিকমত তৈরি হও।”

boierpathshala.blogspot.com

বিতান বলল, “কী আর তৈরি হব? বাড়িতে বলে পড়ার তো কিছু নেই। কোয়েশ্চেন তো সবই আনকমন। তার থেকে এক জন জ্যোতিষীর কাছে গেলে কেমন হয়?”

আহিরী অবাক গলায় বলল, “জ্যোতিষী!”

“চমকে উঠলে কেন? একটা চান্স নিতাম। যদি কোয়েশ্চেনের প্যার্টান বলে দিতে পারে। আজকাল জ্যোতিষীরা নানা রকম অ্যাপ ব্যবহার করছে। সে সব কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতের কাছাকাছি যদি আসতে পারে।”

আহিরী কথার মাঝখানেই বলল, “প্লিজ বি সিরিয়াস। বিতান, এ বার তোমার ভদ্রস্থ একটা কাজ পাওয়া খুব জরুরি হয়ে পড়েছে।”

বিতান একটু চুপ করে থেকে সামান্য হেসে বলল, “ভদ্রস্থ কাজ পেতে হলে এক জন ভদ্রলোক হতে হবে তো। আহিরী, আমি তো প্রপার ভদ্রলোকই নই।”

আহিরী নিজের ভুল বুঝতে পারল। কথাটা বেশি রুক্ষ হয়ে গেছে। এ ভাবে বলাটা ঠিক হয়নি। সে চাপা গলায় বলল, “স্যরি। আমি ও ভাবে বলিনি। তুমি একটা ভাল চাকরিবাকরি পেলে আমার ভাল লাগবে। তুমি ঠিক পাবে। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।”

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ৬

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

বিতান অল্প হেসে বলল, “আরে বাবা, আমি কিছু মনে করিনি। আমাকে কখনও মনে করতে দেখেছ?”

আহিরী নরম গলায় বলল, “সেই জন্যই তোমাকে বলি। এখন রাখছি। দেখি, গোলমাল কত দূর গড়াল।’

ফোন বন্ধ করে আহিরী টিচার্স রুমে আসে। বিতানের জন্য তার মন কেমন করে উঠল।

৩

“তোমার বাবার নাম কী?”

boierpathshala.blogspot.com

“স্যর, বাবার নাম শ্রী দেবাদিত্য বসু, মায়ের নাম শ্রীমতী শ্রীকণা বসু।”

কমলেশ রায় এত ক্ষণ টেবিলে রাখা কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে টুকটাক কথা বলছিলেন। তার মাথা বেশির ভাগ সময়েই ছিল নিচু। মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে বোন-চায়নার ফিনফিনে সাদা কাপ তুলে চুমুক দিচ্ছিলেন আলতো করে। কাপের গায়ে সরু সোনালি বর্ডার। চায়ের রংও সোনালি। দার্জিলিঙের ক্যাসলটন বাগানের চা। এই চা শুধুমাত্র জেনারেল ম্যানেজার এবং তার চেম্বারে আসা লোকজনকে দেওয়া হয়। চওড়া টেবিলের উলটো দিকে বসা ছেলেটির সামনেও একই রকম কাপে চা দেওয়া হয়েছে। পাশে একটা ছোট প্লেটে কয়েকটা কুকিজ। ছেলেটি এখনও পর্যন্ত কোনওটাই ছোঁয়নি। হাত গুটিয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে। এ ঘরে তার জড়সড় হয়ে বসে থাকারই কথা। কোনও অফিসে জেনারেল ম্যানেজারের ঘরে নতুন কোনও এমপ্লয়ি ঢুকলে সে খানিকটা জড়সড় হয়েই থাকে। যথেষ্ট স্মার্ট হলেও থাকে। এই ছেলেও প্রথম ঢুকেছে। চাকরির ইন্টারভিউয়ের সময় কমলেশ রায়কে একে দেখেছিল। কনফারেন্স রুমে তিনি অনেকের সঙ্গে বসেছিলেন। কোনও প্রশ্ন করেননি। মুখ তুলেও তাকাননি। ফাইল দেখছিলেন। সেও তো অনেক দিন হয়ে গেল।

ছেলেটির জবাব শুনে কমলেশ রায় ভুরু কোঁচকালেন। ভুরু কোঁচকানো অবস্থাতেই মুখ তুললেন।

“কী নাম বললে?”

ছেলেটি গলা নামিয়ে বলল, “দেবাদিত্য বসু এবং শ্রীকণা বসু।”

এত ক্ষণ এই ছেলেটির চোখের দিকে কমলেশ সে ভাবে তাকাননি। ঘরে ঢোকার সময় এক ঝলক দেখেছেন। ঝকঝকে চেহারা। সুদর্শন এবং স্মার্ট।

boierpathshala.blogspot.com

কালো ট্রাউজারের ওপর হালকা নীল চেকের সরু ফর্মাল শার্ট পরেছে। তখনও চোখমুখ খেয়াল করেননি। এ বার করলেন। ছেলেটির চোখে এক ধরনের মায়া রয়েছে। খুব প্রকট কিছু নয়, ছায়ার মতো লেগে আছে। নজর করে দেখলে বোঝা যায়। পুরুষমানুষের চোখে মায়া মানায় না। এই ছেলেটির ক্ষেত্রে মানিয়েছে। তাকে সুন্দর লাগছে।

কয়েক মুহূর্তের অস্বস্তি। নিজেকে দ্রুত সামলালেন কমলেশ। ফের কাপ তুলে আলতো চুমুক দিলেন। ধুস, এ সব কী ভাবছেন! কর্মচারীর চোখে মায়া না নিষ্ঠুরতা তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? ভুরু কোঁচকানোর মতোই বা কী ঘটেছে? শ্রীকণা অন্য কারও নাম হতে পারে না? কমলেশ নাম কি শুধু তার একারই রয়েছে? মোটেও নয়। জগতে কত জনের নাম যে 'কমলেশ' তার ঠিক নেই। স্কুলেই তো আরও দু'জন কমলেশ ছিল। ছেলেরা সকলকে আলাদা আলাদা নামে ডাকত। এক জন ছিল লম্বা। তাকে ডাকা হত 'ঢ্যাঙা কমলেশ'। দ্বিতীয় কমলেশেরও একটা নাম ছিল। ক্লাস এইটে এসে ভর্তি হল সেই ছেলে। নাকি নাইনে? ছোটখাটো চেহারা। নামটাও হয়েছিল মজার। কী যেন নাম? নাহ্, এখন আর মনে পড়ছে না। তবে নিজেরটা মনে আছে। বন্ধুরা তাকে ডাকত 'ফুল মার্কস কমলেশ'। পরীক্ষায় ফুল মার্কস পাওয়ার কল্যাণে এই নাম। কেউ কেউ ছোট করে বলত, 'ফুল কমলেশ'। ছোটকাকা এই নাম শুনে বলল, ''ঠিকই আছে। ফুল মার্কস পাওয়া ছেলেরা বেশির ভাগ সময়ই 'ফুল' হয়। স্কুল-কলেজের পরীক্ষার নম্বর নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে থাকে যে জীবনের বাকি পরীক্ষাগুলোয় কখন জিরো পেয়ে বসে আছে জানতেই পারে না। যখন জানে তখন নিজেকে বোকা মনে হয়।''

boierpathshala.blogspot.com

‘কমলেশ’ এতগুলো থাকলে, ‘শ্রীকণা’ থাকতে অসুবিধে কী? এ বার মনে মনে লজ্জা পেলেন কমলেশ। জীবনের অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। নদীতে অনেক ঢেউ এসেছে, আবার চলেও গেছে নিজের মতো। তীরে পড়ে থাকা নুড়ি–পাথরের দাগ বারবার মুছে দিয়েছে। নুড়ি পাথরের সেই সব দিনগুলোর কথা কেউ মনে রাখে না। তিনিও রাখেননি।

সামনে বসা ছেলেটির প্রতি আরও এক বার প্রসন্ন হলেন কমলেশ। এই ছেলে সত্যি ভাল। সাধারণ ‘ভাল ছেলে’দের মতো নয়, তার থেকে বেশি ভাল। বাবার নাম জিজ্ঞেস করায়, একসঙ্গে মায়ের নামও বলল। বাঙালি ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই অভ্যেস একবারেই নেই। যেন বাবার পরিচয়ই শেষ কথা। মায়ের কথা মনে থাকে না। যুগ যুগ ধরে এই বিশ্রী অভ্যেস চলে আসছে। তিনি নিজেও তো তাই। কখনও কি বাবার সঙ্গে মায়ের নাম বলেছেন? মনে পড়ছে না। এখন কি আর এই অভ্যেস বদলানো যাবে? এই বয়সে? অবশ্য এখন তো আর কেউ তাকে বাবা-মায়ের নাম জিজ্ঞেস করবে না। করলে ভাল হত। নিজেকে শুধরে নেওয়া যেত।

কমলেশ নরম গলায় বললেন, “তোমার বাড়ি কোথায় সৌহার্দ্য?”

“স্যর, এখন টালিগঞ্জে। আগে থাকতাম হুগলিতে, জনাইয়ের কাছে।”

“জনাই! এক সময়ে ওখানে আমার এক মাসি থাকতেন। বাড়িতে পুজো হত। ছোটবেলায় যেতাম। জনাইয়ের কোথায়?”

“ঠিক জনাইতে নয় স্যর। আরও খানিকটা যেতে হত। গ্রামের নাম ছায়াপাতা।”

কমলেশ বললেন, “ছায়াপাতা! এই নামের মানে কী?”

boierpathshala.blogspot.com

“এই নামে আমাদের গ্রামে একটা নদী আছে। মনে হয় সেখান থেকে গ্রামের নাম হয়েছে।”

কমলেশ অল্প হেসে বললেন, “নদীর নাম ছায়াপাতা! সুন্দর নাম।”

“নদী ছোট স্যর। গরমের সময় হেঁটে পার হওয়া যেত।”

কমলেশ একটু অবাক হলেন। এই ছেলের হাবভাব, কথাবার্তার মধ্যে গ্রাম, নদীর চিহ্নমাত্র নেই। তার বদলে যদি বলত, ছোটবেলায় মুম্বইয়ের দাদার বা বেঙ্গালুরুর কোরামঙ্গলায় থাকতাম, তা হলে মানাত। নিশ্চয়ই অনেক ছোটবেলায় চলে এসেছে। কমলেশ নিজেকে সামলে বললেন, “ভেরি গুড। নিজেদের বাড়ি?”

“হ্যাঁ স্যর। নিজেদের বাড়ি ছিল।”

ছিল! এখন নেই? কমলেশ ভুরু কোঁচকালে সৌর্হাদ্য নিজে থেকেই বলল, “বাবা মারা যাওয়ার পর আমি আর মা কলকাতায় চলে আসি। আমি অবশ্য তার আগে থেকেই কলকাতার হোস্টেলে থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শুরু করেছিলাম।”

কমলেশ নিচু গলায় বললেন, “ওহো, স্যরি।”

অফিসের কর্মচারীদের সঙ্গে এত ব্যক্তিগত স্তরে নেমে কমলেশ কথা বলেন না। কর্মীদের সঙ্গে দূরত্ব রাখাটা ম্যানেজারদের ডিউটির মধ্যে পড়ে। তাঁর মতো জেনারেল ম্যানেজারের জন্য তো বটেই। ভীষণ জরুরি কিছু না থাকলে জেনারেল ম্যানেজারের ঘরে তার ঢোকার সুযোগও পাওয়ার কথা নয়। সৌহার্দ্য অবশ্য এই ঘরে নিজে থেকে ঢোকেনি, তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। কমলেশ নিজেই ডেকেছেন। গত শনিবার লাঞ্চের পর ফিনান্স ম্যানেজার মনোজ ত্রিপাঠী

boierpathshala.blogspot.com

ইন্টারকমে তাঁকে ধরেন। সবাই 'ত্রিপাঠী' নামে চেনে। এই অফিসে তার পজিশন কমলেশ রায়ের পরেই। কমলেশ সব বিষয়ে এঁর ওপর নির্ভর করেন।

ত্রিপাঠী বলল, "স্যর, দশ মিনিট টাইম
দিতে হবে।"

কমলেশ বলেছিলেন, "অসম্ভব। গাদা কাজ নিয়ে বসে আছি। তোমরা যেখানে যত জট পাকাও, আমাকে খুলতে হয়। আজ শনিবার ভেবেছিলাম তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাব, বুঝতে পারছি রাত হয়ে যাবে। এ বার চাকরিবাকরি ছেড়ে পালাব।"

ত্রিপাঠী হেসে বললেন, "আপনি তো কম বার পালাতে চেষ্টা করেননি স্যর। রেজিগনেশন পাঠিয়ে দিয়েও মুক্তি পাননি। কোম্পানি ছাড়েনি। ছাড়বেও না। আপনি যত ব্যস্ত থাকুন, আমি আপনার ঘরে যাচ্ছি স্যর। নতুন প্রোজেক্টের ফাইলটা কালকের মধ্যে ব্যাঙ্কে না পাঠালে লোন আটকে যাবে। এই নিয়ে ওরা তিন বার অ্যালার্ট করেছে। আজও তো রীতিমত থ্রেট করল। বলল, আর দেরি করলে লোন প্রোপোজাল ক্যানসেল হয়ে যাবে।"

কমলেশ বললেন, "তুমি ছেড়ে দাও ত্রিপাঠী।"

ত্রিপাঠী বললেন, "হবে না স্যর। কয়েকটা বিষয় আপনাকে ওয়াকিবহাল করতে হবে। অত টাকার ব্যাপার, ব্যাঙ্ক যখন-তখন ফোন করে আপনার কাছে কোয়্যারি করতে পারে। জাস্ট ফিফটিন মিনিটস স্যর।"

সেই পনেরো মিনিটের মিটিঙেই সৌহার্দ্যের ঘটনা জানতে পারলেন কমলেশ। কাজ করতে করতেই ত্রিপাঠী বলে দিলেন।

boierpathshala.blogspot.com

“অফিসে নতুন একটি ছেলে অ্যাকাউন্টসের অদ্ভুত একটা ভুল ধরেছে।”

কমলেশ বলেন, “অ্যাকাউন্টসে কাজ করা ছেলে, হিসেবে ভুল ধরেছে এ আর ইন্টারেস্টিং কী হল? তার কাজই তো ভুল ধরা।”

ত্রিপাঠী হেসে বলেন, “না স্যর, ওই ছেলে অ্যাকাউন্টসে জয়েন করেনি, হি ইজ অ্যান ইঞ্জিনিয়র। আমরা নতুন প্রোজেক্টের জন্য নিয়েছি। বাচ্চা ছেলে, কিন্তু ইতিমধ্যেই এক্সপিরিয়েন্স-রিচ। বেশ ক’টা কোম্পানিতে কাজ করে এসেছে। ইন্টারভিউয়ের সময় আপনি ছিলেন।”

কমলেশ বললেন, “মে বি। মনে নেই আমার। ওর হাতে অ্যাকাউন্টস গেল কী করে?”

ত্রিপাঠী বললেন, “প্রোজেক্ট তৈরির সময় ও হিসেবপত্রের কিছু কাগজ চেয়েছিল, ভায়াবিলিটি প্রোজেকশন তৈরি করতে। তখনই ভুলটা মার্ক করেছে। তার পর কম্পিউটারে বেশ কয়েক বছরের ট্যাবুলেশন দেখে, ভুল সম্পর্কে কনফার্মড হয় আর আমাকে জানায়। আশ্চর্যের বিষয়, বেশ কয়েক বছর ধরে এই ভুল চলছিল। ফলে অতি সামান্য হলেও কোম্পানিকে একটা লোকসান বেয়ার করতে হয়েছে। সেই লোকসানের পরিমাণ বিন্দুর মতো, কিন্তু এত বছরের বিন্দু যোগ করলে পরিমাণ একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয় স্যর। হিসেবের এমন জায়গায় ভুলটা মাথা নিচু করে লুকিয়ে ছিল যে কারও চোখে পড়েনি। ছেলেটি ধরল।”

কাজ থামিয়ে দেন কমলেশ। মুখ তুলে প্রশংসা ভরা গলায় বলেন, “বাহ্, নাম কী ছেলেটির?”

ত্রিপাঠী উৎসাহের সঙ্গে বলে, “সৌহার্দ্য, সৌহার্দ্য বোস। সবে জয়েন করেছে।”

boierpathshala.blogspot.com

কমলেশ বললেন, “ছেলেটির সঙ্গে আমার আলাপ করতে ইচ্ছে করছে।”

ত্রিপাঠী এ বার আরও উৎসাহ নিয়ে বলেন, “করুন না স্যর, খুব ভাল হয়। ছেলেটির ভাল লাগবে। তা ছাড়া... তা ছাড়া এই ধরনের কাজ করলে কোম্পানি পাশে থাকে, সেটাও বুঝবে।”

কমলেশ বললেন, “ঘটনাটা অফিসের সবাই জেনেছে?”

“সবাই নয়, অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের স্টাফরা জেনেছে। তবে বুঝতেই তো পারছেন, বিষয়টা এমন নয় যে সবার পছন্দ হবে। এত বছর পরে একটা জিনিস ধরা পড়ল, আর সেটা করল কিনা এক জন নিউকামার। যার এক্তিয়ারে অ্যাকাউন্টস পড়েই না। জেলাসি তো হবেই। সেই কারণেই আপনি যদি ডেকে কথা বলেন, অফিসে একটা মেসেজ যাবে। আমি আজ এক বার দেখা করতে বলি?”

পর্ব ৭

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

boierpathshala.blogspot.com

কমলেশ তাড়াতাড়ি বলেছিলেন, “না না, আজ নয়। দেখছ না আজ কী অবস্থা? তুমি বরং সোমবার পাঠাও। লাঞ্চের পর কোনও একটা সময়ে... ঠিক আছে তিনটের সময়। ওর সঙ্গে চা খাব। যাবার সময় নিলয়কে বলে যাও, ও যেন অ্যাপয়েনমেন্টে নোট করে রাখে। কী নাম বললে যেন?”

“সৌহার্দ্য, সৌহার্দ্য বসু।”

ত্রিপাঠী বেরনোর সময় নিলয়কে খাতায় অ্যাপয়েনমেন্ট লিখিয়ে দিল। নিলয় গত পাঁচ বছর ধরে কমলেশ রায়ের পিএ-র কাজ করছে। চৌখস ছেলে। বসের চেম্বারের সামনে টেবিলে বসে থেকে অফিসের অনেক খোঁজখবর রাখে। ‘সৌহার্দ্য’ নামটা শুনে বলল, “স্যর, কোন সৌহার্দ্য? নতুন জয়েন করেছে যে?”

ত্রিপাঠী ঘাড় নাড়লেন। নিলয় বলল, “স্যর কি ওকে প্রাইজ দেবেন?”

ত্রিপাঠী এই ছেলেটিকে খুব একটা পছন্দ করেন না। কৌতূহল বেশি।

“তুমিও তা হলে খবর পেয়ে গেছ?”

নিলয় প্রশ্নের জবাব দিল না। সামান্য হাসল। বলল, “সবাই কিন্তু ভাল ভাবে নেয়নি স্যর। মাত্র ক’দিন ঢুকেই...”

ত্রিপাঠী খানিকটা কড়া গলায় বললেন, “আমারও তো সেটাই প্রশ্ন। যারা এত দিন আছে, তারা কী করছিল? হয় ধরতে পারেনি, নয় জেনেও চুপ করে ছিল।”

নিলয় দ্রুত নিজেকে বদলে ফেলে বলল, “ঠিকই, স্যর। তা হলে কাল তিনটে লিখে রাখি?”

boierpathshala.blogspot.com

সেই সৌহার্দ্য এসেছে তিনটে বাজবার দশ মিনিট আগে। তাকে অপেক্ষা করতে হয় আরও কুড়ি মিনিট। কমলেশ রায় ওর্য়াকশপ ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ওয়ার্কশপে একটা ছোট সমস্যা হয়েছে। বাইরের কোনও একটা ক্লাব থেকে ছেলেপিলে এসে টাকা চেয়েছে। 'তোলা' যাকে বলে। হুমকি দিয়ে গেছে। দীর্ঘ কর্মজীবনে কমলেশ বুঝেছেন, এই ধরনের সমস্যা হল ফোঁড়ার মতো। ফেলে রাখলে পেকে গিয়ে যন্ত্রণা বাড়ায়। ওর্য়াকশপ ম্যানেজারকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ছেলেগুলো কে? কত বড় গুন্ডা? এত দিন পরে হঠাৎ সাহস হল কোথা থেকে? নেতা কে? কিছু টাকা দিতে কোনও অসুবিধে নেই, কিন্তু তাতে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। সবটা বুঝতেই ওয়ার্কশপ ম্যানেজারকে ডেকে কথা বলতে চেয়েছিলেন। তার সঙ্গে কথা সেরে সৌহার্দ্যকে ঘরে ডেকে নিয়েছেন। ইন্টারকমে চা দিতে বললেন।

"সৌহার্দ্য, তোমার কথা শুনলাম। ভেরি গুড।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যর।"

"তুমি কোন স্ট্রিম নিয়ে বি টেক করেছ?"

"মেকানিক্যাল, স্যর। তবে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছে ছিল না। ফিজিক্স নিয়ে জেনারেল স্ট্রিমে পড়তে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম রিসার্চ করব। সুযোগ হয়নি।"

'সুযোগ হয়নি' ধরনের কথা কমলেশের পছন্দ নয়। এটা হেরে যাওয়া কথা। যারা পারে না, তাদের কথা। সুযোগ হয় না, সুযোগ নিজেকে করে নিতে হয়। কমলেশ বললেন, "চা খাচ্ছ না কেন? খাও।"

boierpathshala.blogspot.com

সৌহার্দ্য হাত বাড়িয়ে কাপটা নিল। সাবধানে ধরে চুমুক দিল। তার ভঙ্গি দেখে মনে হল, দামি কাপটা নিয়ে সে খানিকটা সতর্ক। কমলেশ আবার চোখ নামিয়ে নিলেন। কাগজপত্র দেখতে লাগলেন। দামি কাপ-ডিশে চা খাবার অভ্যেস তার ছোট থেকেই। খুব ধনী না হলেও উচ্চবিত্ত ঘরের ছেলে ছিলেন তিনি। পরিবার যতই স্বচ্ছল হোক, অভিজাত হোক, একটা জিনিস তিনি বুঝেছিলেন, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। স্কুল পেরিয়ে কলেজ, তার পর চার্টার্ড পাশ। শেষে বিদেশে গিয়ে দু'বছর ম্যানেজমেন্ট পড়া। লম্বা জার্নি। পরিশ্রম করতে হয়েছে। নিজে সুযোগ তৈরি করে, সেই সুযোগ নিজেকেই দিতে হয়েছে। ফুটবল খেলার মতো। একে ড্রিবল করে, তাকে ট্যাকল করে গোলের সামনে বল এগিয়ে নাও। মনে রেখো, গোলে নিজেকেই মারতে হবে।

"তোমার বাবা কী করেন?"

"স্যর, স্কুলে পড়াতেন। ওই ছায়াপাতা গ্রামেই স্কুল ছিল।"

কমলেশ মনে মনে বোঝার চেষ্টা করলেন, এই ছেলের বয়স কত?

"বাবার কী হয়েছিল?"

"হার্টের সমস্যা ছিল।"

"ওহো।"

কমলেশ চুপ করে রইলেন। এত কথা বলা ঠিক হচ্ছে না। কাজে নতুন জয়েন করে সে একটা ভাল পারফরমেন্স দেখিয়েছে। তার মানে এই নয়, তার পরিবারের এত সব খুঁটিনাটি জানতে হবে। কেন তিনি এমন করছেন? সৌহার্দ্যও সম্ভবত বুঝতে পারল, বেশি ক্ষণ থাকা হয়ে গেছে। সে চায়ের কাপে দ্রুত চুমুক দিল।

boierpathshala.blogspot.com

“স্যর, আমি কি এ বার উঠতে পারি?”

কমলেশ বললেন, “হ্যাঁ, এস। তোমার তো কাজ আছে। শোন সৌহার্দ্য, তুমি যা করেছ সেটা কোম্পানির জন্য ভাল হয়েছে। আমরা খুশি হয়েছি। এত দিন চোখ এড়িয়ে যাওয়া একটা ভুল তুমি নোটিস করিয়ে দিলে। এ রকম সিনসিয়ারিটি নিয়ে এবং অ্যালার্ট হয়ে কাজ করবে। আই উইশ ইউ অল সাকসেস।”

সৌহার্দ্য উঠে দাঁড়ায়। কমলেশ উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে তার হাতটা চেপে ধরেন। ঝাঁকিয়ে বলেন, “ভাল থাকো। মন দিয়ে কাজ করো।”

সৌহার্দ্য চলে যাওয়ার জন্য ঘুরতে যায় আর তখনই একটা ছোট অঘটন ঘটে। তার বাঁ হাতের আলতো ধাক্কায় বোন-চায়নার ফিনফিনে কাপটা টেবিল থেকে মোটা, নরম কার্পেটের ওপর পড়ে এবং ভেঙে যায় অতি হালকা আওয়াজ করে। সৌহার্দ্য সে দিকে ফিরেও তাকায় না। যেন কাপ পড়ে যাওয়ার ঘটনা সে জানতে পারেনি।

সৌহার্দ্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আরও একটু অপেক্ষা করেন কমলেশ। তার পর ইন্টাকমে পর পর দুটো নম্বর ধরেন। প্রথমটা নিলয়কে।

“ক্লিনিং-এর কাউকে পাঠাও। ঘরে একটা কাপ ভেঙেছে।”

পরের ফোনটা ধরেন ত্রিপাঠীকে।

“শোনো, এই ছেলেটির জন্য কিছু করা যায়?”

ত্রিপাঠী একটু অবাক হয়ে বলল, “কার কথা বলছেন স্যর?”

কমলেশ রায় বললেন, “আরে ওই যে, তোমার সৌহার্দ্য।”

boierpathshala.blogspot.com

ত্রিপাঠী এ বার তড়িঘড়ি বললেন, “ওহো, আজ গিয়েছিল তো। আমার খেয়াল ছিল না স্যর। কী করতে বলছেন?”

কমলেশ একটু চুপ করে থেকে বললেন, “একটা ইনক্রিমেন্ট যদি বাড়িয়ে দেওয়া যায়। রিওয়ার্ডস হিসেবেই ধরো, অথবা একটা পোস্ট লিফট করে দাও যদি।”

“আপনি যদি চান তাহলে এইচ আর ডিপার্টমেন্টকে বলছি স্যর, কিন্তু... আমার মনে হয় এই মুহূর্তে এত কিছু না করাই ভাল। এমনিতেই এক্সপিরিয়েন্স থাকার জন্য আমরা ওকে খানিকটা লিফট দিয়েই এনেছি। নেগোসিয়েশনের সময় ও যা চেয়েছিল। আপনি ডেকে চা খাইয়েছেন, ব্যস, আপাতত ওটাই এনাফ। বেশি করলে মনে হবে, কোম্পানি এত দিন হিসেবে বড় কোনও গোলমাল করছিল, আমরা বিরাট কোনও লসের হাত থেকে বঁাচলাম। সেটা মনে হয় ঠিক হবে না।”

কমলেশ একটু ভেবে বললেন, “দ্যাট’স ট্রু।”

ত্রিপাঠী বললেন, “তার পরেও যদি বলেন আমি ফাইলটা দেখতে পারি।”

“দরকার নেই। তুমি বরং একটা কাজ করো ত্রিপাঠী। এইচ আর হেডকে বলে দাও, এ বার থেকে এমপ্লয়িদের পার্সোনাল ফাইলে মাদার্স নেম মাস্ট। মায়ের নাম লিখতেই হবে। আদারওয়াইজ সার্ভিস বুক কমপ্লিট হবে না।”

ত্রিপাঠী খানিকটা হতচকিত হয়ে বললেন, “মায়ের নাম! আমি কি স্যর এইচ আর হেডকে একটা ফোন করতে বলব?”

কমলেশ বললেন, “না, তুমি বলে দাও।”

boierpathshala.blogspot.com

ফোন রেখে ফাইল টানলেন কমলেশ রায়। একটু পরেই বুঝতে পারলেন, কাজে পুরোপুরি মন বসছে না। ভিতরে এক ধরনের অশান্তি হচ্ছে। অশান্তি ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। খচখচ চলতেই লাগল। আরও খানিক পরে অশান্তির কারণ ধরতে পারলেন কমলেশ। সৌহার্দ্য বসুর মায়াভরা চোখদু'টো তার পরিচিত। এই চোখ তিনি আগে কোথাও দেখেছেন। কোথায় দেখেছেন?

টেবিলের ওপর রাখা মোবাইল বেজে ওঠে। স্ক্রিনে মেয়ের মুখের ফোটো। প্রত্যেক বারের মতো আজও ফোন ধরার আগে কয়েক মুহূর্ত মেয়ের ফোটোর দিকে তাকিয়ে রইলেন কমলেশ। ফোটোটা আহিরীই বাবার মোবাইলে সেভ করে দিয়েছে। তার পাঁচ বছর বয়সের মুখ। দুষ্টুমিতে ভরা। এই মুখ এক বার না দেখে ফোন কানে নিতে পারেন না কমলেশ।

৪

শ্রীকণা বললেন, "নতুন অফিস কেমন লাগছে?"

সৌহার্দ্য স্নান করে এসেছে। মাথায় তোয়ালে ঘষতে ঘষতে বলল, "সবে তো কিছু দিন হল। মনে হয়, আরও ছ'মাস ভাল লাগবে। তার পর আর নয়।"

শ্রীকণা বললেন, "এ বার একটা কোথাও থিতু হয়ে বোস। বছর কাটতে না কাটতে তো অফিস বদলে ফেলছিস। এই নিয়ে ক'টা কোম্পানি হল বল তো?"

সৌহার্দ্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কোমরে বড় একটা সাদা তোয়ালে জড়ানো, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। মায়ের সঙ্গে সে আয়নার মধ্যে দিয়ে কথা

boierpathshala.blogspot.com

বলছে। তার চেহারা নিয়মিত জিমে যাওয়া, পেটানো। এই ছেলেকে অবশ্যই রূপবান বলা যায়।

“এখন এটাই নিয়ম মা। কোম্পানি জাম্প করতে হয়। বেটার থেকে বেটার থেকে বেটার। যত ক্ষণ না তুমি প্রপারলি জাজড হচ্ছ, তোমার এমপ্লয়াররা তোমার কদর বুঝতে পারছে। তার পর এ কসময় সাঁইইই।”

সৌহার্দ্য ডান হাত দিয়ে প্লেনের উড়ে যাওয়া দেখাল। শ্রীকণার ছেলের কথা পছন্দ হল না। ছেলেটা বড্ড কেরিয়ার-পাগল হয়ে গেছে। যত দিন যাচ্ছে পাগলামি বাড়ছে। টাকা চিনেছে খুব। শুধু উপার্জন নয়, দু’হাতে খরচ করতেও শিখেছে। তবে শুধু নিজের জন্য নয়, মায়ের জন্যও খরচ করে। সে সবের অনেক কিছু বেহিসাবি খরচ। বারণ করলে খেপে যায়। সৌহার্দ্য যে দিন তার ঘরে এসি মেশিন লাগিয়ে দিল, সে দিন তো শ্রীকণা যথেষ্ট রাগারাগি করেছিলেন।

“তুই কি খেপে গিয়েছিস সোহো? এসি দিয়ে আমার কী হবে? চার তলার ওপর ফ্ল্যাট। তার ওপর আমার ঘরটা দক্ষিণমুখী। জানলা খুলে দিলে হাওয়ায় ভাসিয়ে দেয়। এসি চালিয়ে মরব না কি? আমার ও সব অভ্যেস নেই বাপু।”

সৌহার্দ্য বলেছিল, “সামান্য মাস্টারের বউ হয়ে অনেক কষ্ট করেছ। আর নয়, এখন তুমি এক জন ওয়েল প্লেসড ইঞ্জিনিয়ারের মা। এ বার নতুন করে লাইফ এনজয় করো। কোনও কিছুতে পুরোপুরি স্যাটিসফায়েড হবে না। ভাববে, আরও ভাল চাই। এই যে ফ্ল্যাটে আমরা রয়েছি, এটা আর আমার পছন্দ হচ্ছে না। কলকাতায় যা পলিউশন তাতে আরও ওপরে থাকা উচিত।”

ছেলের এই কথায় শ্রীকণা আরও বিরক্ত হন। বলেন, “জীবন তো শেষ করে আনলাম। আর কী এনজয় করব?”

boierpathshala.blogspot.com

সৌহার্দ্য বলে, “তোমার মতো করে এনজয় করবে। খাবেদাবে, বেড়াবে। পুজোর সময় তোমাকে নিয়ে কুলু–মানালি যাব ভেবেছি। কেমন হবে? তোমার অন্য কোনও প্ল্যান থাকলে বলতে পারো।”

শ্রীকণা বললেন, “ধুস, পাগল! আমি কোথাও যাব না।”

সৌহার্দ্য চুল আঁচড়াতে অঁাচড়াতে বলল, “একটা সময় সংসারে টাকাপয়সা ছিল না। বাবা ধারদেনা করে জমি-বাড়ি কিনে বসল। এক বারও ভাবল না, সংসার কী ভাবে চলবে। ওইটুকু তো বেতন ছিল, তাই দিয়ে মাসের প্রথমে লোন মেটাতে হত, ফলে বাকি দিনগুলো খঁুড়িয়ে চলতে। এখন আর নয়।”

শ্রীকণা ছেলের ছেড়ে রাখা জামা গোছাতে গোছাতে বললেন, “তোর বাবা শান্তশিষ্ট পাড়াগঁা পছন্দ করত। সেই জন্যই ওখানে জমি-বাড়ি কিনেছিল। খুব দাম তো ছিল না। ভেবেছিল, সারা জীবন থাকবে।”

সৌহার্দ্য বলল, “ভুল করেছিল।”

শ্রীকণা বললেন, “অমন ভাবে বলছিস কেন? তোকে তো লেখাপড়া শিখিয়েছে। মানুষ করেছে।”

সৌহার্দ্য ট্রাউজার্স পরতে পরতে বলল, “কোথায় শিখিয়েছে? আমার তো হায়ার স্টাডিজ করবার ইচ্ছে ছিল। হায়ার সেকেন্ডারিতে আমার রেজাল্টও খুব ভাল ছিল। স্বপ্ন দেখতাম, বিজ্ঞান নিয়ে পড়ব। গবেষণা করতে বিদেশে যাব। সে সব আর হল কই? বাবা তো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পাঠিয়ে দিল, যাতে তাড়াতাড়ি রোজগার শুরু করি। এটা লেখাপড়া শেখানো হল?
আমি মানুষ হলাম ঠিকই, কিন্তু সেটা রোজগেরে মানুষ। বাবার ইচ্ছেমত

boierpathshala.blogspot.com

মানুষ। আর এখন তাতেই আমি আমার সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলেছি। হায়ার স্টাডিজ গো টু হেল।”

পর্ব ৮

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

শ্রীকণা চুপ করে রইলেন। এটা অভিমানের কথা। এটা সত্যি যে ওর বাবা-ই জোর করে ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছেন। সৌহার্দ্য যখন গঁাইগুই করেছিল, রেগে গিয়েছিলেন। “শুধু পণ্ডিত হলে ভাত জুটবে? জেনারেল স্ট্রিমে পড়াশুনো করে কী করবি? আমার মতো স্কুলমাস্টার হবি?”

সৌহার্দ্য বাবাকে ভয় পেত। একেবারে পছন্দ করত না। যতটা সম্ভব এড়িয়ে থাকা যায় তার চেষ্টা করত। মানুষটা ছিল রগচটা। যুক্তি শুনতে চাইত না। দুমদাম খেপে যেত। নিজে যা ঠিক মনে করত, হাজার ভুল হলেও সেখান থেকে নড়ত না। ধ্যানধারণাও পুরনো দিনের। পরিবারে তার কথাই ছিল শেষ কথা। শ্রীকণা ঠিক তার উলটো। শান্ত, স্নিগ্ধ। বাবার উচ্চকিত ব্যক্তিত্বের কাছে

boierpathshala.blogspot.com

চুপ করে থাকা এক জন মানুষ। সৌহার্দ্য ছোটবেলা থেকেই দেখছে, বাবার ধমক-ধামকের সামনে এই মহিলা সব সময়েই গুটিয়ে থাকে। যেন বিরাট কোনও অপরাধ করেছে। মাকে আড়ালে বহু বার কাঁদতেও দেখেছে সৌহার্দ্য। মায়ের ওপর রাগ হত। সেই রাগ থেকেই তৈরি হত টান। বাবার কাছ থেকে যত সরে এসেছে সে, তত কাছে এসেছে মায়ের।

বাবার কথায় সৌহার্দ্য সে দিন নিচু গলায় বলেছিল, ‘‘আমি ফিজিক্স পড়ব। আমি অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে গবেষণা করতে চাই।’

‘‘অ্যাস্ট্রোফিজিক্স! এই সব পাকামি তোমার মাথায় কে ঢোকাল? গবেষণা মানে তো বুড়ো বয়স পর্যন্ত বেকার।’’

সৌহার্দ্য বলল, ‘‘বেকার কেন হবে? স্কলারশিপ জোগাড় করব। বিদেশে যাব।’’

‘‘এখন ও সব ভাবতে হবে না! আগে মন দিয়ে জয়েন্ট এন্ট্রান্স দাও। তার পর দেখা যাবে।’’

সৌহার্দ্য তার মা’কে ধরেছিল। শ্রীকণা স্বামীকে বলেছিলেন। একেবারেই সুবিধে হয়নি।

‘‘যা বোঝো না, তার মধ্যে ঢুকো না। এটা ছেলের সঙ্গে আদিখ্যেতার ব্যাপার নয়। এটা ওর কেরিয়ারের বিষয়। ও যা ভাবছে, তত দূর পর্যন্ত যেতে না পারলে জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। একমুখ দাড়ি আর কাঁধে ব্যাগ নিয়ে ফ্যা-ফ্যা করে প্রাইভেট টিউশন করতে হবে। আমি যা ঠিক করেছি সেটাই হবে। ওকে এমন বিষয় নিয়ে পড়তে হবে যাতে চাকরি পেতে অসুবিধে না হয়। সংসারে যেন দু’টো পয়সা দিতে পারে। এই যে বাড়ি-জমির জন্য গাদাখানেক লোন

boierpathshala.blogspot.com

করে ফেলেছি, তা তো ওকেই টানতে হবে। এই নিয়ে আর বিরক্ত কোরো না। আমি আমার ছেলেকে চিনি, তার দৌড় জানি।”

শ্রীকণা বলেছিলেন, “আমিও চিনি। সোহো খুব ভাল ছেলে।”

“চুপ করো। তুমি কেমন মানুষ চেনো, নিজের জীবন দিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পাওনি?”

শ্রীকণা থমকে গিয়ে নিচু গলায় বলেছিলেন, “বারবার তুমি এই প্রসঙ্গ তোলো কেন? সে তো অনেক বছর আগে চুকেবুকে গেছে।”

“আমি তুলি না, তুমি তুলতে বাধ্য করাও। তোমাকে মনে করিয়ে দিই। এখন যাও, আর ভ্যানভ্যান কোরো না।”

শ্রীকণা চোখ মুছতে মুছতে সরে গিয়েছিলেন। কোনও কিছু নিয়ে একটু আপত্তি করলেই জীবনের সবচেয়ে দুর্বল সময়টার কথা তোলে তাঁর স্বামী। অথচ ফুলশয্যার রাতে অন্য কথা বলেছিল।

“তোমরা গোপন করেছ, কিন্তু আমি কিছু খবর পেয়েছি শ্রীকণা। কী খবরের কথা বলছি, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। অন্য কেউ হলে এই বিয়ের আগে দু’বার ভাবত। আমি ভাবিনি। কারণ আমি এক জন লেখাপড়া জানা শিক্ষিত মানুষ। শিক্ষিত মানুষ অতীতকে আঁকড়ে থাকে না। সামনেটা দেখে। আমি সব ভুলে তোমার সঙ্গে সংসার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আশা করব, তুমিও ভুলে যাবে।”

শ্রীকণা সে দিন মুগ্ধ হয়েছিলেন। এমন এক জন মানুষকে জীবনে পেয়েছেন বলে নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলেন। কিছু দিন যেতে সব উলটে গেল। এই লোকই বারবার পুরনো কথা মনে করিয়ে দেয়। একটু মাথা তুলতে গেলেই যেন

boierpathshala.blogspot.com

আঘাত করে। শ্রীকণা বুঝতে পেরেছিলেন, তার স্বামী আসলে এক জন নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। শ্রীকণার অতীতের সম্পর্কের কথা জানার পরেও ভেবেচিন্তে তাকে বিয়ে করেছে। বুঝতে পেরেছিল, এই নরম প্রকৃতির মেয়েকে সে এই দুর্বলতা দিয়ে দমিয়ে রাখতে পারবে। শ্রীকণা এই মানুষটাকে যতটা না ভয় পেয়েছেন, তার থেকে বেশি ঘৃণা করেছেন। চেষ্টা করেছেন, ছেলে যাতে এ সব বুঝতে না পারে। তার পরেও ছেলে অনুভব করেছে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সৌহার্দ্য ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে এবং ঘোষণা করেছে, কেরিয়ারের শেষ পর্যন্ত দেখে সে ছাড়বে।

কথা বলতে বলতে ছেলের ঘর গোছাচ্ছেন শ্রীকণা। এত বয়স হয়ে গেল, তার পরেও সৌহার্দ্যর ঘর অগোছালো করে রাখবার অভ্যেস যায়নি। এখনও যেন হস্টেলে থাকে। যেখানে সেখানে বাসি জামাকাপড় ফেলে রাখে। বই, কাগজপত্র, ল্যাপটপ বিছানার ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। বিছানার চাদর এলোমেলো, বেড কভার মাটিতে। ওয়াড্রোবের অবস্থা তথৈবচ। বেরনোর সময় জামাকাপড় খুঁজে পায় না। অথচ কাজের মাসিকেও কিছুতে হাত দিতে দেবে না। শ্রীকণাকেই সমস্ত কিছু করতে হয়।

শ্রীকণা বললেন, “তোর জীবন তো পুরোটাই বাকি আছে। সঞ্চয় তো লাগবে।”

সৌহার্দ্য ওয়াড্রোব খুলে শার্ট পছন্দ করতে লাগল। হ্যাঙ্গারসুদ্ধই গায়ের ওপর ধরছে, আবার তুলে রাখছে। শেষ পর্যন্ত একটা নেভি ব্লু টি-শার্ট বেছে ফেলল। বলল, “সে আমি বুঝে নেব। মা, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, তোমার ছেলের জব পেতে কখনও অসুবিধে হবে না। একটার পর একটা কাজ পেয়েও যাচ্ছি। অলওয়েজ জাম্পিং। নেক্সট জাম্প মারব কলকাতার বাইরে। নতুন প্রজেক্ট

boierpathshala.blogspot.com

ইনিশিয়েট করার একটা এক্সপিরিয়েন্স দরকার ছিল। সেই কারণেই এখানে জয়েন করেছি। এই ফ্ল্যাট বেচে কলকাতা থেকে একেবারে ফুস হয়ে যাব।'

শ্রীকণা বাসি জামাকাপড় আলাদা করতে করতে বললেন, "আমি আর কোথাও যাব না।"

সৌহার্দ্য পিছন থেকে মাকে জড়িয়ে ধরল। "তোমাকে ছাড়া আমি কোথাও যাব না। দেশের মধ্যে তো ছেড়েই দাও, যখন দেশের বাইরে যাব, তখনও তোমাকে ব্যাগে ভরে নেব।"

শ্রীকণা ছেলের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেন। মায়ের ব্যাপারে এই ছেলের এক ধরনের অবসেশন আছে। ছোটবেলাতেও এই ছেলে মায়ের সঙ্গে লেগে লেগে থাকত। বড় হয়েও থাকে। যা বলবার সব মা'কে। এক সময় রাগ, অভিমান এমনকী প্রেমের কথাও বলেছে। এখন কেরিয়ার, পার্টি, ক্লাব, বান্ধবীর কথা বলে। এ সবের আর কতটুকুই বা মা'কে বলা যায়? তাও যতটুকু বলা যায়, বলে। ছোটবেলার অভ্যেস যায়নি। তবে রাত করে ফিরলে জেগে বসে থাকা চলবে না। নিজের কাছে চাবি রেখেছে সৌহার্দ্য। নিঃশব্দে দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ে। শ্রীকণার চিন্তা হয়। এই ছেলে ঘর-সংসার করবে না? সৌহার্দ্যকে বলতে গেলে উড়িয়ে দেয়।

"খেপেছ? বিয়ে করে মরব না কি?"

"কেন? মরবি কেন? কেউ বিয়ে করে না?"

সৌহার্দ্য বলে, "যে করে তাকে করতে দাও, বিয়ের কনসেপ্ট উঠে গেছে মাই ডার্লিং মাদার। এই তো মা–বেটায় দারুণ আছি। আমি ফ্রি। যেচে কেন বাঁশ নিতে যাব?"

boierpathshala.blogspot.com

বাবার মৃত্যুর পর খুব সংক্ষেপে পারলৌকিক কাজকর্ম সেরে সৌহার্দ্য বলেছিল, "ছায়াপাতার পাততাড়ি সব গুছিয়ে নাও। বাড়ি-জমি সব বেচে দেব। কথাও হয়ে গেছে। পাশ দিয়েই হাইওয়ের কানেক্টিং রোড হবে। জমির দাম হুট করে অনেকটা বেড়ে গেছে, এর পর হয়তো আবার পড়ে যাবে। সব বেচে আমরা কলকাতায় সেটল করব। লোন-টোন মিটিয়েও হাতে ভাল টাকা থাকবে।"

শ্রীকণা আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন, "ভিটেমাটি ছেড়ে এখান থেকে চলে যাব সোহো?"

সৌহার্দ্য তেড়েফুঁড়ে বলেছিল, "অবশ্যই যাবে। ছায়াপাতা গ্রাম তোমার কীসের ভিটেমাটি? কলকাতায় জন্মেছ, কলকাতায় বড় হয়েছ। বিয়ে করে গ্রামে এসেছিলে। তাও বাবার এখানে চাকরি ছিল বলে। অন্য কোথাও হলে সেখানে যেতে। এই জায়গায় কিসের টান তোমার?"

শ্রীকণা বলেছিলেন, "বাহ্, তোর বাবা এখানে বাড়ি করেছে। যতই ছোট হোক, বাড়ি তো। লাগোয়া একটু জমিও আছে। সেটা ভিটেমাটি নয়!"

সৌহার্দ্য বলল, "বাবা জীবনটা এখানে কাটিয়ে যাবে বলে ঠিক করেছিল, কাটিয়েও গেল। কিন্তু আমি তো তা ঠিক করিনি মা। পাড়াগঁায়ে পড়ে থাকলে আমার চলবে না। বাবার মতো স্কুলমাস্টার হওয়া আমার জীবনের টার্গেট নয়। বাবা-ই তো আমাকে বলেছিল। অনেক হয়েছে, আমি আর টেনেটুনে-চলা সংসার দেখতে চাই না। বাবা বেঁচে থাকতে এ সব কথা তো বলতে পারিনি, তাই এখন বলছি।"

শ্রীকণা বুঝেছিলেন, বাবার ওপর রাগ সৌহার্দ্যর কোনও দিনই কমবে না। তিনি বলেছিলেন, "তুই তো পাড়াগঁায়ে পড়ে নেই। কলকাতায় হোস্টেলে থেকে কলেজে পড়ছিস।"

boierpathshala.blogspot.com

সৌহার্দ্য বলল, “এখন তার খরচ কোথা থেকে পাব? তা ছাড়া আমি তোমাকেও একা থাকতে দেব না। চলো, সব গুছিয়ে নাও। আমরা ওখানে ফ্ল্যাট কিনব। আমি সব হিসেব করে নিয়েছি।”

শ্রীকণা বুঝেছিলেন, আর আপত্তি করে লাভ নেই। আর সত্যিই তো, পাড়াগঁায়ে একা পড়ে থেকে কী করবেন? ছেলে ছাড়া ছায়াপাতার জীবনের প্রতি তার কোনও মমতাও নেই। স্বামীর স্মৃতি এমন কিছু সুখপ্রদ নয় যে আঁকড়ে পড়ে থাকলে সে খুব সুখের হবে।

সৌহার্দ্য ফসফস করে গায়ে খানিকটা ডিয়োডোরেন্ট স্প্রে করে বলল, “মা, ফিরতে দেরি হবে। কৃতির বার্থডে পার্টি আছে।”

শ্রীকণা ভুরু কুঁচকে বললেন, “কৃতি! সে আবার কে?”

সৌহার্দ্য চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, “আমার এক্স কলিগ। শি ইজ বিউটিফুল। কত ছেলে যে লাইন মেরেছিল! ফাইনালি শি ম্যারেড আ বিজনেস গাই। লোকটা বোকাসোকা, কিন্তু ভাল।”

শ্রীকণা চোখ বড় বড় করে বললেন, “ছি, কী ভাষা! মায়ের সঙ্গে কেউ এ ভাবে কথা বলে? আমি কি তোর ওই ‘ইয়ার’, না কি?”

ধমক দিলেও শ্রীকণা ভাল ভাবেই জানেন, তার গুণধর পুত্রটি মায়ের সঙ্গে কোনও কোনও সময়ে এতটাই সহজ। এর থেকেও বেশি স্ল্যাং ব্যবহার করে বসে। মা’কে সে গুরুজনের থেকে অনেক বেশি ‘বন্ধু’ বলে মনে করে।

আর শুধু কি ছেলেই মনে করে? তিনি মনে করেন না? অবশ্যই করেন। আর করেন বলেই জীবনের গভীর, গোপন কষ্টের কথাটিও তিনি তার কাছে বলে

boierpathshala.blogspot.com

ফেলেছিলেন। রাগে-দুঃখে সে দিন এতটাই ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলেন যে নিজেকে সামলাতে পারেননি।

সোহোর বাবা অতি তুচ্ছ কোনও বিষয় নিয়ে রাগারাগি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তিন দিন বাড়ি ফেরেনি। কলকাতায় গিয়ে বসে ছিল। সৌহার্দ্যর সামনে তখন ফার্স্ট সিমেস্টার পরীক্ষা। নির্বিঘ্নে পড়বে বলে বাড়িতে এসেছিল। কোথায় কী! গোটা বাড়িতে এলোমেলো অবস্থা। শ্রীকণার প্রবল জ্বর। সৌহার্দ্য এত বিরক্ত হয়েছিল যে মা'কে জিগ্যেস করছিল, "এ রকম একটা মানুষকে তুমি কী করে বিয়ে করেছিলে মা? হি ইজ আ ব্রুট!"

শ্রীকণা নিজেকে সামলাতে পারেননি। থমথমে মুখে অস্ফুটে বলেছিলেন, "যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, সে তো কিছু না বলে পালিয়ে গেল।"

সৌহার্দ্য থমকে গিয়েছিল। মায়ের মুখ থেকে এ রকম জবাব পাবে, সে ভাবতে পারেনি। মা নিশ্চয়ই তাকে শোনাতে চায়নি। নিজের মনেই আক্ষেপ করতে চেয়েছিল।

সে দিন কথাটা না শোনার ভান করেছিল সৌহার্দ্য। মা যেন কোনও রকম অস্বস্তিতে না পড়ে। পরে বাবার মৃত্যুর পর চেপে ধরেছিল। তত দিনে আরও খানিকটা বড় হয়ে গিয়েছে সে। মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ হয়েছে আরও। শ্রীকণা ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে বলেছিলেন। নামও বলেছিলেন।

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ৯

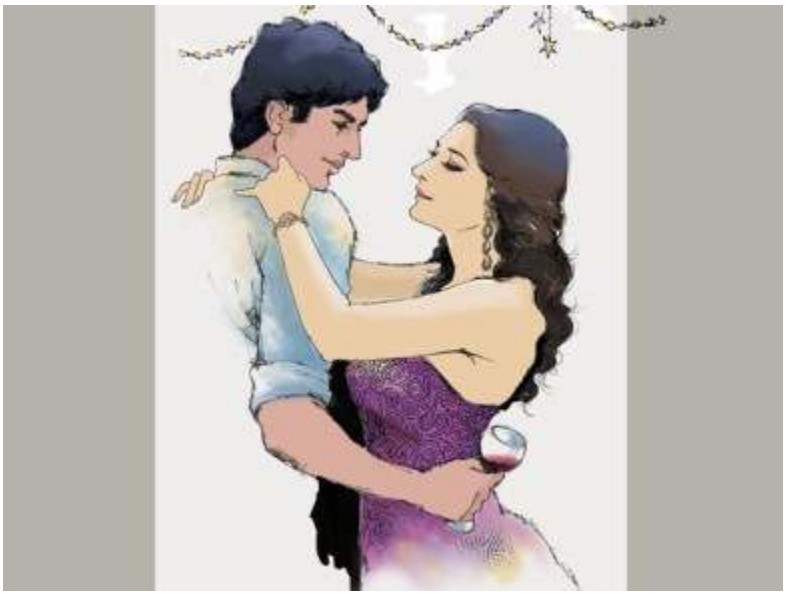

ভুরু কুঁচকে সৌহার্দ্য বলেছিল, “পরে আর খোঁজ পাওনি?” শ্রীকণা বলেছিলেন, “চেষ্টাও করিনি। নিশ্চয়ই অনেক বড় হয়েছেন। আমার মতো সাধারণ মেয়েকে মনে রাখার কোনও কারণ নেই। তা ছাড়া, তার পর তো তোর বাবার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল।”

সৌহার্দ্য দাঁত চেপে বলেছিল, “স্কাউন্ড্রেল।”

শ্রীকণা বলেছিলেন, “ছি, ও রকম বলতে নেই।”

সৌহার্দ্য বলেছিল, “কেন বলতে নেই? অপেক্ষা করতে বলে যে ভ্যানিশ হয়ে যায় তাকে খিস্তি ছাড়া আর কী দেব? কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করব?”

শ্রীকণা বললেন, “হয়তো মুখ ফুটে বলতে পারেননি।”

সৌহার্দ্য নাকমুখ কুঁচকে বলেছিল, “তোমাদের জেনারেশনের এই সব প্রেম-ভালবাসাকে সাধে কি আমরা রিজেক্ট করেছি মা! আমরা যা করি সরাসরি

boierpathshala.blogspot.com

করি। পরস্পরকে বলে করি। পছন্দ হলেও বলি, না হলেও বলি। আমাদের রিলেশন এবং ব্রেক-আপ দু'টোই ওপেন। নো অ্যাম্বিগুইটি। আমাদের ছলনা করতে হয় না, পালাতেও হয় না। উই আর জেনুইন।"

শ্রীকণা বলেছিলেন, "হয়তো তাই। তবে সবাই সমান নয়। আমার কোনও আপশোস নেই। বরং আমি খুব খুশি। তোর বাবাকে বিয়ে না করলে তোকে পেতাম না।"

সৌহার্দ্য বলেছিল, "আপশোস কেন হবে? তুমি কম কিসের? কথাটা তা নয়, কথা হল, উনি পালালেন কেন?"

শ্রীকণা বললেন, "ভুলে যা।"

সৌহার্দ্য ঝাঁঝ নিয়ে বলেছিল, "ভুলে তো এখনই গিয়েছি, তার পরেও যদি কোনও দিন দেখা হয়, কলার চেপে ধরব।"

শ্রীকণা বললেন, "ছি ছি, বলছি না ও রকম বলে না!"

সৌহার্দ্য ঠোঁট উলটে বলেছিল, "ঠিক আছে, দেখা হলে হ্যান্ডশেক করে বলব, আপনি এক জন সাহসী মানুষ মিস্টার। এক সুন্দরী তরুণীকে দাঁড় করিয়ে রেখে ভেগে গিয়েছিলেন। এর জন্য আপনাকে ব্রেভারি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া উচিত।"

শ্রীকণা বললেন, "থাক ও সব কথা।"

সৌহার্দ্য কৌতুক-ভরা গলায় বলল, "জানে মা, সে দিন আমি আমার বসের ঘরে একটা মজার কাণ্ড করেছি। চা খাওয়ার পর একটা দামি কাপ টেবিল থেকে ফেলে দিয়েছি।"

boierpathshala.blogspot.com

নবনী থমকে গিয়ে বললেন, “সে কী!”

সৌহার্দ্য হেসে বলল, “আরও মজার কথা কী জানো? বস বুঝতেই পারেনি, আমি ইচ্ছে করে কাপটা ফেলে দিয়েছি।”

“তুই কি পাগল?”

সৌহার্দ্য ঝুঁকে পড়ে মায়ের গালে গাল ছুঁইয়ে বলল, “লোকটা ভাল, কিন্তু লোকটার নাম আমার পছন্দ নয় মা। সো আই মেক দ্য ফান।”

শ্রীকণা বললেন, “নাম পছন্দ নয়! কী নাম? যত বড় হচ্ছিস পাগলামি বাড়ছে তোর।”

সৌহার্দ্য কথার জবাব না দিয়ে বলল, “চললাম মা। ফিরতে রাত হবে। খেয়ে শুয়ে পড়বে।”

কৃতির বার্থডে পার্টিতে হার্ড ড্রিংক্স বলতে শুধু ওয়াইনের ব্যবস্থা ছিল। সেই ওয়াইনই সৌহার্দ্য অনেকটা খেয়ে ফেলল। যত ক্ষণ না মাথা ঝিমঝিম করে। পার্টি ফাঁকা হতে কৃতি এসে চাপা গলায় বলল, “নো মোর সো! ইউ হ্যাভ টু ড্রাইভ।”

সুন্দরী কৃতি একটা চকলেট রঙের অফ-শোল্ডার স্লিভলেস গাউন পরেছে। বুক থেকে শুরু হওয়া সেই পোশাকে তাকে দেখাচ্ছে হলিউডের ফিল্মস্টারের মতো। কানে বড় ঝোলা দুল রাখলেও গলায় কিছু পরেনি। এতে তার নগ্নতা আরও বেড়েছে।

সৌহার্দ্য হেসে বলল, “কৃতি, ভাবছি, আজ রাতে আর ফিরব না। তোমার কাছে থেকে যাব।”

boierpathshala.blogspot.com

কৃতি চোখ পাকিয়ে বলল, “ডোন্ট বি নটি সো! তুমি কি চাও আমার বর তোমাকে খুন করুক? সে মেট্রো স্টেশনে এক জনকে নামাতে গিয়েছে। এক্ষুনি ফিরবে। যদি এসে দেখে তুমি আমার সঙ্গে ফ্লার্ট করছ তা হলে কী হবে বলো তো?”

সৌহার্দ্য বলল, “যা খুশি হোক, তোমার ওয়াইল্ড বিউটি আমাকে অলরেডি খুন করে ফেলেছে কৃতি। নাউ আই অ্যাম আ ডেড ম্যান।”

কঁাধে চড় মেরে কৃতি ফিসফিস করে বলল, “সত্যি মেরে ফেলব কিন্তু।”

সৌহার্দ্য অভিনয় করে বলল, “ইস, বিয়ে করবার আগে এক বার বললে না!”

কৃতি চোখে কৌতুক এনে বলল, “কেন? বললে কী হত? আমাকে বিয়ে করতে?”

সৌহার্দ্য বলল, “শিয়োর!”

কৃতি বলল, “সেই কারণেই বলিনি। তোমার অন্য গার্লফ্রেন্ডদের কী হত তখন?”

সৌহার্দ্য হেসে বলল, “এই জন্য তোমাকে এত পছন্দ করি। তুমি আমার জন্য ভাবো।”

ফ্ল্যাট থেকে বেরনোর আগে, দরজার সামনে কৃতিকে এক হাতে জড়িয়ে চুমু খেল সৌহার্দ্য। বেশি সময় দিল না কৃতি। নিজেকে মুক্ত করে হাত দিয়ে ঠোঁটের শেড ঠিক করতে করতে গাঢ় গলায় বলল, “শুধু চুমুতে হবে না নটি বয়। বর ট্যুরে গেলে খবর পাঠাব। আসতে হবে।”

boierpathshala.blogspot.com

নীচে নেমে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সৌহার্দ্য ফোনে নম্বর টিপল। ও পাশে এক বার ফোন বাজতেই চিকন গলায় জবাব পেল।

“সৌহার্দ্যদা, তুমি! হোয়াট আ সারপ্রাইজ! এত দিন কোথায় ভ্যানিশ হয়েছিলে?’

এক হাতে স্টিয়ারিং সামলে সৌহার্দ্য বলল, “মনানী, বালিগঞ্জ ফাঁড়ি দিয়ে যাচ্ছি। তোমাকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। এক বার ঘুরে যাই?”

মনানী গলায় আপশোসের সুর এনে বলল, “ইস, ব্যাড লাক। আমি এখন বেঙ্গালুরুতে। দু’মাস হল প্রোমোশন দিয়ে কোম্পানি পাঠিয়ে দিয়েছে।”

সৌহার্দ্য বলল, “কনগ্রাচুলেশনস! কিন্তু আমি যে ভেঙে পড়লাম মনানী। এখনই তোমাকে যে আদর করতে ইচ্ছে করছে।”

মনানী বলল, “নো প্রবলেম। ফ্লাইট ধরে চলে এস। রাত তিনটেয় একটা ফ্লাইট আছে না?” কথা শেষ করে খিলখিল করে হেসে উঠল মনানী।

সৌহার্দ্য ছদ্ম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “ঠাট্টা করছ?”

মনানী নামের মেয়েটি ফিসফিস করে বলল, “রাগ কোরো না সৌহার্দ্যদা। নেক্সট মান্থে কলকাতা যাচ্ছি, একটা ফুল ডে তোমার জন্য। এখন একটা উমম্ নাও।”

মোবাইলে চুমুর জবাব দিয়ে ফোন কেটে দিল সৌহার্দ্য। গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল। ওয়াইনটা চমৎকার ছিল। যত সময় যাচ্ছে, ফুরফুরে ভাবটা বাড়ছে। সৌহার্দ্য নিজেকেই মনে মনে প্রশ্ন করল, রিয়েল না ভার্চুয়াল? কোন চুমুটা ভাল? দু’টোই দু’রকম ভাবে ইন্টারেস্টিং নয় কি? বাবা যদি বেঁচে থাকত,

boierpathshala.blogspot.com

এখন ছেলেকে দেখে কী ভাবত? কোন সৌহার্দ্যটা ভাল? রিয়েল না ভার্চুয়াল? নাকি দু'জনে দু'রকম ভাবে ইন্টারেস্টিং? হেসে ফেলল সৌহার্দ্য।

৫

এখন রাত এগারোটা বেজে দশ মিনিট। নবনী ড্রয়িংরুমের সোফায় বসে আছেন। থমথমে মুখ। সামনে টিভি চলছে। নবনী রিমোট টিপে খবরের চ্যানেলগুলো সার্ফ করে চলেছেন। যদি কোথাও আহিরীদের কলেজের খবর দেখায়। দেখাচ্ছে না। আটটা নাগাদ এক বার দেখিয়েছিল। নবমী নিজে দেখেননি। টালিগঞ্জ থেকে মেজদি'র ছোট মেয়ে মঞ্জরি ফোন করে বলল।

"মাসি, আহিদির কলেজে গোলমাল হচ্ছে?"

নবনী বলল, "হ্যাঁ হচ্ছে। ছাত্রদের কী একটা গোলমাল চলছে। তুই কোথা থেকে শুনলি?"

মঞ্জরি বলল, "এই তো নিউজে দেখাল। ছেলেমেয়েরা সিঁড়িতে বসে চেঁচাচ্ছে। কলেজের নাম শুনে বুঝতে পারলাম, আহিদির কলেজ। ওদের প্রিন্সিপাল না কে, গোল মতো মুখ, টিভিতে বলল, ছাত্ররা নাকি হুলিগানিজম করেছে। ভাঙচুর করেছে, ওঁকেও নাকি মারতে গিয়েছিল।"

মঞ্জরি মেডিকেলে পড়ে। দিদির কলেজের খবর নিউজে বলেছে বলে সে গর্বিত। গোলমালে ঘাবড়েছে বলে মনে হল না। নবনীর উদ্বেগ বাড়ছে। নিউজে দেখিয়েছে মানে পরিস্থিতি ঘোরালো।

মঞ্জরি বলল, "আমি আহিদিকে ফোন করেছিলাম। ফোন বন্ধ। মা চিন্তা করছে।"

boierpathshala.blogspot.com

নবনী নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, “আমি কথা বলেছি। ওর মোবাইলে চার্জ ফুরিয়ে গেছে। মা’কে চিন্তা করতে বারণ কর। সব টিচার একসঙ্গে আছে, ভয়ের কিছু নেই। আমার সঙ্গে কথা হলে তোদের ফোন করতে বলব।”

মঞ্জরির ফোন কেটে দেওয়ার পর নবনী আবার আহিরীকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। লাভ হয়নি। ফোন বন্ধ। তার পর থেকে সিরিয়াল দেখা বন্ধ করে, টিভির খবরগুলো দেখছেন, আবার যদি কিছু দেখায়। দেখাচ্ছে না। মারপিট, গুন্ডামির কথা তো আহিরী কিছু বলেনি! চেপে গেছে। তার সঙ্গে দু’বার কথা হয়েছে। প্রথম বার নিজেই ফোন করেছিল। আহিরী শান্ত গলায় বলেছিল, “মা, ফিরতে দেরি হবে। কলেজে আটকে গেছি।”

‘আটকে গেছি’ মানে যে কলেজের গেট বন্ধ করে আটকে রাখা হয়েছে, সে কথা বুঝতে পারেননি নবনী। আহিরীও বলেনি কিছু।

“কখন ফিরবি?”

আহিরী বলল, “বলতে পারছি না। রাত হবে।”

নবনী অবাক হয়ে বললেন, “রাত! কলেজে রাত পর্যন্ত কী কাজ?”

আহিরী বিরক্ত গলায় বলল, “কী কাজ জেনে তুমি কী করবে? রাত হবে বললাম তো।

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ১০

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

মেয়ের মুখে ‘খেয়ে নিও’ শুনে খাটের ওপর ধপ করে বসে পড়েছিলেন নবনী। কী এমন কাজে আটকে গিয়েছে যে রাতে এসে খেতেও পারবে না? পরীক্ষা তো চারটের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। সাতটা বাজার মুখে নবনী নিজেই মেয়েকে ফোন করেন। বেশ কয়েক বার বাজার পর আহিরী ফোন ধরে। নবনী শুনতে পান, ফোনের ও পাশে তুমুল হট্টগোল হচ্ছে। কারা যেন চিৎকার করছে।

“কী হয়েছে?”

মেয়ের গলা শুনে মনে হচ্ছে, মুখের কাছে হাত চাপা দিয়ে কথা বলছে। নবনী বললেন, “এখনও তোর কাজ শেষ হয়নি?”

আহিরী চাপা গলায় বলল, “না হয়নি। আজ সারা রাত থাকতে হতে পারে।”

নবনী আর্তনাদ করে উঠলেন, “সারা রাত!”

boierpathshala.blogspot.com

আহিরী চাপা গলায় বলল, “মা, টেনশন কোরো না। এই জন্য তোমাকে কিছু বলতে চাই না। কলেজে অ্যাজিটেশন হচ্ছে। ছেলেমেয়েদের বিক্ষোভ।”

নবনী বললেন, “তাতে তোর কী? তুই তো ছেলেমেয়ে নোস। তুই চলে আয়।”

আহিরী এ বার চাপা ধমকের গলায় বলে, “ছেড়ে দাও, তুমি বুঝবে না। সিচুয়েশন চলে আসার মতো নয়। কোনও টিচারই বেরোতে পারেনি। শোনো, আমাকে আর ফোন বা মেসেজও করবে না। ফোনে চার্জ নেই। সঙ্গে চার্জারও নেই।”

নবনী সন্দেহের গলায় বলল, “তুই তো পাওয়ার ব্যাঙ্ক সঙ্গে রাখিস।”

আহিরী বলল, “পাওয়ার ব্যাঙ্ক গাড়িতে।”

“নিয়ে আয়। ফোন বন্ধ করে রাখলে কী করে হবে? আমি তো ফোন করব।”

আহিরী দাঁতে দাঁত চেপে বলল, “মা, ভাল করে শুনে নাও, আমরা ঘেরাও হয়ে আছি। ছাত্ররা করেছে। কলেজ থেকে বেরনোর ব্যাপার নেই। গাড়ি পর্যন্ত গিয়ে পাওয়ার ব্যাঙ্কও আনতে পারব না। সো দিজ ইজ ইয়োর লাস্ট কল। দরকার হলে আমি যোগাযোগ করব। এ বার দয়া করে রাখো।”

তার পর থেকে আর মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি। কমলেশকে ফোন করেছিলেন নবনী।

“জানি। আহি ফোন করেছিল। চিন্তার কিছু নেই। শুনেছি পুলিশ-টুলিশ গেছে।”

নবনী আরও নার্ভাস হয়ে বললেন, “পুলিশ গেছে! গোলমাল হচ্ছে না কি?”

কমলেশ ফোনেই মৃদু হেসে বললেন, “নবনী, এত চিন্তা কোরো না। আহি সেফ থাকবে। ও তো একা নয়, এভরিবডি ইজ দেয়ার।”

boierpathshala.blogspot.com

কমলেশ বাড়ি ফিরেছেন ন'টার পর। ড্রাইভারকে গ্যারেজে গাড়ি তোলার কথা বলতে গিয়ে একটু ভাবলেন। তার পর বললেন, "দীনেশ, গাড়ি তুলে দাও। আমি যদি বেরোই, গাড়ি বের করে নেব।'

দীনেশবলল, "স্যর, দিদির গাড়ি দেখছি না।"

"ওর ফিরতে দেরি হবে। গাড়ি বাইরে রাখবে।"

আহিরী গাড়ি কেনার পর থেকে একটা গাড়ি বাইরে থাকে। যে আগে ফেরে সে গাড়ি গ্যারেজে ঢুকিয়ে দেয়। বাইরে মানে অবশ্য বাড়ির বাইরে নয়, গ্যারেজের সামনে, ড্রাইভওয়েতে। এদিককার বেশির ভাগ বাড়িতে এই সুবিধেটা রয়েছে। গেট দিয়ে ঢোকার পর লম্বা প্যাসেজ, তার পর গ্যারেজ। প্যাসেজেও অনায়াসে আর একটা গাড়ি রাখা যায়।

কমলেশ আজ স্নান সেরেছেন অনেকটা সময় ধরে। সকালে আহিরী বেরিয়ে যাওয়ার পরই মেকানিক ডাকা হয়েছিল। গিজারে বড় কিছু হয়নি। একটা ফিউজ কেটে গিয়েছিল। স্নান সেরে রোজকার মতো অল্প স্ন্যাকস আর একটা হুইস্কি নিয়ে স্টাডিতে বসেছেন। লার্জ পেগ স্কচ। বেশির ভাগ দিন এই একটাতেই থেমে যান। কোনও কোনও দিন আর একটা হাফ নেন। ব্যস, আর নয়। সময় নিয়ে খান। কমলেশ রায় এই সময়টা নিজের মতো করে কাটান। তার এই স্টাডিটা মাপে ছোট, কিন্তু শৌখিন ভাবে সাজানো। পুরনো দিনের গথিক চেহারার ইন্টিরিয়র। বার্নিশ করা কাঠের টেবিল, চেয়ার, ডেস্ক। সিলিং পর্যন্ত উঠে গেছে তাক। তাক ভর্তি বই। আহিরী যখন স্কুলের নিচু ক্লাসে পড়ত, বাবার এই ঘরটার ওপর ওর লোভ ছিল খুব। সুযোগ পেলেই নিজের পড়ার ঘর ছেড়ে বইখাতা নিয়ে পালিয়ে আসত। বাবার স্টাডিতে না পড়লে তার নাকি পড়া মনে থাকে না। বড় হয়ে অবশ্য নিজের ঘরে গুটিয়ে গেছে।

boierpathshala.blogspot.com

কমলেশ এই ঘরে বসে ম্যাগাজিন উলটোন, বই পড়েন। মেয়ের সঙ্গে গল্পও করেন। স্ত্রীর সঙ্গে টুকটাক কথা হয়। তবে নবনীকে একটু এড়িয়েই চলেন কমলেশ। দু'টো কথার পরই নবনী কোনও না কোনও বিষয় নিয়ে অনুযোগ, আপত্তি, দোষারোপের দিকে চলে যাচ্ছেন। সব সময়েই যেন ভিতরে এক ধরনের বিরক্তি। সঙ্গে হালকা রাগও।

এই স্বভাব নবনীর আগে ছিল না। একটা সময় পর্যন্ত স্বাভাবিকই ছিলেন। মেয়ের ব্যাপারেই যেটুকু যা বাড়াবাড়ি করতেন। ছোটবেলা থেকে আহিরীকে লেখাপড়া নিয়ে কখনও বলতে হয়নি। তবে দুরন্ত ছিল মেয়েটা। 'ওভারঅ্যাক্টিভ' যাকে বলে। চোখে চোখে না রাখলে একটা না একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলত। আর ছিল সাজগোজের ঘটা। সুযোগ পেলেই মায়ের মেক-আপ কিট ধ্বংস করবে। ধরে ফেলার আগেই মুখে থ্যাবড়া করে পাউডার, ঠোঁটে মোটা করে লিপস্টিক লাগিয়ে পালাত। কমলেশ রায় মেয়ের এই কর্মকাণ্ডে খুবই আনন্দ পেতেন এবং অংশও নিতেন। নবনী সাজগোজের সরঞ্জাম মেয়ের হাতের নাগালের বাইরে রাখতেন। কখনও উঁচুতে, কখনও আলমারির ভিতর। নবনী বাড়ি না থাকলে মেয়েকে সে সব মাঝেমধ্যে বের করেও দিয়েছেন কমলেশ। বাড়ি ফিরে নবনী রাগারাগি করতেন খুব।

"তোমার আসকারায় মেয়ে বিগড়ে যাবে। এইটুকু বয়েসে সাজগোজের কী ঘটা!"

"আহা, বড় হোক, দেখবে পুরো উলটে গেছে।"

তাই হল। যত বড় হতে লাগল আহিরী, খাওয়া-দাওয়া, সাজগোজের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ল। যেটুকু দরকার সেটুকুও করত না। চুলটা ঠিকমত আঁচড়াত না পর্যন্ত। তার ওপর এক বার বই মুখে বসলেই হল। টেনে তোলা

boierpathshala.blogspot.com

ছাড়া উপায় ছিল না। নবনী এ সব নিয়ে খিটিরমিটির করেই যেতেন। মেয়েকে টিউশনে নিয়ে যাওয়া, নাচের স্কুল, গানের স্কুলে নিয়ে যাওয়া তো ছিলই। উঁচু ক্লাসে উঠে নাচ, গান সব ছাড়ল আহিরী। তখন শুধু লেখাপড়া।

এই পর্যন্ত মোটের ওপর নর্মালই ছিলেন নবনী। গোলমাল হল আর একটু পরে। আহিরী তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। মেয়ে বড় হয়েছে বলে বাড়িতে নবনীর চাপ কমেছে। তিনি 'উর্বরা' নামে একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হলেন। এই সংগঠন দুঃস্থ, পিছিয়ে পড়া মেয়েদের জন্য নানা ধরনের কাজ করে। লেখাপড়া থেকে নাচগান, হাতের কাজের প্রদর্শনী। কলকাতার বহু মহিলা এর সঙ্গে জড়িত। আহিরীই চাপ দিয়েছিল।

"ঘরে বসে বোর না হয়ে কিছু করো না মা!"

"কী করব? এই বয়সে নতুন করে পথে বেরিয়ে রোজগার করতে বলছিস?"

আহিরী বলল, "আমি কিছু বললেই প্যাঁচালো ভাবে নাও কেন? রোজগার করতে বেরবে কেন? কত ধরনের সংগঠন আছে যারা মানুষের জন্য কাজ করে। এ রকম কারও সঙ্গেও তো যুক্ত হতে পারো। দেখবে ভাল লাগবে।"

এর পর থেকে নবনী 'উর্বরা'র সঙ্গে কাজ করেন। তবে নিয়মিত যেতে পারেন না। যেটুকু যান, ভাল লাগে।

এক বার অফিসের কাজে সাত দিনের জন্য মুম্বই যেতে হয়েছিল কমলেশকে। ফিরে এসে খেয়াল করলেন, নবনী তাঁকে দেখে কেমন চুপচাপ হয়ে গেলেন। অন্য সময় লম্বা ট্যুর থেকে ফিরলে নবনীর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে যায়। সে বার কেমন একটা নিস্পৃহ ভঙ্গি।

boierpathshala.blogspot.com

জামাকাপড় বদলাতে বদলাতে কমলেশ বলেছিলেন, “কী হয়েছে নবনী? এনি প্রবলেম?”

নবনী ঠান্ডা গলায় বললেন, “না। ঠিক আছে।”

কমলেশ রায় বললেন, “তোমাকে দেখে কিন্তু তা মনে হচ্ছে না।”

নবনী অস্ফুটে বলেছিলেন, “বললাম তো সব ঠিক আছে।”

“উর্বরার কাজকর্ম চলছে? গিয়েছিলে?”

নবনী ঠান্ডা গলায় বলেন, “হ্যাঁ গিয়েছিলাম।”

কমলেশ ভুরু কুঁচকে বললেন, “শরীর খারাপ?”

নবনী এর পর বিরক্ত ভাবে বলেছিলেন, “এক কথা বারবার বলছ কেন? বলছি তো ঠিক আছি।”

কমলেশ বুঝেছিলেন, যদি কিছু হয়েও থাকে নবনী বলতে চাইছে না। অফিস গিয়ে মেয়েকে ফোন করেছিলেন। আহিরী তখন ইউনিভার্সিটিতে।

“বাবা, কখন ফিরলে?”

কমলেশ নরম গলায় বললেন, “ফ্লাইট লেট করেছে। তুই বেরিয়ে যাওয়ার পর বাড়িতে ল্যান্ড করেছি।”

আহিরী বলল, “প্লেন কি ছাদে ল্যান্ড করল?”

কমলেশ হেসে বললেন, “না, সামনের পার্কে। তুই কী করছিস?”

“ক্লাস নেই, পোর্টিকোতে বসে বই পড়ছি।”

কমলেশ উৎসাহ নিয়ে বললেন, “কী বই?”

boierpathshala.blogspot.com

আহিরী বলল, “থ্রিলার। হাউ ডান ইট টাইপের থ্রিলার। খুনি কে জানা আছে, কিন্তু কী করে খুন করল বোঝা যাচ্ছে না। ডিটেকটিভ হাবুডুবু খাচ্ছে। বাবা, এ বার চট করে বলে ফেলো দেখি, কেন ফোন করেছ। গল্পের খুব ইন্টারেস্টিং পার্টে আটকে আছি। একটু পরেই ক্লাসে যেতে হবে।”

কমলেশ একটু থেমে বলেছিলেন, “তোর মায়ের কী হয়েছে?”

আহিরী বলল, “কী হয়েছে মানে! এই তো দেখে এলাম, সব ঠিক আছে।”

কমলেশ চিন্তিত ভাবে বললেন, “কেমন যেন মনে হল। আমাকে দেখে মুড অফ করে রইল।”

আহিরী ফিক করে হেসে বলল, “ও, তা হলে অভিমান। এত দিন বাড়িতে ছিলে না বলে অভিমান হয়েছে। নিশ্চয়ই ফোন-টোন করোনি।”

কমলেশ সিরিয়াস গলায় বললেন, “ঠাট্টা করিস না আহি। সামথিং রং মনে হল।”

আহিরী বলল, “ওটা সামথিং রাইট হবে বাবা। আমার সঙ্গে সময় নষ্ট না করে তুমি বরং মা’কে ফোন করে মান ভাঙাও। টা টা।”

ব্যাপারটা মান-অভিমানের ব্যাপার নয়। কয়েক দিনের মধ্যে কমলেশ বুঝতে পারলেন, সত্যি কোথাও কোনও গোলমাল হচ্ছে। এক দিন রাতে আদর করবার জন্য স্ত্রীকে কাছে টানলেন। নবনীও এলেন। চিরকালই কমলেশ এই সময়টায় স্ত্রীর ভাললাগার ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, পার্টনারের খুশি হওয়ার ওপর নিজের তৃপ্তি অনেকটা নির্ভর করে। জোরজবরদস্তিতে সঙ্গত নষ্ট হয়। সন্তর্পণে ব্যক্তিগত ভাললাগার জানলা-দরজাগুলো এক এক করে খুলে দিতে হয়। স্বামী–স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্ক

boierpathshala.blogspot.com

শুধুমাত্র তাড়না মেটানোর প্রক্রিয়া নয়, পারস্পরিক ভালবাসাও বটে। সে দিনও একই ভাবে এগোতে যান কমলেশ। কিন্তু নবনীর কাছ থেকে সাড়া পেলেন না।

কমলেশ গাঢ় স্বরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমার কি কোনও সমস্যা হচ্ছে?"

নবনী এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলেছিলেন, "তাড়াতাড়ি করো। আহি জেগে আছে।"

কমলেশ স্ত্রীর নগ্ন বুকে আলতো হাত রেখে বলেছিলেন, "আহি তো দরজা আটকে পড়ছে।"

নবনী স্বামীর হাত সরিয়ে বলেন, "তা হোক। জেগে তো আছে। যা করবার তাড়াতাড়ি করো।"

কমলেশ বুঝতে পেরেছিলেন, কোথাও সুর কেটেছে। যে সাত দিন তিনি ট্যুরে ছিলেন তার মধ্যেই কিছু একটা ঘটেছে। চাপাচাপি করলে চলবে না। নবনীকে সময় দিতে হবে। সময় দিয়ে জানতে হবে সমস্যাটা কোথায়। বিয়ের এতগুলো বছর পরে নিশ্চয়ই এমন কোনও জটিলতা তৈরি হবে না, যার সমাধান করা যায় না। আশ্চর্যের বিষয় হলেও, আজও সেই সমস্যার পুরোটা সমাধান করা যায়নি। তবে একটা ভাল ঘটনা, স্ত্রীর গুম মেরে যাওয়ার কারণ কমলেশ জেনেছেন।

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ১১

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

বাইরে গিয়েছিলেন দু'জনে। আহিরীই পরামর্শ দিয়েছিল বাবাকে। বাবা-মায়ের গোলমালে নিজেকে যতটা দূরত্বে রেখে পরামর্শ দেওয়া যায় আর কী। বুদ্ধিমতী মেয়ে।

"মা'কে নিয়ে কোথাও ঘুরে এস না!"

কমলেশ বলেছিলেন, "কেন বলছিস?"

আহিরী বলেছিল, "ঘ্যানঘ্যানানি থেকে ক'দিন রিলিফ পাব। সকাল থেকে শুরু হয়ে যায়। কখন ঘুম থেকে উঠবি, কখন স্নানে যাবি, কখন বেরোবি, কখন ফিরবি। যেন এখনও স্কুলে পড়ি। উফ, মনে হয় ডাক ছেড়ে কাঁদি। ঘুরে এস, আমাকে বঁাচাও।"

কথাটা কমলেশের মনে ধরে। বাইরে ক'দিন থাকলে নবনীর মনের জটটা কাটতে পারে। হয়তো সমস্যাটা বলবে।

boierpathshala.blogspot.com

“কোথায় যাই বল তো!”

“আমি কী বলব! মায়ের সঙ্গে কথা বলো।”

কমলেশ বললেন, “তোর মা যে মুডে আছে, সে কী কিছু বলবে...।”

আহিরী বলল, “এক কাজ করো। বাগডোগরার টিকিট কেটে প্লেনে চেপে বসো। এয়ারপোর্টে নেমে ঠিক করবে কোন পাহাড়ে উঠবে। দার্জিলিং না সিকিম।”

কমলেশ বললেন, “ মন্দ বলিসনি।”

আহিরী আড়মোড়া ভেঙে বলেছিল, “আমার আইডিয়া সব সময়েই ভাল হয়।”

কোনও পাহাড়ে নয়, বাগডোগরা থেকে গাড়ি নিয়ে সোজা ডুয়ার্স চলে গিয়েছিলেন কমলেশ। চালসায় মূর্তি নদীর পাশে এক চমৎকার রিসর্টে উঠলেন। চতুর্থ দিনটি ছিল পূর্ণিমার। রাতে গিয়ে নদীর পাশে বসেছিলেন দু’জনে। রিসর্ট থেকে বলে দিয়েছিল, বেশি দূরে যাবেন না। দু’দিন ধরে হাতি বেরোচ্ছে, আলোর কাছাকাছি থাকবেন। কমলেশ শোনেননি। আলোর কাছে থাকলে জ্যোৎস্না দেখা যায় না। তারা খানিকটা সরে গিয়ে বসলেন। মূর্তি নুড়ি পাথরের নদী। এই নদীর জলে টুংটাং করে বাজনা বাজে। খানিক ক্ষণ চুপ করে শুনলে মনে হয়, বাজনার তালে জল বইছে। জ্যোৎস্নার রাতে এই নদী জলের থাকে না, রুপোর হয়ে যায়। রুপোর কণা নুড়ি পাথর ছঁুয়ে ছঁুয়ে যায়। চার পাশে এক ধরনের ঘোর-লাগা মায়াবী জগৎ তৈরি হয়।

কমলেশ স্ত্রীর হাত ধরে নরম গলায় বলেছিলেন, “এ বার আমাকে বলো।”

নবনী দূরে তাকিয়ে ছিলেন। যেখানে নদী শেষ বাঁক নিয়ে আড়ালে চলে গেছে।

boierpathshala.blogspot.com

“কী বলব?”

কমলেশ ফিসফিস করে বলেন, “যা বলতে পারছ না!”

নবনী নিচু গলায় বলেছিল, “তোমার ভাল লাগবে না।”

“তাও বলো।”

নবনী বললেন, “তুমি কি এই কথা শোনার জন্য এখানে এসেছ?”

কমলেশ এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললেন, “তুমি ভারমুক্ত হবে।”

নবনী স্বামীর দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, “তুমি প্রেম করতে?”

নবনী যে এই কথাটা বলবেন, ভাবতেও পারেননি কমলেশ। তাও আবার দাম্পত্য জীবনের এতটা পথ পেরিয়ে আসার পর! প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও দ্রুত নিজেকে সামলে হেসে বলেন, “হ্যাঁ করতাম। তোমাকে তো গল্প বলেছি।”

নবনী বললেন, “হালকা করছ?”

কমলেশ বললেন, “এই বুড়ো বয়সে প্রেমের কথা বললে কি সিরিয়াস হব?” আওয়াজ করে হাসলেন কমলেশ। হাসতে হাসতেই বললেন, “ছাত্র বয়সে কত প্রেম করেছি তা কি মনে আছে?”

নবনী বললেন, “ও সব ছেলেখেলা নয়, আমি তোমার কোন প্রেমের কথা বলছি তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।”

কমলেশ এ বার খানিক বিরক্ত গলায় বললেন, “তোমার কি মাথা খারাপ হল নবনী? এই বয়সে এ সব ছেলেমানুষের মতো কথা আমাদের মানায়?”

boierpathshala.blogspot.com

নবনী বললেন, “আমি তো তোমাকে কিছু বলতে চাইনি, তুমিই জোর করে শুনতে চাইছ।”

রাগতে গিয়েও কমলেশ নিজেকে সামলে নিলেন। স্ত্রীকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, “নিশ্চয়ই তোমাকে কেউ কিছু বলেছে। আর তাই নিয়ে তুমি মন খারাপ করে বসে আছ।”

নবনী কেটে কেটে বললেন, “মন খারাপ করিনি। ধাক্কা খেয়েছি।”

“ধাক্কা খেয়েছ! কোন কালে আমার কার সঙ্গে কী সম্পর্ক ছিল তাই নিয়ে ধাক্কা খেয়েছ! এটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? কাম অন নবনী। সিলি বিষয় নিয়ে মন খারাপ কোরো না।”

নবনী বললেন, “তোমার প্রেমের গল্প শুনে ধাক্কা খাওয়ার মতো মন বা বয়স কোনওটাই আমার আর নেই। তা তুমি জানো।”

কমলেশ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, “দেন হোয়াটস দ্য প্রবলেম? এত দিন পরে কে কী বলেছে তাই নিয়ে মাথা গরম করছ কেন?”

নবনী কাঁধ থেকে স্বামীর হাত সরিয়ে দিয়ে বললেন, “প্রেম নয়, তোমার বিশ্বাসঘাতকতার গল্প আমাকে হার্ট করেছে। আমি মেনে নিতে পারছি না। তোমার মতো মানুষ একটা মেয়ের সঙ্গে এমন কাজ করতে পেরেছিল! এটা আমি মেলাতে পারছি না।”

কমলেশ গলা চড়িয়ে বললেন, “বিশ্বাসঘাতকতা! কার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি? কোন স্কাউন্ড্রেল তোমাকে এ সব বলেছে! মিথ্যে কথা। অল লাইস। ড্যাম লাইস।”

boierpathshala.blogspot.com

কমলেশ রায়ের চিৎকারে চার পাশের নিস্তব্ধতাও যেন থমকে গেল। নবনী শান্ত ভাবে বললেন, “মিথ্যে হলে এত রাগ করছ কেন?”

কমলেশ উত্তেজিত গলায় বললেন, “আমার ভাবতে অবাক লাগছে নবনী, তুমি এক জন অচেনা অজানা লোকের মুখে গসিপ শুনে, কেচ্ছা শুনে আমাকে দোষারোপ করছ! তোমাকে এটা মানায় না। তাও যদি বিশ বছর আগে হত। নতুন বিয়ে করছি, আমার রিলেশনের কথা শুনে ইউ আর ফিলিং ব্যাড। সে সব তো নয়। অনেকটা সময় পেরিয়ে এসেছি আমরা।”

নবনী শান্ত ভাবে বললেন, “বিশ বছর আগে তো ঘটনা শুনিনি। তুমি খুব ভাল করেই জানো, এটা কোনও গসিপ নয়, কেচ্ছাও নয়। এটা বিশ্বাসঘাতকতা। আর যার মুখ থেকে আমি এই গল্প শুনেছি, তিনি জানেনও না, আমার হাজব্যান্ডের নামও কমলেশ রায়, সেও চার্টার্ড পড়েছে, সেও বিদেশ থেকে ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি নিয়ে এসেছে, সেও বড় কোম্পানিতে কাজ করছে। সুখী সংসারে তারও একটা মেয়ে আছে। সে শুধু জানে, তার বান্ধবীকে বিট্রে করা লোকটা জীবনে এ রকমই এসট্যাবলিশড হয়েছে। আমিও কিছু বলিনি। গল্প শুনেছি মাত্র।”

কমলেশ খানিক ক্ষণ চুপ করে রইলেন, “মেয়েটির নাম কী?”

চাঁদ অনেকটা ওপরে উঠে গিয়েছিল। নুড়ি পাথরের নদী জায়গায় জায়গায় ঝকঝক করছিল।

“নাম জানি না, জিজ্ঞেস করিনি।”

কমলেশ রাগ কমিয়ে খানিকটা অসহায় ভাবে বললেন, “আমি এ রকম কিছু মনে করতে পারছি না। কত মেয়ের সঙ্গেই তো আলাপ হয়েছে।”

boierpathshala.blogspot.com

নবনী ঠোঁটের কোণে হেসে বললেন, “আমি তো তোমাকে মনে করতে বলিনি। কিছুই বলিনি। ঘটনাটা সামলাতে একটু টাইম নিচ্ছিলাম।”

কমলেশ স্ত্রীর দিকে ঘুরে বসলেন। তার দু’টো হাত ধরে নরম গলায় বললেন, “আচ্ছা তর্কের খাতিরে নাহয় মেনে নিলাম এ রকম কোনও ঘটনা ঘটেছিল। তাতেই বা কী? প্রেমে ব্রেক আপ হতে পারে না? কত জনের তো ডিভোর্স হয়। সেটাও কি বিশ্বাসঘাতকতা?”

নবনী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “রিলেশনে ব্রেক আপ বা ডিভোর্সের কথা যে হচ্ছে না সেটা তুমি ভাল করেই বুঝতে পারছ কমলেশ। ‘আমি আসছি, তুমি অপেক্ষা করো’ বলে হারিয়ে যাওয়াটাকে কি বলে? বিশ্বাসভঙ্গ? নাকি পালিয়ে যাওয়া? যাক, আমি এ নিয়ে আর কথা বলতে চাই না। আমি তোমার কাছ থেকে কোনও কৈফিয়ত চাইনি। তুমি যা করেছ, তার উলটো ঘটলে তোমার সঙ্গে আমার বিয়েটাই হত না। আমার বাবা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে কি তোমাকে খুঁজে পেত? পেত না। তোমার মতো এক জন কম্পিটেন্ট, ডিপেন্ডেবল, লয়্যাল হাজব্যান্ডই পাওয়া হত না আমার। আহির মতো মেয়ে? ভাগ্যিস সে দিন তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে। আমি লাকি। তার পরেও ঘটনাটা জানার পর মনটা কেমন খচখচ করছে। ঠিকই বলেছ, ছেলেমানুষি। আশা করি ঠিক হয়ে যাবে।”

কমলেশ বললেন, “নবনী, বিলিভ মি, আই কান্ট ট্রেস দ্য লেডি... তুমি একতরফা শুনে আমার সম্পর্কে ধারণা খারাপ করছ।”

নবনী জোর করে হেসে বললেন, “তুমি যা শোনার জন্য এখানে আমাকে টেনে নিয়ে এসেছিলে তা তো শুনলে, আমিও খানিকটা হালকা হলাম। চলো উঠি, কাল সকালে ফেরা। গোছগাছ আছে।”

boierpathshala.blogspot.com

কমলেশ বললেন, “আর একটু বোসো।”

“আচ্ছা বসছি, কিন্তু ও সব কথা আর নয়।”

কমলেশ কিছু একটা বলতে গেলেন, রিসর্টের দিক থেকে এক জন হন্তদন্ত হয়ে এসে দাঁড়াল। হাতে জোরালো টর্চ। ধমকের ঢঙে বলল, “এ কী! আপনারা এখানে কেন? আপনাদের না আলোতে বসতে বলা হয়েছিল? তাড়াতাড়ি রিসর্টে চলুন। খবর এসেছে, হাতি বেরিয়েছে।”

সে দিন গভীর রাতে নদীর ও পারে যখন দলছুট হাতি আকাশ কাঁপিয়ে ডেকে ওঠে, কমলেশ নবনীকে বুকে চেপে ধরেছিলেন। ভরসা দিতে চেয়েছিলেন। ফিসফিস করে বলেছিলেন, “ভয় নেই। আমি আছি।”

আজ এতগুলো বছর কেটে গেল, কমলেশ বুঝতে পারেন, নবনীর সঙ্গে সম্পর্কে কোথাও একটা চিড় রয়েই গেল। সেই চিড় কোথায়? ভরসা, বিশ্বাস না কি শ্রদ্ধায়? আজও স্পষ্ট নয়।

৬

নবনী স্টাডির দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

“মেয়ের কোনও খবর নেবে না?”

কনলেশ একটা বিজনেস ম্যাগাজিন দেখছিলেন। জিএসটি নিয়ে একটা ভাল লেখা বেরিয়েছে। মুখ তুলে বললেন, “খবর নিয়েছি। টিচাররা সবাই সেফ আছে। চিন্তার কিছু নেই। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে টিভি দেখতে পারো।”

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ১২

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

নবনী থমথমে গলায় বললেন, “তুমি বললেই চিন্তা বন্ধ করে দেব এমনটা ভাবছ কেন? মাঝরাত পর্যন্ত মেয়েকে কতকগুলো গুন্ডা আটকে রাখবে আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে টিভিতে সিরিয়াল দেখব?”

কমলেশ বললেন, “গুন্ডা বলছ কেন? ওরা স্টুডেন্টস। আহিরই সব ছাত্রছাত্রী।”

নবনী দাঁতে দাঁতে চেপে, চোখে ঘৃণা নিয়ে বললেন, “এরা ছাত্র! ছিঃ! আমরা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়িনি? টিচারদের রাতদুপুর পর্যন্ত আটকে রাখাটা ছাত্রদের কাজ?”

কমলেশ বললেন, “তোমাদের সময়েও এ সব হয়েছে নবনী। তার আগেও হয়েছে। ছেলেমেয়েরা এই ধরনের আন্দোলন চিরকালই করে। কোন ইস্যুতে করে দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। তবে এটা ঠিক, আনরেস্ট বাড়ছে। গোটা দেশেই কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলোতে গোলমাল লেগে আছে।”

boierpathshala.blogspot.com

নবনী এ বার ঘরে ঢুকলেন। মোড়ায় বসলেন। মোড়াটা সাধারণ মোড়া নয়, হস্তশিল্প মেলা থেকে বেশ দাম দিয়ে কেনা। কাঠের ওপর পুতুল খোদাই করা। কমলেশ মনে মনে প্রমাদ গুনলেন, নবনী বসেছে মানে অনেকটা বলবে। শুধু বলবে না, ঠিকমত কথার উত্তর না দিলে তাকে 'ইগনোর' করা হচ্ছে বলে রাগারাগিও করবে।

নবনী বললেন, "আহিকে নিয়ে চিন্তা হয়। লেখাপড়া করে এ কী গোলমালে পড়ল!"

কমলেশ বললেন, "আহি তো বড় হয়েছে। অত চিন্তার কিছু নেই।"

নবনী বললেন, "বড় হয়েছে বলেই তো আরও চিন্তা। এর পর অন্য জায়গায় মানিয়ে নিতে অসুবিধে হবে।"

কমলেশ অবাক হয়ে বললেন, "অন্য জায়গায়! তার মানে!"

নবনী একটু চুপ করে থাকলেন। তার পর বললেন, "আহির একটা ভাল সম্বন্ধ পাওয়া গেছে। ছেলে আমেরিকায় থাকে। কম্পিউটার নিয়ে লেখাপড়া। বাড়িতে এসেছিল। আহির সঙ্গেও আলাপ হয়েছে।"

কমলেশ ভুরু কুঁচকে বললেন, "তুমি আমাকে বলেছিলে না?"

"বলেছিলাম। কিন্তু পুরোটা বলিনি। ওই ছেলের আহিকে পছন্দ হয়েছে। সে তাকে জানিয়েওছে এ কথা। অমন মেয়েকে তো পছন্দ হওয়ারই কথা।"

কমলেশ একটু চুপ করে থেকে মাথা নামালেন। হাতে রাখা ম্যাগাজিনের পাতা উলটে বললেন, "ভাল তো। আহির সঙ্গে কথা বলো। লেখাপড়ার জগতের ছেলেকে তো ওর ভাল লাগারই কথা।"

boierpathshala.blogspot.com

নবনী এ বার ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, “অনেক বলেছি। মেয়ে বলছে এখন বিয়ে করবে না। কলেজে পড়াব পড়াব করে তো তিরিশ বছর বয়স করে ফেলল। আর কত দিন?”

কমলেশ ঠান্ডা গলায় বললেন, “এখানে সিস্টেমটাই তো এ রকম। ভাল ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া নিয়ে থাকতে চাইলে চাকরি-বাকরি পেতে পেতে বয়স হয়ে যায়। কী অদ্ভুত!”

নবনী এ বার আরও ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, “এখানে পড়ে থাকার দরকার কী? বিদেশে গিয়ে পড়ানোর চাকরি নেবে। কত ছেলেমেয়ে তো পড়াচ্ছে। এখানে সারা রাত কলেজে আটকে থাকার থেকে তো সেটা অনেক ভাল।”

কমলেশ মুখ তুলে বললেল, “আহি আপত্তি করছে না কি?”

নবনী মুখ ঘুরিয়ে বললেন, “তুমি জিজ্ঞেস করো। মেয়ের সঙ্গে এত আদিখ্যেতার সম্পর্ক আর এইটা জিজ্ঞেস করতে পারছ না!”

কমলেশ শান্ত ভাবে বললেন, “আমি তো এতটা জানতাম না।”

নবনী এ বার গলা তুলে বললেন, “জানতে না কেন? একমাত্র মেয়ে, তার বিয়ের ব্যাপার জানবে না? শুধু আমি জানব? কেন? তুমি চাকরি করছ আর আমি ঘরে বসে আছি বলে? মেয়েকে তো আমি মানুষ করে দিয়েছি। আমার ডিউটি শেষ। আমার যা কোয়ালিফিকেশন তাতে আমিও চাকরি করতে পারতাম। ভাল চাকরি পেয়েও করিনি। কেন করিনি? না আমি সংসার দেখব, মেয়ে মানুষ করব। মেয়ে তো আমার একার নয়, তোমারও।”

কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন কমলেশ। হুইস্কির গ্লাস হাতে নিয়ে ছোট করে চুমুক দিলেন। নবনীকে তিনি সেই সময়ে অনেক বুঝিয়েছিলেন। চাকরির

boierpathshala.blogspot.com

সুযোগ যখন এসেছিল বলেছিলেন, অবশ্যই করা উচিত। ওয়ার্কিং মায়ের ছেলেমেয়েরাও ভাল হয়, দারুণ কেরিয়ার করে। চারপাশে ভূরি ভূরি উদাহরণ রয়েছে। আবার বাবা–মা সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখার পরেও ছেলেমেয়েদের গোল্লায় যাওয়ার ঘটনা অজস্র। এই ভাবে দুই আর দুইয়ে চার হয় না। নবনী রাজি হননি। বলেছিলেন, ‘‘পরে দেখা যাবে। মেয়েটা দুরন্ত।’’ এ কথাটা অবশ্য সত্যি। ছোটবেলায় আহি খুব ছটফটে ছিল। কমলেশ জানতেন, সেটা কোনও বিষয় নয়। সবাই যে ভাবে অ্যাটেনড্যান্ট রেখে ছেলেমেয়ে সামলায়, সে ভাবেই সামলানো যেত। এখন কলকাতায় ভাল ভাল সব ক্রেশ হয়েছে। সেখানে রাখা যেত।

মেয়ে একটু বড় হয়ে যাওয়ার পর ঝামেলা অনেক কমে গিয়েছিল। লেখাপড়ার কথা বলতে হত না। সে নিজের পড়াশোনার ব্যাপারে গোড়া থেকে সিরিয়াস। নবনী অবশ্য হাল ছাড়েননি। মেয়েকে ডাক্তার–ইঞ্জিনিয়র বানানোর জন্য চেষ্টা চালিয়েছেন আপ্রাণ। নানা ধরনের টিউশন, কোচিং, মক টেস্টের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। একটা বয়সের পর আহিরী আপত্তি করল। বলে দিল, ডাক্তার–ইঞ্জিনিয়র হওয়ার মধ্যে সে নেই, সে টিচিং প্রফেশনে যাবে। সুতরাং তাকে নিয়ে মায়ের এই ছোটাছুটি বৃথা। নবনী চিরকালই মেয়ের ব্যাপারে পজেসিভ। তিনি চাইতেন, মেয়ে তার কথা মতো জীবন তৈরি করুক। মেয়ের ‘ডাক্তার–ইঞ্জিনিয়র’ না হওয়াটা মেনে নিতে কষ্ট হয়েছিল। তার পরেও না মেনে উপায় ছিল না।

ইউনিভার্সিটি শেষ করে আহিরী গবেষণার কাজ শুরু করল। নবনী চাইলেন, গবেষণা করতে করতে আহিরী বিয়ে করে ফেলুক। এর পরে বয়স পেরিয়ে যাবে। ছেলেও দেখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু মেয়ে বেঁকে বসে। শ্বশুরবাড়ির

boierpathshala.blogspot.com

হেঁশেল ঠেলতে ঠেলতে সে গবেষণার কাজ চালাতে পারবে না। কমলেশও তখন মেয়েকে সমর্থন করেছিলেন। বলেছিলেন, ক'টা দিন যাক। রিসার্চের কাজটা মন দিয়ে শেষ করুক। বিয়ে তো পালিয়ে যাচ্ছে না! নবনী রেগে ছিলেন খুব, কিন্তু করার কিছু ছিল না। তার পর জল আরও গড়িয়েছে। আহিরী চাকরি পেয়েছে। বয়সও বাড়ছে।

রাগ সংযত করে, গলা নামিয়ে নবনী বললেন, "মেয়ের দিকে এ বার একটু নজর দাও।"

কমলেশ অবাক হয়ে বললেন, "এত বড় মেয়ের দিকে আমি কী নজর দেব! সে কলেজের টিচার।"

নবনী দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "তাতে কী হয়েছে? কলেজে পড়াচ্ছে বলে মাথা কিনে নিয়েছে? তোমাকে কিনতে পারে, আমাকে পারবে না। যা বলছি কর। আশকারা দেওয়া বন্ধ করে, মেয়েকে সামলাও। এর পরে আপশোস করতে হবে।"

কমলেশ স্ত্রীর কথা তেমন বুঝতে পারেন না। আহিরীর ওপর কী নজর দেবেন? সে খুবই ভাল একটা মেয়ে। বাবা হিসেবে তিনি এই মেয়ের জন্য গর্ব বোধ করেন। ও বাইরে যাক অথবা দেশে থাকুক, আরও অনেক ওপরে উঠবে। হ্যাঁ একটা কথা ঠিকই, এখানকার শিক্ষাজগতের এখন অনেক রকম অস্থিরতা। রাজনীতি, দলাদলি বাড়ছে। সত্যি যারা লেখাপড়া ভালবাসে, লেখাপড়া নিয়ে থাকতে চায়, তারা মাঝেমধ্যেই হতাশ হয়ে পড়ে। বিদেশে চলে গেলে এই সমস্যা থাকবে না। কথায় কথায় ঘেরাও, কলেজ-ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের ভিতর মারপিট, হাঙ্গামা। লেখাপড়ার বদলে রাজনীতি ঢুকে পড়েছে অনেক বেশি। কিন্তু সেটাও তো আহিরীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়। জোর করে

boierpathshala.blogspot.com

তো চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। কিন্তু এর সঙ্গে তাকে সামলানোর প্রশ্ন উঠছে কেন?

“তুমি কী বলছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না নবনী।”

নবনী একটু চুপ করে থেকে চাপা গলায় বললেন, “আহি খুব বাজে একটা ছেলের পাল্লায় পড়েছে। আমি খবর পেয়েছি, সেই ছেলে কিছু করে না। লেখাপড়াতেও ভাল না। এতটাই বাজে যে সে কোনও কাজ করতে গেলে তাকে দু’দিন পরে তাড়িয়ে দেয়। বাড়িতেও জটিলতা আছে।
কী জটিলতা এখনও জানতে পারিনি। এর খপ্পর থেকে মেয়েটাকে বের করতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।”

কমলেশ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। নবনী কী বলছে এ সব! আহি এমন এক জন ছেলে ‘বন্ধু’ হিসেবে বেছেছে! হতে পারে না। নিশ্চয়ই নবনী বাড়াবাড়ি করছে। নিজের পছন্দের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চায় বলে এ সব বলছে। হয়তো একটু শুনেছে, বলছে অনেকটা।

“এত সব খবর তুমি পাও কোথা থেকে?”

নবনী স্বামীর দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে রইলেন। তার পর বললেন, “নিজের লোকদের খবর রাখব না তো কার রাখব?”

কমলেশ একটু থমকে গেলেন। নবনী কি তাঁকেও খোঁচা দিল?

নবনী বললেন, “তুমি নিশ্চয়ই জানো এই ধরনের সম্পর্কের শেষ কোথায় হয়।”

কমলেশ নিজেকে সামলে শান্ত গলায় বললেন, “তুমি কোথাও ভুল করছ না তো নবনী? আহি এক জন বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে নিজের ভালমন্দ বোঝে।”

boierpathshala.blogspot.com

নবনী একটু চুপ করে থাকলেন। তার পর স্বামীর চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন, “যাদের বুদ্ধি থাকে তারা ভুল করে না?” একটু থমকে থেকে আবার বললেন, “আহি তোমারই তো মেয়ে। এই বিষয়ে তার ভুল হওয়াটা আশ্চর্যের হবে না। আমি তাই ভয় পাচ্ছি।”

কমলেশ বুঝতে পারলেন, নবনীর ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। সে ভুলতে পারেনি। পারবেও না।

নবনী বলল, “যাক ও সব কথা। তুমি আহির খোঁজ নাও। বারোটা বাজতে চলল। মোবাইল এখনও অফ। তোমার এক বার যাওয়া উচিত। দূর থেকে হলেও দেখে আসা দরকার ওখানে কী হচ্ছে। আর মদ খাওয়ার কারণে তুমি যদি ড্রাইভ করতে না পারও তা হলে ক্যাব ডেকে দাও, আমি যাব।”

কথা শেষ করে নবনী চলে গেলেন। কমলেশ বুঝতে পারলেন, কথা বাড়িয়ে লাভ হবে না। নবনী অশান্ত। সে অনেকগুলো সমস্যার মধ্যে রয়েছে। কমলেশ হাত বাড়িয়ে মোবাইল টেনে নিলেন। নম্বর টেপার পর চাপা গলায় কথা বললেন।

“বিভূতি, কী খবর?”

“স্যর, মনে হচ্ছে একটা কিছু নড়চড় হয়েছে।”

“কী করে বুঝলে? তুমি কি ভিতরে ঢুকতে পেরেছিলে?”

“না স্যর, ভিতরে কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। কলেজের গেটে পুলিশ আছে। তবে গোপাল বলল, এ বার ফয়সালা হয়ে যাবে মনে হয়। প্রিন্সিপাল না কার ঘরে যেন মিটিং চলছে।”

কমলেশ বললেন, “গোপাল কে?”

boierpathshala.blogspot.com

বিভূতি বলল, “কলেজের দারোয়ান। আলাপ করে নিয়েছি স্যর।”

পর্ব ১৩

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

খুশি হলেন কমলেশ। এই সময়টুকুর মধ্যেই বিভূতি সিকিয়োরিটির সঙ্গে আলাপ করে ফেলেছে। চটপটে লোক। বছরখানেক আগে এর সন্ধান পেয়েছিলেন কমলেশ। এক দিন অফিসে কাজ করছেন, নিলয় ফোন করে বলল, “স্যর, এক জন দেখা করতে চাইছে। রিসেপশনে বসে আছে।”

কমলেশ বিরক্ত গলায় বললেন, “অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?”

নিলয় বলল, “না স্যর।”

কমলেশ অবাক হয়ে বললেন, “তা হলে আমাকে জানাচ্ছ কেন? অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কারও সঙ্গে দেখা করার মতো সময় কি আমার থাকে নিলয়?”

boierpathshala.blogspot.com

নিলয় আমতা আমতা করে বলেছিল, “স্যর, লোকটা বলছে ওর কাছে নাকি জরুরি খবর আছে।”

কমলেশ আরও বিরক্ত হয়ে বললেন,
“কী খবর?”

“বলছে আপনাকে ছাড়া বলা যাবে না।”

কমলেশ বললেন, “ওকে বলে দাও, আমার কোনও জরুরি খবরের প্রয়োজন নেই।”

রিসিভার নামাতে গেলে নিলয় প্রায় ফিসফিস করে বলল, “স্যর, লোকটা বলেছে প্রোডাকশন ম্যানেজার আদিত্য সাহা সম্পর্কে সিক্রেট কিছু...”

কমলেশ বহু দিন পরে অফিসে চিৎকার করে উঠেছিলেন।

“গেটে গার্ড কেউ নেই? ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও। এত বড় স্পর্ধা!”

এই ঘটনার ঠিক এক মাস পরে আদিত্য সাহা কোম্পানি ছেড়ে চলে যায়। কিছু দিনের মধ্যে জানা যায়, কোম্পানির নাম করে সে বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু টাকা নিয়েছে। সব থেকে খারাপ যেটা করেছে তা হল, কোম্পানি যেখানে যেখানে অর্ডার সাপ্লাই করে, সেখান থেকে অ্যাডভান্সও নিয়েছে। পুলিশে কমপ্লেন করার মতো কোনও প্রমাণ সে রেখে যায়নি। একমাত্র উপায় ছিল আগে খবর পেয়ে হাতেনাতে ধরা।

এই ঘটনার দেড় মাস পরে অচেনা নম্বর থেকে ফোন পেলেন কমলেশ।

“কে বলছেন?’

boierpathshala.blogspot.com

উলটো দিকের গলা অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল, “আমি বিভূতি। বিভূতি বসাক। সবাই সংক্ষেপে বি. বি. ডাকে। আপনার কাছে গিয়েছিলাম স্যর, ভিতরে ঢুকতে দেয়নি। আপনার ফোন নম্বর জোগাড় করে ফোন করছি বলে অপরাধ নেবেন না।”

কমলেশ রায় ‘জেন্টলম্যান’ হিসেবে পরিচিত। চট করে খারাপ ব্যবহার তার ধাতে নেই। তিনি ঠান্ডা গলাতেই বললেন, “আপনার কী চাই?”

“কিছু চাই না স্যর।”

কমলেশ বললেন, “কিছু চাই না তো ফোন করেছেন কেন? এই সময় তো আমি কারও সঙ্গে গল্প করি না।”

বিভূতি গদগদ গলায় বলল, “আমাকে ‘আপনি’ বলবেন না স্যর। বয়সে ছোট, অতি সামান্য মানুষ।”

এ বার রাগ হল কমলেশের। চড়া গলায় বললেন, “কাজের কথা বলুন। আমি ব্যস্ত আছি।”

ফোনের ও পাশে বিভূতি নামের লোকটা একটু চুপ করে থেকে বলল, “স্যর, কিছু দিন আগে আমি আপনাকে আপনাদের প্রোডাকশন ম্যানেজারের খবরটা দিতে চেয়েছিলাম। আপনি তো শুনলেনই না।” লোকটা একটু থামল। তার পর বলল, “শুনলে এতটা ক্ষতি হত না। টাকার থেকে আপনাদের গুডউইলের ক্ষতি হয়েছে বেশি।”

এ বার থমকেছিলেন কমলেশ। শান্ত ভাবে বললেন, “আপনি কি আদিত্য সাহার শত্রু?”

ও পাশে হালকা হাসির আওয়াজ হল।

boierpathshala.blogspot.com

“স্যর, আমি কারও শত্রু বা বন্ধু নই। আমি খবর জোগাড় করি। আদিত্য সাহার খবর পাওয়ার পর লেগে থাকি। খবর পাকা হওয়ার পরেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম। ফর ওয়ান রিজন স্যর। যদি কিছু টাকা পাওয়া যায়।”

কমলেশ রায় বললেন, “স্পাই?”

“অনেকটা তাই স্যর। এক সময় পুলিশেও কাজ করেছি। তখন আন্ডারগ্রাউন্ডে খেলতাম। এখন প্রাইভেটে কাজ করি। ভাবলাম বড় কোম্পানিতে যদি কিছু কাজ পাই। অনেক সময় আপনাদেরও তো গোপন খবর লাগে।”

কমলেশ বললেন, “সরি বিভূতিবাবু, আমাদের কোনও গোপন খবর লাগে না।”

কথা শেষ করে ফোন কেটে দিয়েছিলেন কমলেশ। এর এক ঘণ্টা পরে কল লিস্টের নম্বর সার্চ করে লোকটিকে ডেকে নেন কমলেশ। অফিসে না, অফিস থেকে সামান্য দূরে এক কফি শপে ডেকে নেন। চকচকে কফি শপের জন্য এই লোক একেবারেই বেমানান। মাঝবয়সি, ছাপোষা চেহারা। ভিড়ে আলাদা করবার কোনও উপায় নেই। একেবারে ‘চর’ যেমনটি হওয়া উচিত। কমলেশ বলেছিলেন, “কোম্পানি নয়, আপনি আমার হয়ে কাজ করবেন। রাজি আছেন?”

বিভূতি বলল, “টাকাপয়সা ঠিক মতো পেলে রাজি না হওয়ার কোনও কারণ নেই স্যর।”

কমলেশ বললেন, “আমার জন্য জোগাড় করা ইনফরমেশন যে আপনি অন্য কাউকে দিয়ে দেবেন না সে গ্যারান্টি কী? আপনাকে বিশ্বাস করব কেন?”

boierpathshala.blogspot.com

বিভূতি কফি নয়, খাবার দিতে বলেছিল। খাওয়ার ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়, খিদে আছে। যত্ন করে কেকে কামড় দিয়ে বলল, "কোনও গ্যারান্টি নেই। আপনাদের প্রোডাকশন ম্যানেজারের কাছ থেকে তো অনেক গ্যারান্টি পেয়েছিলেন। কী লাভ হল? ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে স্যর, গ্যারান্টি, কন্ডিশন, বিশ্বাস— এ সব নিয়ে কাজ না করাই ভাল। এ সব ধারণা আজকের দিনে ফালতু।"

কমলেশ খুশি হলেন। এই লোক ঠগ, জালিয়াত হলেও স্পষ্ট কথার মানুষ। বিভূতিকে তিনি মাসকাবারি ব্যবস্থায় রেখেছেন। মাসে মাসে টাকা দেন। দরকার হলে যোগাযোগ করেন। আর কেউ জানে না। তথ্য সংগ্রহের এই প্যারালাল সিস্টেম তার একান্তই নিজের। ইতিমধ্যে সে কয়েকটা ছুটকো-ছাটকা কাজ করেছে। তার মধ্যে একটা জরুরি কাজ। প্রাইভেট সেক্রেটারি নিলয় সম্পর্কে ইনফরমেশন। নিলয় একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে। প্রেম করাটা কোনও গুরুত্বপূর্ণ খবর নয়। খবর হল, যে মেয়েটির সঙ্গে নিলয় প্রেম করেছে সে এমন একটি সংস্থার কর্মী যারা সম্প্রতি কোম্পানির প্রোডাক্ট প্রোমোশন এবং ব্র্যান্ডিং-এর দায়িত্ব পেয়েছে। এর পিছনে কি নিলয়ের কোনও ইনফ্লুয়েন্স আছে?

বিভূতিকে আজ কমলেশ নিজের কাজে লাগিয়েছেন। আহিরী কলেজ থেকে ফোন করে ঘেরাওয়ের খবর জানানোর কিছু পরে, বিভূতিকে ফোন করেছিলেন।

"কী খবর চাই স্যর?"

এই ক'দিনে বিভূতির সঙ্গে সম্পর্ক সহজ হয়েছে। ভাল ম্যানেজার হতে গেলে গুপ্তচর পুষতে হবে, এমন কথা ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার সিলেবাসে নেই। দেশ-

boierpathshala.blogspot.com

বিদেশ কোথাও নেই। তার ওপর কাজটা ‘পারফেক্ট জেন্টলম্যান’-এর মতো নয়। বরং খানিকটা ‘নীচে নেমে যাওয়া’ই বলা যায়। কমলেশ রায়ের ইমেজের সঙ্গে যায় না। তার পরেও কমলেশের মনে হয়েছে, এটা জরুরি। গোপন তথ্য কোনও কোনও সময়ে মানুষ চিনতে সাহায্য করে। এই তথ্য হাতে থাকলে সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধে হয়। সিদ্ধান্ত না নিতে পারলেও সুবিধে হয়। ইমেজ নিয়ে বসে থাকা যায়, কাজ করতে গেলে রিয়েলিটির প্রয়োজন। এক জন দক্ষ প্রফেশনাল নিজের মতো করে তার বাস্তব প্রয়োজন মেটায়। বিভূতিকে নিয়োগ করা অনেকটা সে রকমই। এর মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের কিছু নেই। ইনফরমেশনে ভরা এই দুনিয়াতে আরও একটি প্রক্রিয়ায় ইনফরমেশন আয়ত্তে আনবার চেষ্টা।

কমলেশ আজ বিভূতিকে বলেছিলেন, “খবর কিছু চাই না। তুমি সিচুয়েশনের ওপর নজর রাখবে। মাঝেমধ্যে আমাকে আপডেট দেবে।”

ইতিমধ্যে বার কয়েক সে ফোনে খবরও পাঠিয়েছে। জানিয়েছে, পুলিশ এসেছে, কিন্তু কলেজের ভিতর ঢোকেনি।

“স্যর, আমি কি ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করব? আপনার মেয়ে কেমন আছেন যদি জানতে পারি!”

কমলেশ তাড়াতাড়ি বললেন, “খবরদার না। তুমি বাইরে থাকো। কোনও ডেভেলপমেন্ট হলে জানিয়ো।”

কমলেশ উঠে পড়লেন। নবনীকে শান্ত করা দরকার। সত্যি সত্যি সে যদি মেয়ের কলেজে যাওয়ার চেষ্টা করে, সেটা একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড হবে।

boierpathshala.blogspot.com

আহিরী কলেজের দোতলায়। শর্মিষ্ঠা দত্তর ঘরের বাইরে চেয়ারে বসে আছে। চারপাশে ভাঙা কাচ, ভাঙা টবের টুকরো ছড়ানো। এগুলো পরিষ্কার করার জন্য লোক এসেছিল। শর্মিষ্ঠা দত্ত বারণ করেন। তখন তিনি রাগে আগুন হয়ে ছিলেন। দাঁত কিড়মিড় করে বলেছিলেন, "টিভি থেকে লোক আসছে। তারা এই সব ভাঙচুরের ছবি তুলবে। তখন ঠেলা বুঝতে পারবে ওরা।"

টিভির লোক ছবি তুলে নিয়ে গেছে। সেই ছবি দেখানোও হয়েছে। কেউ কোনও 'ঠেলা' বোঝেনি। ছেলেমেয়েরা ঘেরাও থেকে সরেনি।

আহিরীর ক্লান্ত লাগছে। খাওয়াদাওয়া কিছু হয়নি। চা-ও নয়। ছেলেরা টিচার্স রুমে চা এনেছিল। কেটলি-ভর্তি চা, কাগজের কাপ, বিস্কুট নিয়ে ঢুকেছিল। সবাই ভদ্র ভাবে তা প্রত্যাখান করে। যারা জোর করে আটকে রেখেছে, তাদের দেওয়া চা খাওয়া যায় না। যদিও আহিরীর খুব ইচ্ছে করছিল।

ঘেরাও হয়ে থাকতে যতটা খারাপ লাগছে, আহিরীর তার থেকেও বেশি অসহ্য লাগছে টিচার্স রুমে ঠায় বসে থাকা। সকলেরই কিছু না কিছু মত রয়েছে। কারও রাগ অর্কপ্রভ সেনের ওপর। তারা বলছে, ওঁর জন্যই যত ঝামেলা। সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন করা ঠিক হয়নি। করলেও তা পরে ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে বলা উচিত ছিল। অমন দুচ্ছাই করে তাড়িয়ে দেওয়াটা অন্যায় হয়েছে। আজকালকার ছেলেমেয়েদের ঠান্ডা মাথায় সামলাতে হয়। আবার কেউ বলেছে, ছেলেমেয়েরা অতি বদ। সব গোল্লায় গেছে। পরীক্ষার সময় পড়াশোনা করেনি বলে ঝামেলা পাকিয়েছে। ইস্যুটাকে কায়দা করে কলেজের দুর্নীতির দিকে

boierpathshala.blogspot.com

নিয়ে গেছে। যাতে কেউ নিন্দে করতে না পারে। আবার কারও মত, এর পিছনে বড় মাথা আছে। কলেজে ঝামেলা পাকানোর জন্য ফঁাক-ফোকর খঁুজছিল। মহিলারা সকলেই টেনশন করছেন। স্বাভাবিক। ঘর-সংসার আছে। এর মধ্যে দু-এক জন তো আহিরীকে বলেই বসল, "খুব বঁাচান বেঁচে গেছ। এই যদি বিয়ে-থা করে ছেলেমেয়ের মা হতে, দেখতে ঝামেলা কাকে বলে।"

আহিরীর বলতে ইচ্ছে করল, "ঠিকই বলেছেন। এখন আমি দিনের পর দিন নিশ্চিন্তে ঘেরাও হয়ে থাকতে পারব। মাসখানেকও বসে থাকতে পারি।"

কিন্তু সে কথা তো আর বলা যায় না। এ রকম একটা জটিল সময়ে কেউ রসিকতা নিতে পারবে না।

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ১৪

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র।

আটটার পর থেকে পুরুষরাও অধৈর্য হয়ে পড়েছে। অনেক ক্ষণ ‘কিছু নয়’ ভান করেছিল, আর পারছে না। মুখে বলছে ইস, অনেক লেখাপড়া করার ছিল। আসলে শুগার, প্রেশারের ওষুধ খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। কারও কারও আবার ঠিক সময়ে পারগেটিভস্ না খেলে পর দিন সমস্যা। নিশ্চিন্ত জীবনে আকাশ থেকে ঝপ করে ঝামেলা এসে পড়েছে।

আহিরী কোনও আলোচনাতেই নেই। ‘হু-হ্যাঁ’-এর বেশি সে অংশগ্রহণও করছে না। বেশির ভাগ সময়টাই ঘরের বাইরে বারান্দায় পায়চারি করেছে। এর মধ্যে পরীক্ষা-হলের সেই টুকলি করা মেয়েটা— উর্বী— এসেছিল।

“ম্যাডাম, আমার মোবাইলটা প্লিজ দিয়ে দিন। বাড়িতে খবর দিতে পারছি না।”

boierpathshala.blogspot.com

আহিরী বলল, “তুমি বাড়ি যাওনি? এত রাত পর্যন্ত কলেজে কী করছ?”

উর্বী মাথা চুলকে আমতা আমতা করে বলল, “ওদের সঙ্গে আছি।”

আহিরী বলল, “আমাদের যারা ঘেরাও করে রেখেছে ওদের সঙ্গে?”

উর্বী কিছু বলল না। মাথা নামিয়ে দঁাড়িয়ে রইল। আহিরী মেয়েটির দিকে এ বার ভাল করে তাকাল। দেখতে-শুনতে ভাল। সাজপোশাক চটকদার। সালোয়ার কামিজটা বেশ ফ্যাশনদুরস্ত। মজার কথা, সেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কলেজে পড়ে আছে, কিন্তু চোখেমুখে কোনও ক্লান্তির ভাব নেই। তার মানে এর সঙ্গে মেক-আপ কিট আছে। সুযোগ পেলেই আড়ালে গিয়ে পাফ করে নিচ্ছে।

আহিরী বলল, “তুমি অফিসে গিয়ে আমার নাম করে বলো। আচ্ছা, এসো আমার সঙ্গে।”

মোবাইল হাতে নিয়ে উর্বী বলল, “ম্যাডাম, আর কখনও হবে না।”

আহিরী বলল, “আমাকে বলতে হবে না। নিজেকে বলো। তোমার বাড়ি কোথায়?”

“কঁাকুড়গাছি।”

আহিরী বলল, “বাবা, সে তো এখান থেকে অনেকটা দূর। ফিরবে কী করে?”

উর্বী হাসিমুখে বলল, “বাস পাব তো। না
পেলে সিনিয়র দাদারা কেউ পৌঁছে দেবে। ওদের বাইক আছে।”

আহিরী বুঝতে পারল, এই মেয়ে চাইছে তার দেরি হোক এবং ‘সিনিয়র দাদা’রা কেউ পৌঁছে দিক।

boierpathshala.blogspot.com

আহিরীর মোবাইলে অনেক ক্ষণ আগেই চার্জ ফুরিয়েছে। পাওয়ার ব্যাঙ্ক গাড়িতে বলে সমস্যা হচ্ছে। গিয়ে নিয়ে আসতে পারে, ছেলেমেয়েরা কিছু বলবে না। কিন্তু সে এই সুযোগ নেবে না। মোবাইল অফ করে রেখেছে। এক দিক থেকে ভাল হয়েছে। মা বড্ড জ্বালাতন করছে। যত দিন যাচ্ছে মায়ের সমস্যা বাড়ছে। খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে। এক বার থাইরয়েডটা চেক করানো উচিত। গাইনোকোলজির সমস্যাও হতে পারে। মা'কে কে এ সব বলবে? বাবার সঙ্গেও সম্পর্কটা কেমন যেন হয়ে গেছে। কোথাও একটা তাল কাটছে। বেশ কয়েক বছর ধরে এটা চলছে। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। কিছু কি ঘটেছে? বুড়ো বয়েসে আর কী ঘটবে? বাবা নিশ্চয়ই প্রেমে পড়েনি। পড়তেও পারে। প্রেমের সঙ্গে বয়সের কী সম্পর্ক? কিঙ্কিণীর বাবা তো সিক্সটি ছুঁই-ছঁুইতে বিয়ে করল। মেয়েটি নাকি মেরেকেটে ছাব্বিশ। কিঙ্কিণী আহিরীর ইউনিভার্সিটির ব্যাচমেট। এখন বিদেশে রিসার্চ করছে। খুব ছোটবেলায় মা ক্যানসারে মারা যায়। বাবা-ই মেয়েকে মানুষ করেছে। এমনি মানুষ-করা নয়, পাখির ছানার মতো আগলে মানুষ করা। সে দিন ফেসবুকে কিঙ্কিণীর সঙ্গে কথা হল। সে বলল, "বাবা নতুন জীবন শুরু করছে।"

আহিরী লিখল, "সেটা কী রকম? নিউ জব?"

কিঙ্কিণী লিখল, "না। বাবা বিয়ে করেছে।"

আহিরী লিখল, "তাই নাকি!"

কিঙ্কিণী লিখল, "মেয়েটি আমার থেকে একটু ছোট। সেও বাবার মতোই এক জন আর্টিস্ট। তবে ড্রয়িং নয়, স্কাল্পচার করে। কাঠের কাজে নাকি কলকাতায় নাম করেছে। বাবার সঙ্গে দু'বছরের রিলেশন। বিয়ের আগে বাবা আমার কাছে পারমিশন চেয়েছিল।"

boierpathshala.blogspot.com

আহিরী লিখল, “তুই নিশ্চয়ই হ্যাঁ বলেছিলি!”

“অবশ্যই বলেছি। বাকি জীবন মানুষটা এক জন সঙ্গী পাবে, এতে আমি সবচেয়ে খুশি। দে আর অলসো ভেরি হ্যাপি। এই সামারে আমার এখানে দু’জনে আসছে।”

আহিরী লিখল, “মেসোমশাইকে আমার হয়ে কনগ্র্যাচুলেশনস জানাস।”

কিঙ্কিণী একটা স্মাইলি দিয়ে লিখল, “আমার নতুন মা আমাকে বলেছে, নাম ধরে ডাকলে বেশি খুশি হবে। আমি ভেবেছি তা-ই করব। আমার বাবাকে যে ভালবাসে সে আমার বন্ধু। কি, ভুল ভেবেছি?”

আহিরী লিখল, “একেবারেই নয়।”

কিঙ্কিণীর বাবা যদি বিয়ে করে ফেলতে পারে, তা হলে তার বাবার প্রেমে পড়তে দোষ কী?

খানিক আগে বিতানকে ফোনে ধরেছিল। এই ছেলের সব কিছুতেই রসিকতা।

“এখনও বন্দি? সাধে কি বলি, বেশি লেখাপড়া করা মানেই ঝামেলায় পড়া। টিচার ঘেরাও হচ্ছে, ডাক্তার মার খাচ্ছে, ব্রিজ ভাঙলে ইঞ্জিনিয়ার অ্যারেস্ট হচ্ছে, আইপিএস অফিসার হলে নেতা দাবড়াচ্ছে। আমি কত নিশ্চিন্ত, দেখো।”

আহিরী বলল, “আমরা মোটেই বন্দি নই। খানিক আগে স্টুডেন্টরা এসে বলল, আমরা বাড়ি চলে যেতে পারি। শুধু টিটার-ইন-চার্জ আর অর্কপ্রভ সেনকে ওরা ছাড়বে না। আমরা রাজি হইনি। এটা তো মানা যায় না। যদিও ওই দু’জনেই পাজি।”

বিতান বলল, “ও, তা হলে তোমরা এখন স্বেচ্ছাবন্দি?”

boierpathshala.blogspot.com

“মনে হচ্ছে, ছাড়া পাব। মিটিং চলছে।”

বিতান বলল, “বাড়ি ফিরবে কী ভাবে?’

আহিরী বলল, “হেঁটে। এখন ছাড়ছি। মোবাইলে চার্জ প্রায় শেষ।”

বিতান বলল, “ছাড়া পেলে জানিয়ো।”

খানিক আগে শর্মিষ্ঠা দত্ত আহিরীকে ঘরে ডেকে পাঠান। নরম গলায় বলেন, “তুমি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলো। বলো, ঘেরাও তুলে নিতে।”

আহিরী আকাশ থেকে পড়ে, “আমি বলব! আমার কথা ওরা শুনবে কেন?”

চওড়া টেবিলের এক দিকে বসে আছেন অর্কপ্রভ সেন। তিনি বললেন, “তুমি বললে ওরা শুনবে। তোমাকে ওরা পছন্দ করে।”

আহিরী অবাক হয়ে দেখল, যে মানুষটা কথা বন্ধ করে দিয়েছিল, সে শুধু তার সঙ্গে এখন কথাই বলছে না, মনে হচ্ছে কথা বলার আগে এক কাপ মধুও গিলে নিয়েছে।

আহিরী বলল, “স্যর, আমাকে কেউ কেউ পছন্দ করে ঠিকই, কিন্তু আমি এ সব পলিটিক্সের মধ্যে কখনও থাকি না। থাকবও না। তা ছাড়া, আমি এক জন জুনিয়র টিচার। আমার কথা ছেলেমেয়েরা শুনবে কেন?”

টিচার-ইন-চার্জ বললেন, “তোমায় থাকতে হবে না। তুমি শুধু একটা অ্যাপিল করো। এতগুলো বয়স্ক মানুষ আটকে রয়েছেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে...”

আহিরীরা টিচার্স রুমে বসেই খবর পেয়েছিল, শর্মিষ্ঠা দত্ত বাইরের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারা বলে দিয়েছে, ছাত্রদের ব্যাপারে জোরজুলুম করা

boierpathshala.blogspot.com

সম্ভব নয়। আলোচনা করে মিটিয়ে নিতে হবে। অর্কপ্রভ সেন সরকারের কোনও হর্তাকর্তাকে ধরেছিলেন। তিনি নাকি আর এক কাঠি ওপরে গিয়েছেন। বলেছেন, এই কলেজের টাকাপয়সা নিয়ে কমপ্লেন আছে। এখানে হাত দেওয়া যাবে না। যে কোনও সময় ইনভেস্টিগেশনের অর্ডার হয়ে যেতে পারে। এই সময় আগ বাড়িয়ে কলেজের পক্ষ নিয়ে কিছু করতে যাওয়া সম্ভব নয়। এতে শর্মিষ্ঠা দত্তরা খুবই ঘাবড়েছেন। অনেক জনকে হাতড়ে এখন আহিরীকেই ভরসা হয়েছে। নিশ্চয়ই অকর্প্রভ সেন মাথায় ঢুকিয়েছেন।

আহিরী বলল, "ম্যাডাম, আমি ঘেরাও তুলে নিতে বলতে পারব না। আপনাদের সঙ্গে আলোচনায় যাতে বসে, তার জন্য অনুরোধ করতে পারি। তবে মনে হয় না শুনবে।"

অর্কপ্রভ সেন টিচার-ইন-চার্জের দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বললেন, "অন্তত তাই হোক। দরকার হলে দু–একটা ছোটখাটো ডিমান্ড মানতে হবে। তুমি কথা বলে দেখো আহিরী।"

ছেলেমেয়েরা আহিরীর কথা শুনেছে। তারা মিটিঙে বসেছে। তাকে ভিতরের আলোচনায় ডাকা হয়েছিল। সে রাজি হয়নি। টিচার-ইন-চার্জ যেমন বলেছিলেন, ছাত্রছাত্রীরাও ডেকেছিল। এমনকী অর্কপ্রভ সেনও বলেছিলেন। আহিরী রাজি হয়নি। এই মিটিঙে বসবার সে কে? এরা প্রয়োজনে তাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। তার বেশি নয়।

আহিরী শর্মিষ্ঠা দত্তর ঘরের সামনে থেকে সরে এল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে হল, যত রাতই হোক, বিতানকে আসতে বললে হত। গাড়ির পাশে বসে বাড়ি পর্যন্ত বকবক করতে করতে যেত। তার পর একটা ট্যাক্সি ধরে ফিরে যেত নাহয়। এখন যতই বকবক করুক, বিতানের সঙ্গে পরিচয়

boierpathshala.blogspot.com

কিন্তু ঠিক উলটো কারণে। তার কম কথা এবং নিস্পৃহতা আহিরীকে প্রথম আকর্ষণ করেছিল।

সেটা ছিল এক ডিসেম্বরের বিকেল। কল্যাণী ইউনিভার্সিটিতে একটা সেমিনার সেরে কলকাতায় ফিরছিল আহিরী। কলেজে সবে জয়েন করেছে। তখনও তার নিজের গাড়ি হয়নি। অর্ডার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু রঙের জন্য পেতে সময় লাগছিল। আহিরী তখন সুযোগ পেলে বাবার গাড়ি নিয়ে বেরোয়। সে দিনও তা-ই করল। বাবা বলেছিল, "দীনেশকে নিয়ে যা।"

আহিরী ভুরু কঁুচকে বলেছিল, "কেন? আমি গাড়ি চালাতে পারি না? দু'জন ড্রাইভারের কী প্রয়োজন?"

বাবা হেসে বলেছিল, "তা অবশ্য ঠিক। এইটুকু পথ যেতে এক জনই এনাফ। তাও বলছিলাম, পথেঘাটে যদি কোনও সমস্যা হয়।"

আহিরী কঁাধ ঝঁাকিয়ে বলল, "হলে হবে। দীনেশকাকা কি আমার সেভিয়ার? প্রবলেম হলে আমি ফেস করব। সারা পৃথিবীতে মেয়েরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ড্রাইভ করে চলে যাচ্ছে। আমাদের বেলায় এই আতুপাতুপনাটা এ বার ছাড়ো।"

বাবা বললেন, "আই এগ্রি উইথ ইউ। তোমার মা'কে কিছু বোলো না। আর আমাকে অফিসে ড্রপ করে দিয়ে যাও।"

কল্যাণী যাওয়ার রাস্তাটা চমৎকার। হাইওয়েতে ড্রাইভ করবার মজা আহিরীকে সব সময়েই টানে। হুহু করে পৌঁছে গেল। সেমিনার শেষ হতে হতে বিকেল। দু-এক জন আহিরীর সঙ্গে গাড়িতে ফেরার জন্য ছোঁক-ছোঁক করছিল। একেবারেই অচেনা। সেমিনারে আলাপ হয়েছে। আহিরী তাদের সহজ ভাবে

boierpathshala.blogspot.com

কাটিয়ে দিল। তার নাকি কল্যাণীতে এক আত্মীয়ের বাড়ি যেতে হবে। তারা সাধাসাধি করলে রাতে বাড়ি ফেরা নাও হতে পারে। শেষে বলল, “ইস একসঙ্গে গেলে খুব ভাল হত। গল্প করা যেত। আশা করি পরে কখনও আমরা এই সুযোগ পাব।”

পর্ব ১৫

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

শীতের পড়ন্তবেলা দিয়ে কলকাতার দিকে গাড়ি ছুটিয়েছিল আহিরী। স্পিকারে গান চলছে। কান্ট্রি রোডস, টেক মি হোম, টু দ্য প্লেস আই বিলং। আহিরী মনে মনে নিজের পিঠ চাপড়াল। ভাগ্যিস কাউকে লিফ্‌ট দেয়নি! একা চলার আনন্দটাই নষ্ট হত। মোবাইল টেনে নিয়ে বাবাকে ফোন করল।

“ফিরছি।”

“একাই আছিস? নাকি কোনও বয়ফ্রেন্ডকে তুলে নিয়েছিস?”

boierpathshala.blogspot.com

আহিরী বলল, “হ্যাঁ নিয়েছি। খানিক আগে জন ডেনভার হাত দেখিয়ে লিফ্‌ট চাইলেন। তুলে নিয়েছি। উনি এখন গান শোনাচ্ছেন। শুনতে পাচ্ছ না? কান্ট্রি রোডস, টেক মি হোম?”

বাবা হেসে বলেছিল, “পাচ্ছি। এনজয়।”

ফোন রাখার পঁাচ মিনিটের মধ্যে ডেনভারের ‘টেক মি হোম’ গান ছাপিয়ে টায়ার ফাটার আওয়াজ হল। নব্বই কিলোমিটার বেগে ছোটা গাড়ি সামান্য কেঁপে উঠল। সাবধানে গাড়ি পাশ করল আহিরী। সন্ধে নামছে। এক পাশে ধু-ধু ক্ষেত, অন্য পাশে মাঠ। রাস্তা পেরোলে এক কোণে ছোট্ট এক চিলতে চায়ের দোকান। শীতের বেলা ফুরিয়ে গিয়েছে। চায়ের দোকানে টিমটিমে আলো জ্বলছে। গাড়ি থেকে নেমেই ঠান্ডার কনকনানি টের পেল আহিরী। পিছনের বঁা দিকের চাকাটা গিয়েছে। ডিকি খুলল আহিরী। গাড়ির যাবতীয় মেকানিজমের মধ্যে চাকা বদল সবচেয়ে সহজ কাজ। হাতে কালি লাগে, এই যা। গুনগুন করে ‘কান্ট্রি রোড’ গাইতে গাইতে জ্যাক ঘুরিয়ে গাড়ি তুলে ফেলল আহিরী।

ঝামেলা শুরু হল এর পর। ডিকি থেকে স্টেপনি গড়িয়ে এনে গাড়িতে লাগাতে গিয়ে আহিরী বুঝতে পারল, স্টেপনি নেতিয়ে আছে। কোনও কারণে মেরামত করা স্টেপনির ফুটোফাটা গোপনে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ডিকিতে বসেই হাওয়া বের করে দিয়েছেন তিনি। দীনেশকাকা খেয়াল করেনি। আহিরী নিজেকেও দোষ দিল। এতটা পথ যাবে, বেরোনোর সময় ডিকি খুলে দেখে নেওয়া উচিত ছিল। শিক্ষা হল। কিন্তু এখন কী হবে? আশেপাশে চাকা মেরামতের কোনও দোকান চোখে পড়ছে না। শীতের অন্ধকার ঘনিয়ে

boierpathshala.blogspot.com

এসেছে। এত ক্ষণ পর একটু নার্ভাস হল আহিরী। দুটো ফেঁসে যাওয়া চাকা নিয়ে কী করবে সে? আচ্ছা বিপদে পড়া গেল তো!

রাস্তা পেরিয়ে ঝুপড়ি চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ল আহিরী। দোকান এখনও জমেনি। দু'জন চা খাচ্ছে। তার মধ্যে এক জন কমবয়সি, অন্য জন বুড়োটে ধরনের। কম বয়সের ছেলেটির গায়ে জ্যাকেট, মাথায় টুপি। কাঁধে ব্যাগ। বোঝা যাচ্ছে, ব্যাগটা ক্যামেরার। আহিরী একটু নিশ্চিন্ত হল। এতগুলো লোক যখন আছে, একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু যা শুনল তাতে মাথায় হাত। টায়ার সারাতে হলে বড় রাস্তা ছেড়ে বেশ খানিকটা ভিতরে যেতে হবে। কী করে যেতে হবে? চাকা গড়িয়ে তো যাওয়া যাবে না। ভ্যানরিকশা ধরতে হবে। আঁতকে উঠল আহিরী। গাড়ি ফেলে চাকা নিয়ে সে কী ভাবে যাবে? বাবাকে কলকাতায় ফোন করবে? প্রশ্নই ওঠে না। ভীষণ অস্থির হয়ে পড়বে। এতটা পথ আসতেই তো অনেক সময় লাগবে। এ তো আর গাড়ির মেকানিক ধরে আনার মতো সহজ ব্যাপার নয়। টায়ার সারাতেই হবে। বাবা তো টায়ার মেরামতির দোকান নিয়ে আসতে পারবে না। সবচেয়ে বড় কথা, আহিরীর হেরে যাওয়াও হবে। সমস্যা হলে সে নিজেই তার সমাধান করবে, বলে এসেছে। পিনপিনে গলায় বলেনি, জোর গলায় বলেছে। টায়ার ফেটে যাওয়ার মতো সামান্য ঘটনাতেই সেই জোর ফুড়ুৎ? একেবারে কলকাতায় এসওএস পাঠাতে হচ্ছে! যা করার নিজেকেই করতে হবে। আহিরী দোকানের ভিতরে এগিয়ে গেল।

"এখানে কাউকে পাওয়া যাবে? গাড়ির চাকা সারানোর ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারেন এমন কাউকে?"

boierpathshala.blogspot.com

দোকানদার বিরক্ত গলায় বললেন, “কাকে পাবেন? দেখছেন একা মানুষ, দোকান সামলাচ্ছি!”

আহিরী একটু থমকে গিয়ে বলল, “আমি পে করব... টাকা দেব।”

দোকানদার আরও বিরক্ত হয়ে বলল, “টাকা দেবেন তো কী? দোকান ফেলে আপনার চাকা মাথায় নিয়ে দৌড়তে হবে?”

এ কেমন কথা বলার ভঙ্গি! আহিরীর রাগ হল। তার পরেও সে নরম গলায় বলল, “আপনি যাবেন কেন? কাউকে একটা খবর দিন। ওই টায়ার মেরামতের দোকানেই খবর দিন না। ওরা এসে চাকাটা নিয়ে যাবে। আপনি যদি কষ্ট করে ওদের কারও ফোন নম্বর দিতে পারেন, আমি ফোন করে রিকোয়েস্ট করব।”

দোকানদার বলল, “চাকা মেরামতের দোকান কি আমার শ্বশুরের, যে বললেই ছুটে আসবে?”

আহিরীর রাগ বেড়ে গেল। এই লোক তো অতি বদ প্রকৃতির! হাইওয়ের ধারের চায়ের দোকানগুলো সব সময় খুব ভাল হয়। মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার জন্য এরা বিখ্যাত। পথচলতি মানুষের বিপদে-আপদে দোকানের মালিক, কর্মচারীরা সবার আগে এগিয়ে আসে। কিন্তু এই দোকান হাইওয়ের ধারের চায়ের দোকানের কলঙ্ক। এত ক্ষণ ধরে চারপাশটা কুয়াশা-মাখা ছবির মতো সুন্দর হয়ে ছিল, নিমেষে তার ওপর যেন খানিকটা কালি পড়ে গেল।

আহিরী ঠান্ডা গলায় বলল, “এ ভাবে বলছেন কেন? কেউ সমস্যায় পড়ে হেল্প চাইলে আপনি এ ভাবে কথা বলেন?”

boierpathshala.blogspot.com

দোকানদার এ বার বসে থাকা দু'জন খদ্দেরের দিকে তাকিয়ে বলল, "ফুর্তি করতে এসে গাড়ি বিগড়োবে, তার পর বলবে আমায় সাহায্য করুন। এই তো পরশু রাতে এক দল ছেলেমেয়ে গাড়ি ধাক্কা মেরে... সব মাল খেয়ে টাল..."

আহিরী আর নিজেকে সামলাতে পারল না। গলা তুলে চিৎকার করে উঠল।

"শাট আপ। আমি কোনও ফুর্তি করতে এখানে আসিনি। আমি এক জন প্রফেসর। কল্যাণী ইউনিভার্সিটিতে একটা সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে এসেছিলাম। আপনি কোন সাহসে আমাকে অপমান করছেন?"

দোকানদারও তেড়েফুঁড়ে বলল, "আমার দোকানে ঢুকে আপনি কোন সাহসে হুজ্জতি পাকাচ্ছেন? এখানে কি গাড়ি সারানো হয়?"

আহিরী বলল, "ভদ্রভাবে কথা বলুন। এক জন মহিলার সঙ্গে কী ভাবে কথা বলতে হয় জানেন না? একা পেয়ে কি অবলা ভাবছেন?"

দোকানদার বাইরে হাত দেখিয়ে বলল, "যান যান, যাকে খুশি ডাকুন। এটা কলকাতা নয়।"

এ বার ক্যামেরার ব্যাগ-কাঁধে যুবকটি উঠে দাঁড়াল। আহিরীর পাশে এসে গলা নামিয়ে বলল, "বাদ দিন, এদের সঙ্গে চেঁচামেচি করে সময় নষ্ট। বাইরে আসুন। আমি দেখছি কী করা যায়।"

আহিরী বুঝল, সত্যি সময় নষ্ট। সে বাইরে চলে এল। যুবকটিও একটি কথা না বলে, রাস্তা পার হল। তার পর প্রায় ম্যাজিকের মতো একটি মোটরবাইক-চালককে পাকড়েও ফেলল। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, ছেলেটি স্থানীয়। মোটরবাইকের পিছনে একটা মস্ত ঝুড়ি বাঁধা। চালকের কানের কাছে যুবকটি ফিসফিস করে কিছু বলল। ছেলেটি আহিরীর দিকে ভয়ে ভয়ে এক বার

boierpathshala.blogspot.com

তাকিয়ে ঘাড় কাত করল। রাজি হওয়ার লক্ষণ। মোটরবাইক থেকে ঝুড়ি নামিয়ে চাকা তোলা হল। যুবকটি বাইকের পিছনে বসে হুশ করে চলে গেল অচেনা চালকের কাঁধ ধরে। যাওয়ার সময় ক্যামেরার ব্যাগটা রেখে গেল গাড়িতে। মশা আর ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচতে আহিরী কাচ তুলে বসে রইল গাড়িতে। খুব বেশি হলে পঁচিশ মিনিট। মেরামত করা চাকা এনে যুবকটি বলল, "নিন, লাগিয়ে নিন। আমি গাড়ির চাকা লাগাতে জানি না।"

"না না, আপনি কেন লাগাবেন? আমি করে নিচ্ছি। আপনার কাছে টর্চ আছে? এত অন্ধকারে নাট-বল্টুগুলো দেখতে পাব না। গাড়ির আলো জ্বালালেও নয়। হাত ফসকে পড়ে গেলে মুশকিল। আজ পর পর যা ঘটছে..."

যুবকটি বলল, "দেশলাই আছে।"

"দেশলাই? ওতে কি পারব?"

একটা দেশলাইকাঠি নিভে গেলে আবার আর একটা জ্বলে উঠছে। অস্বস্তি হচ্ছে আহিরীর। যুবকটি হাতে দেশলাই নিয়ে ঝুঁকে আছে। নিশ্চয়ই তার অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু উপায় কী? আহিরী বারণও করতে পারছে না। মনে মনে নিজের গালে একটা চড়ও মারল আহিরী। ছি ছি। একটা টর্চও রাখেনি সঙ্গে! যেন গাড়ির চাকা শুধু দিনেই বদলাতে হয়। আজ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে, গাড়ি চালানো মানে শুধু স্টিয়ারিং ধরা নয়। তবে চায়ের দোকানের ঝগড়াটা করে ভাল হয়েছে। নইলে এই লোককে পাওয়া যেত না। সুন্দরী তরুণীর অপমান নিশ্চয়ই মেল শভিনিজমে লেগেছে। ইস, এখনও লোকটার নাম জানা হয়নি।

কাজ শেষ হলে আহিরী হাত ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, "আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব! আমার নাম আহিরী। আমি কলেজে পড়াই।" কলেজের নাম বলল আহিরী।

boierpathshala.blogspot.com

“আমি বিতান।”

বিতান হাত বাড়িয়ে গাড়ি থেকে ক্যামেরার ব্যাগটা নিল। আহিরী খানিকটা গদগদ ভাব দেখিয়ে বলল, “আপনি ছবি তোলেন? ফোটোগ্রাফার?”

বিতান নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলল, “না, ফোটোগ্রাফার নই। পিছনে একটা ঝিল আছে। এই সময়টায় মাইগ্রেটরি বার্ডস আসে। খবর পেয়ে বন্ধুর ক্যামেরা নিয়ে এসেছিলাম।”

আহিরী বলল, “বাহ্, চমৎকার তো! আপনি কোথায় যাবেন?”

বিতান বলল, “আপনি আমাকে একশো বাহাত্তর টাকা দেবেন। এমারজেন্সি বলে টায়ারের দোকানে বেশি নিয়েছে। বাইকের ছেলেটাকে একশো টাকা দিয়েছি।”

আহিরী চটপট বলল, “এ তো কোনও টাকাই নয়। আপনি না থাকলে ঝামেলা হত। আপনি কোথায় যাবেন?”

“কলকাতা।”

আহিরী খুশি হয়ে বলল, “আসুন, গাড়িতে উঠুন। আমি নামিয়ে দেব।”

বিতান বলল, “না, আমি বাসে যাব।”

এ রকম সরাসরি প্রত্যাখানের জন্য আহিরী প্রস্তুত ছিল না। বোকা বোকা হেসে বলল, “কেন? বাসে যাবেন কেন? আসুন দু’জনে গল্প করতে করতে চলে যাই। ভাল লাগবে।”

বিতান ঠান্ডা গলায় বলল, “আমার গল্প
করতে করতে যেতে ভাল লাগবে না। আপনি টাকাটা দিন।”

boierpathshala.blogspot.com

এ তো ভদ্রভাবে অপমান! আহিরী থতমত খেল। আচ্ছা ঠেঁটা লোক তো! কথা না বাড়িয়ে ব্যাগ খুলে দু'টো একশো টাকার নোট বের করে দিল।

বিতান বলল, "আমার কাছে ভাঙানি নেই।"

আহিরী গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, "থাক। আপনার কাছ থেকে আমার হিসেব বুঝে নিতে ভাল লাগবে না।"

ঠিক এক সপ্তাহ পরে, এক দুপুরে ক্লাস করে টিচার্স রুমে ঢুকতে যাবে আহিরী, পিয়ন এসে জানাল, এক জন দেখা করতে চায়।

বিতান সাতাশ টাকা ফেরত দিতে এসেছিল। আরও এক টাকা নিয়েছে দেশলাইয়ের জন্য। আহিরী তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় গড়িয়াহাটের এক নামকরা চায়ের বুটিকে। বিতান রাজি হচ্ছিল না।

আহিরী কড়া গলায় বলল, "এসেছেন ভাল করেছেন। সে দিন আমাকে অনেক অপমান করেছিলেন। উপকার তার থেকে বেশি করেছিলেন বলে কিছু বলতে পারিনি। আজ সেই জবাবগুলো দেব। কলেজে দাঁড়িয়ে তো দেওয়া যাবে না। তাই আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। চিন্তা করবেন না, কলেজের গেটে নামিয়ে দেব।"

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ১৬

দু'মাস পরে বিতান তাকে সে দিনের ঘটনা সম্পর্কে চারটি তথ্য দেয়। এক, সেই চায়ের দোকানের দোকানদারটির মাথায় সমস্যা আছে। সে নাকি প্রায়ই ঝামেলা করে এবং মার-টারও খায়। রাস্তায় কেতরে থাকা গাড়ি নিয়ে ঝামেলা করলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠতে পারে আঁচ করে সে দিন আহিরীকে দোকান থেকে বের করে নিয়েছিল বিতান। নইলে এর মধ্যে সে ঢুকত না। তার মনে হয়েছিল, খানিক ক্ষণের মধ্যেই মেয়েটি আরও রেগে যাবে এবং লোকটাকে একটা চড় মারবে। দ্বিতীয় তথ্যটি হল, সে দিন স্থানীয় মোটরবাইক চালককে সে জানিয়েছিল, ওই ম্যাডামের সঙ্গে পুলিশের চেনাজানা রয়েছে। খানিক আগেই সে পুলিশ ডাকার কথাও বলেছে, তাই ওর কাজটা করে দেওয়াই বুদ্ধিমানের হবে। তিন নম্বর তথ্য, পছন্দের মানুষ ছাড়া সত্যিই বিতানের কথা বলতে ভাল লাগে না। সুন্দরী হলেও না। সে দিন আহিরীকে সে যতটা দেখেছিল তার মধ্যে পছন্দ হওয়ার মতো অনেক কিছুই ছিল। কিন্তু

boierpathshala.blogspot.com

সেই পছন্দ গাড়িতে উঠে গল্প করতে করতে দীর্ঘ পথ যাওয়ার মতো নয়। চার নম্বর তথ্যটি বলবার আগে একটু থমকেছিল বিতান।

“আমি খুঁজে খুঁজে তোমার কলেজে কেন গিয়েছিলাম জানো?”

আহিরী মোবাইল কানে চেপে ধরে বলেছিল, “আর যাই হোক, আমার টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য যে নয় সেটা বলতে পারি।”

বিতান বলল, “দেশলাইয়ের আলোয় অতক্ষণ দেখার পর মনে হয়েছিল, এক বার ফটফটে দিনের আলোয় তোমাকে দেখা দরকার। কারণ তার পর যখনই তোমার মুখটা মনে পড়ছিল, সেই মুখের এক পাশ ছিল অন্ধকার।”

আহিরী মোবাইল ফোন কানে আরও জোরে চেপে বিছানায় উপুড় হয়ে বলেছিল, “দিনের আলোয় কী দেখলে?”

“বলব না।”

এই ছিল আলাপের প্রথম ভাগ। কম কথা বলা যে যুবকটিকে আহিরী তখন চিনেছিল, সে এখন তার সঙ্গে বকবক করতে খুবই পছন্দ করে। আহিরীও অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিতান চুপ করে গেলে তার চিন্তা হয়। তার থেকেও বড় কথা, এই ছেলে জীবনকে নিয়ে যে এ রকম রসিকতা করতে পারে, সে দিন গম্ভীর মুখ দেখে একেবারেই বুঝতে পারেনি আহিরী।

রাত বারোটার অল্প আগে ছেলেমেয়েরা ঘেরাও তুলে নিল।

boierpathshala.blogspot.com

৮

বিতানকে ডোরবেল টিপতে হল দু'বার। তার পরেও কিছু ক্ষণ দাঁড়াতে হল। কেউ দরজা খুলছে না। আবার বেল-এ হাত রাখল বিতান। ফ্ল্যাটে কি কেউ নেই?

তৃতীয় বার বেল বাজানোর আগেই এক তরুণী দরজা খুলল। চেহারা কিঞ্চিৎ ভারীর দিকে। শর্ট প্যান্টের ওপর কালো রঙের একটা স্লিভলেস জামা পরেছে। তার ফর্সা শরীর অনেকটাই উন্মুক্ত। টলটলে মুখে বিরক্তি। মেয়েটির হাতে বই। পড়তে পড়তে তাকে উঠে আসতে হয়েছে।

এই তরুণীর নাম ঊর্বী। বিতানকে দেখে সে মুখের বিরক্তি মুছে এক গাল হাসল।

"ও আপনি? পড়ছিলাম বলে বেল-এর আওয়াজ শুনতে পাইনি। সরি। আসুন, ভিতরে আসুন।"

দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল ঊর্বী। বিতান ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, "না না, ঠিক আছে।"

বিতানের প্রতি উর্বীর আচরণ অদ্ভুত। কোনও দিন মুখ ঘুরিয়ে নেয়, কোনও দিন এমন ভাবে উচ্ছ্বাস দেখায় যে মনে হয়, বিতানকে সে খুবই পছন্দ করে। যে দিন পছন্দের 'ফেজ' চলে, হড়বড় করে অনেকটা কথা বলে ফেলে। এই ছোট ফ্ল্যাটে এক চিলতে একটা বসবার জায়গা রয়েছে। ড্রয়িংরুমের মতো। বেতের সোফা, বইয়ের র‍্যাক, লম্বা ফুলদানি। তবে সাজানো-গোছানো কিছু নয়। দেখে মনে হয়, অনেক দিন থেকে আছে, তাই নড়াচড়া কিছু করা হয়নি। বিতান এলে এখানে বসে। যে দিন তার মুড ভাল থাকে, ঊর্বীও বসে পড়ে।

boierpathshala.blogspot.com

আবার কখনও সে নিজের ঘরে গিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয়। যাবার আগে তেতো গলায় বলে যায়, "আপনার বাবা এখন বাথরুমে ঢুকেছেন, অপেক্ষা করতে হবে। আজকাল বাথরুমে ওঁর মিনিমাম দু'ঘণ্টা সময় লাগে। বেশিও লাগতে পারে।"

বিতান হলে, "তা হলে বরং পরে আসি।"

ঊর্বী কাঁধ ঝাকিয়ে বলে, "সে আপনি বুঝবেন। ইচ্ছে করলে বাথরুমের বাইরে টুল নিয়ে বসে কথা চালাতে পারেন। আর তা না চাইলে দরজা টেনে দিয়ে চলে যেতে পারেন।"

ঊর্বীর মায়ের নাম মালবিকা। মহিলা বাড়ি থাকলে ঊর্বী বিতানের সঙ্গে কথা বলে না। ওই মহিলা বাড়িতে থাকলে বিতান আসেও না। যে কয়েক বার এসেছে, মালবিকা হয় সামনেই আসেননি, নয়তো "চা খাবে? খাবে না? আচ্ছা বোসো, তোমার বাবা আসছে।" বলে নিজের কাজে বেরিয়ে গিয়েছেন। উনি বিতানকে যে পছন্দ করেন না, সেটা হাবেভাবে স্পষ্ট করে রেখেছেন। সরাসরি কিছু বলেন না এই যা। এর মধ্যে বিতান কোনও অস্বাভাবিকতা দেখতে পায় না। স্বামীর প্রথম পক্ষের সন্তানকে পছন্দ করবার কোনও দায় এই মহিলার নেই।

মায়ের আড়ালে ঊর্বী মিটিমিটি হেসে বলে, "মা আপনাকে কেন পছন্দ করে না বলতে পারবেন?"

প্রশ্ন অস্বস্তিকর, উত্তর দেওয়া আরও অস্বস্তিকর। ঊর্বীর মতো তরল মনের মেয়ের পক্ষেই এই ধরনের প্রশ্ন করা সম্ভব। আর কেউ পারত না।

বিতান বলে, "ঠিক জানি না। মনে হয় পছন্দ করার কোনও কারণ নেই।"

boierpathshala.blogspot.com

ঊর্বী বলল, “আসলে আপনাকে দেখলে মা’র মনে পড়ে যায়, তার স্বামীর অনেক বয়স। আপনি যদি ছোট ছেলে হতেন, মা’র এতটা সমস্যা হত না। আপনার ওপর ছড়িও ঘোরাতে পারত। আমার মা ছড়ি ঘোরাতে পছন্দ করে। কিন্তু আমার ওপর পারে না। আপনার বাবার ওপর ঘোরায়।” কথা শেষ করে ঊর্বী হিহি আওয়াজ করে হাসে।

বিতান জানে, এই যুক্তি ভুল। ঊর্বীর মা বিয়ের সময়েই জানতেন, তিনি যাঁকে বিয়ে করতে চলেছেন, তাঁর একটি ছেলে আছে এবং সে বয়সে যথেষ্ট বড়।

ঊর্বী হাই তুলে বলে, “তবে আমিও ঠিক করেছি আমার থেকে বয়সে অনেকটা বড় কাউকে বিয়ে করব। বয়সে বড় হলে বরেরা কেয়ারিং হয়। বউদের বেশি ভালবাসে। বউয়ের কথা শোনে।”

বিতান চুপ করে থাকে। সামাজিকতার নিয়ম অনুযায়ী এই ফাজিল চরিত্রের মেয়েটি তার বোন। কিন্তু কখনও সে ‘দাদা’ ডাকে না, ‘আপনি’ সম্বোধন থেকেও সরে না। বিতান মেয়েটির এই আচরণ পছন্দ করে। কোনও ভনিতা নেই। এত কম বয়সেও তার মতামত স্পষ্ট।

ছোটবেলায় মায়ের মৃত্যুর পর বিতান কলকাতার বাইরে হস্টেলে থেকে লেখাপড়া করেছে। কলেজে পড়ার সময় সে আবার কলকাতায় ফেরে। এই ফ্ল্যাটে ক’দিন থাকার পরপরই বাবা ছোটখাটো একটা লেকচার দিলেন।

“পড়াশোনার জন্য বাড়ি নয়, বোর্ডিং, হস্টেলই প্রপার জায়গা। সেখানে সবাই লেখাপড়ার মধ্যে থাকে, বন্ধুদের সাহায্য পাওয়া যায়। বাড়িতে থাকা মানে অনেক পিছুটান। এই জন্যই গুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণের প্রথা চালু ছিল। সেই সময়ের মানুষ তো আর বোকা ছিল না। তুমি কী বলো, ছিল?”

boierpathshala.blogspot.com

বিতান অস্ফুট স্বরে বলেছিল, “না, ছিল না।”

“তা হলে তুমিও হস্টেলে গিয়ে থাকো। খরচাপাতি যা লাগে খানিকটা আমার কাছ থেকে নেবে, খানিকটা টিউশন, পার্টটাইম কাজ করে উপার্জন করবে। এতে সাবলম্বী হবে। মনে রাখবে, নিজের পায়ে দাঁড়ানোটাই জীবনে আসল কথা। মানুষ ছাড়া জীবজগতের কেউ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। কি, তাই তো?”

বিতান মাথা নেড়ে বলেছিল, “হ্যাঁ, তাই।”

“তা হলে ব্যবস্থা করে ফেলো। কলেজে পড়া শেষ হলে বাক্সপ্যাঁটরা গুছিয়ে আবার নিজের বাড়িতে ফিরে আসবে।”

বাবার উপদেশ মতো বিডন স্ট্রিটের হস্টেলে সিট নিল বিতান। তবে কলেজ শেষ করেও আর বাড়িতে ফেরা হয়নি। তত দিনে বাবা আবার বিয়ে করে ফেলেছেন। তার পরিকল্পনার মধ্যেই ছিল, ছেলেকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে। হয়তো মালবিকাই বলেছিলেন। এত বড় ছেলেকে নিয়ে তিনি নতুন সংসার বানাতে চাননি। কেনই বা চাইবেন?

সেই থেকে বিতান কখনও ভাড়া বাড়ি, কখনও মেসে থেকেছে। কিছু দিনের জন্য একটা প্রেসে সুপারভাইজারের কাজ করেছিল। তখন প্রেসেই রাত কাটিয়েছে। সকালে সেখানে স্নান-টান সেরে বেরিয়ে পড়ত। সারা দিন কলকাতা শহরে চক্কর দিয়ে আবার সন্ধের পর ঢুকে পড়ত। চক্কর কাটার জন্য কলকাতার মতো শহর ভূভারতে নেই। যে কোনও পথেই কত ঘটনা, কত গল্প!

boierpathshala.blogspot.com

বিতান এখন আছে বাইপাসের ধারে, বন্ধুর ফ্ল্যাটে। আট তলার ওপর দুর্দান্ত ফ্ল্যাট। জানলা খুললেই চকচকে বাইপাস দু'দিকে হাত বাড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে। হুহু করে গাড়ি, বাস ছুটছে। রাতে দূরের ফ্লাইওভারে মালার মতো জ্বলে ওঠে আলো। মনে হয়, শহরটা ভাসছে। বিতানের বুঝতে পারে, এখানে না এলে কলকাতা শহরের একটা রূপ দেখা বাকি থেকে যেত। চকচকে, ব্যস্ত একটা নতুন কলকাতা। সে মনে মনে অনুভবকে ধন্যবাদ দেয়। মুখে দিতে গেলে যে গালাগালি শুনতে হবে! দু'এক বার বলতে গিয়ে শুনতে হয়েছে।

বিতানের এই ফ্ল্যাট পাওয়ার ঘটনাটাও একটা গল্পের মতো।

আসানসোলের ছেলে অনুভব বিতানের বন্ধু। স্কুল কলেজ দু'জায়গাতেই একসঙ্গে পড়েছে। একসঙ্গে স্কুল বোর্ডিংয়ে থেকেছে। কলেজে পড়ার সময় অনুভব কলকাতায় থাকতে গিয়ে সমস্যায় পড়ল। টালিগঞ্জে যে দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে থাকত, তারা এক দিন দুম করে প্রোমোটারের কাছে বাড়িটা বেচে দিল। নিজেরা মাথা গোঁজার ঠাঁই করলেও, সেখানে তো বাইরের লোককে নিয়ে যাওয়া যায় না। ফলে রাতারাতি জলে পড়ল অনুভব। এ দিকে কলেজে সেশন শুরু হয়ে গিয়েছে। কোনও হস্টেলে আর সিট ফাঁকা নেই। কলকাতা শহর দেখতেই এমন, বাড়ি আর বাড়ি। বাইরে থেকে পড়তে আসা ছাত্রছাত্রীদের থাকার জায়গা পাওয়া খুব সহজ নয়। পিজি থাকতে হলে অনেক খরচ। ছাত্রদের পক্ষে সেই টাকাপয়সা জোগাড় করা কঠিন। অনুভব হন্যে হয়ে কম পয়সায় থাকার জায়গা খুঁজতে লাগল। বিতানের হস্টেলেও গেল। সিট নেই। বিতান বলল, "দাঁড়া, সুপারের পায়ে পড়ে যাই।" সত্যি সত্যি সুপারের প্রায় হাতে পায়ে ধরে অনুভবকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে রাখল বিতান। তবে আর একটা খাট ঢোকাতে পারল না। সুপার বললেন, "নিয়ম

boierpathshala.blogspot.com

ভেঙে মানুষ পর্যন্ত অ্যালাও করেছি। খাট অ্যালাও করতে পারব না। মানবিকতা দেখাতে পারব, খাটবিকতা দেখাতে পারব না। প্রিসিডেন্স হয়ে যাবে। এর পর যে পারবে সে-ই বন্ধুর জন্য ঘরে খাট ঢোকাবে।”

কী আর করা যাবে? তিন মাস খাটে আর মেঝেতে ভাগ করে শুয়েছে দু’জনে। সেই সময় অনুভব বিতানের বাড়ির কথা কিছু কিছু জেনেছিল। তিন মাস পর অনুভবের বাবা ছেলের এই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ছেলের জন্য কসবার কাছে একটা ছোট ফ্ল্যাট কিনে ফেললেন। অনুভব সেখানে উঠে গেল। বিতানকেও টানাহেঁচড়া করেছিল। হস্টেল ছেড়ে ওর সঙ্গে গিয়ে থাকতে হবে। বিতান হেসে বলেছিল, “এখন নয়। এখন তো থাকার একটা জায়গা আছে। ভবিষ্যতে মনে হচ্ছে থাকবে না, সেই সময়ের জন্য তুলে রাখ। মনে থাকবে?”

অনুভব বলেছিল, “না। ভুলে যাব।”

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ১৭

বিতানের আশঙ্কার কারণ ছিল। তত দিনে বিতান তার বাবা পরিমল মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে কিছু কিছু খবর কানাঘুষোয় শুনতে পাচ্ছে। এক মহিলা নাকি তাদের কাঁকুড়গাছির সরকারি ফ্ল্যাটে নিয়মিত আসাযাওয়া করে। সঙ্গে একটি ছোট মেয়েও আসে। কখনও শোনা যাচ্ছে, মহিলার স্বামী মারা গিয়েছে, কখনও শোনা যাচ্ছে, ডিভোর্সের মামলা চলছে। বিতান এই সব তথ্যের সত্যমিথ্যে নিয়ে চিন্তিত ছিল না। তার জানার ইচ্ছেও ছিল না। সে শুধু বুঝতে পারছিল, তার নিজের বাড়িতে যাওয়ার দিন শেষ। এই মহিলা যে কোনও দিন বলে বসবে, "বাসে অটোয় যাতায়াত আর পোষাচ্ছে না। এখানেই পাকাপাকি থাকব।"

তা-ই ঘটল। বাবা এক দিন ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানাল, "বিয়ে করেছি। ফ্ল্যাটটা তো ছোট, বুঝতেই পারছিস। ওর আবার একটা স্কুলে-পড়া মেয়ে আছে... একটা বড় ফ্ল্যাট খুঁজছি... তত দিন..."

boierpathshala.blogspot.com

বিতান বলেছিল, “তুমি চিন্তা কোরো না বাবা। আমি ঠিক থাকার জায়গা পেয়ে যাব।”

কলেজ শেষ হল, হস্টেলে থাকাও চুকল। এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে থাকার প্রক্রিয়া চলতে লাগল। এরই মাঝখানে এক দিন অনুভবের ফোন। এখুনি তার সেক্টর ফাইভের অফিসে দেখা করতে হবে। বিতান গেলে অনুভব বলল, “নতুন কাজ নিয়ে পুণেতে চললাম। শোন, আমি কসবার ফ্ল্যাট বেচে বাইপাসের ওপর একটা ফ্ল্যাট নিয়েছি। আটতলায় চমৎকার ফ্ল্যাট। খরচ করে সাজিয়েছি। তুই তো এখন হোমলেস। ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াস। আমি ঠিক করেছি, তুই আমার ওই ফ্ল্যাটের পাহারাদার হবি। অন্য কারও হাতে ছাড়ব না, নষ্ট করে দেবে।”

“তালা বন্ধ করে রাখ।”

অনুভব বলল, “পোড়ো বাড়ির মতো পোড়ো ফ্ল্যাট হয়ে যাবে।”

“আত্মীয় কাউকে এসে থাকতে বল।”

“দখল হয়ে যাবে। বাজে না বকে বল, কত স্যালারি নিবি?”

বিতান বলল, “যদি রাজি না হই?”

অনুভব বলল, “তোর ঘাড় রাজি হবে।”

তার পর থেকে বিতানের ঠিকানা বাইপাসের আট তলায়। সত্যিই দারুণ ফ্ল্যাট। শুধু ফ্ল্যাট নয়, ফ্ল্যাটের সঙ্গে ফ্রিজ, টিভি, এসি, গিজার এমনকী নিজের ক্যামেরাটাও রেখে গিয়েছে অনুভব। বলে গিয়েছে, “প্রতিটা জিনিস ব্যবহার করবি শালা। এসে যদি দেখি কোনও কিছুতে জং ধরেছে, তোমার কপালে দুঃখ আছে।”

boierpathshala.blogspot.com

বিতান বলল, “খেপেছিস? অত ইলেকট্রিক বিল দেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে না কি?”

অনুভব বলেছে, “তোমাকে কে বিল দিতে বলেছে হারামজাদা? ইলেকট্রিসিটি, মেনটেনেন্স, কেব্‌ল, সব ইসিএস-এ পে করব। তুই বেটা ভিখিরি, ভিখিরির মতো সব ফ্রিতে ভোগ করবি।”

ঊর্বী সরে দাঁড়াতে বিতান ভিতরে ঢুকল। যতই এই বাড়িতে বড় হোক, বছরের পর বছর কাটাক, যতই বাল্য আর কৈশোরের অজস্র স্মৃতি থাক, এখানে বিতানের আসতে ইচ্ছে করে না। অনেক বছর তো আসেওনি। পরিমল মুখোপাধ্যায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে মালবিকা খাতা ঘেঁটে নম্বর জোগাড় করে খবর দিলেন।

“তোমাকে তোমার বাবা দেখতে চাইছেন। পারলে এক বার হাসপাতালে এস। যে কোনও সময় একটা অঘটন কিছু ঘটে যেতে পারে।”

‘অঘটন’ ঘটল না। তবে প্যারালিসিসে ভদ্রলোকের ডান দিকটা পড়ে গেল। এ বার ছেলেকে বাড়িতে ডেকে পাঠালেন। বিতান গিয়ে দেখল, মানুষটা কেমন যেন মিইয়ে গিয়েছে। সেই দাপট নেই, অসহায়। বিতানকে কেমন যেন আঁকড়ে ধরছেন। এখন তিন-চার মাস অন্তর মাঝে মাঝেই মোবাইলে ফোন করেন, “এক বার আসিস।”

বিতান বলে, “কোনও দরকার আছে? ফোনে বললে হয় না?”

পরিমল মুখোপাধ্যায় বলেন, “হয়তো হয়, তার পরেও আসিস এক বার সময় পেলে। শরীরটা ভাল ঠেকছে না। এলে সকাল এগারোটার পর আসবি। ওই

boierpathshala.blogspot.com

সময়টা ঊর্বীর মা অফিসে যায়। ঊর্বীও কলেজে বেরিয়ে যায়, বাড়িতে থাকে না।”

প্রথম দিকে বিছানায় শোয়া অবস্থাতেই ছেলের সঙ্গে কথা বলতেন। এখন ফিজিয়োথেরাপি করে অবস্থার খানিকটা উন্নতি হয়েছে। লাঠি নিয়ে পা টেনে টেনে বসার জায়গায় আসেন। কথা কিছুই বলেন না। চুপ করে থাকেন। বিতান অধৈর্য হয়ে বলে, “বাবা, কিছু বলবে?”

“না তেমন কিছু নয়। চাকরিবাকরি পেলি?”

বিতান বলে, “ছোটখাটো কাজ করি।”

এত বড় ছেলে ছোটখাটো কাজ করছে শুনে কোনও বাবারই খুশি হওয়ার কথা নয়, তার পরেও পরিমল মুখোপাধ্যায় বলেন, “গুড। ছোট থেকে বড় হওয়াই ভাল। তোর মা’ও এক সময় আমাকে এই কথা বলত। কাজের জায়গায় বেশি লাফালাফি কোরো না।”

আবার কিছু ক্ষণের জন্য মানুষটা চুপ করে যায়। এক সময়ে বিতান বলে, “উঠলাম।”

পরিমল মুখোপাধ্যায় বলেন, “অবশ্যই উঠবি। ইয়ং ছেলে ঘরে বসে থাকা মানে সময় নষ্ট। তারা যত বাইরে থাকবে দুটো পয়সা উপার্জন করতে পারবে। তোর মা বলত, ঘরে বসা পুরুষমানুষের ভাগ্যও ঘরে বসা হয়। অ্যাই শোন, তোর কাছে শ’তিনেক টাকা হবে? আপাতত দুশো হলেও চলবে। অসুখের পর থেকে ঊর্বীর মায়ের কাছে এখন টাকাপয়সা, এটিএম কার্ড, সব থাকে। সব সময়ে চাইতে পারি না। চিন্তা করিস না, নেক্সট দিন যখন আসবি ফেরত পাবি।”

boierpathshala.blogspot.com

বিতান কখনও দুশো, কখনও তিনশো টাকা দিয়ে উঠে আসে। টাকা ফেরতের কোনও প্রশ্ন ওঠে না। বিতান তার বাবাকে এই টাকা কেন দেয় সে নিজেও ঠিক জানে না। আবার হয়তো জানেও। মানুষটার চাওয়ার ভঙ্গি কিছু একটা দাবির মতো। যেন তার অধিকার আছে। ভাবটা এমন, যেন তিনি তার একমাত্র সন্তানের সঙ্গে এমন কোনও অন্যায় কখনও করেননি যা করা যায় না। যদি 'বাবা–বাছা' বা 'সেই সময় ওইটুকু বয়েসে তোকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে বড় অন্যায় করে ফেলেছিলাম' ধরনের কোনও আচরণ দেখাতেন, তা হলে হয়তো এক-দু'বারের পর অনায়াসে সরে আসতে পারত বিতান। তা হয়নি।

তবে আজ বাবা নয়, ঊর্বির মা তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। মালবিকা মুখোপাধ্যায়। বিতান ভেবেছিল আসবে না। তার পরেও এসেছে। মহিলা বলেছিলেন, "অবশ্যই আসবে। তোমার বাবার ব্যাপারে আমি একটা ফাইনাল সেটলমেন্টে যেতে চাই।" বাবার সঙ্গে এই মহিলার ফাইনাল সেটলমেন্ট কী হবে, বিতানের জানার আগ্রহ নেই। সে কাঁকুড়গাছির এই ফ্ল্যাটে আসা একেবারের মতো শেষ করতে চায়।

ঘরে ঢুকে বিতান বলল, "তোমার মা কোথায়?"

ঊর্বী বলল, "ডাক্তারের কাছে গেছে। আপনি এলে বসতে বলেছে। চা খাবেন?"

বিতান বলল, "না।"

ঊর্বী ঘাড় কাত করে বলল, "না বলে ভাল করলেন। হ্যাঁ বললে বিরক্ত হতাম। আমার চা করতে একদম ভাল লাগে না। আপনার বাবাকে ডেকে দিতে হবে?"

boierpathshala.blogspot.com

বিতান বলল, “না। আমি ওর কাছে আসিনি।”

ঊর্বী বলল, “এ বারও না বলায় খুশি হলাম।” তার পর মুচকি হেসে বলল, “আপনার পিতা এখন নিদ্রায় মগ্ন। দিনের বেশির ভাগ সময়টাতেই উনি আজকাল নিদ্রার মধ্যে থাকেন। কেউ ঘুম ভাঙালে বিশ্রী ভাষায় গালমন্দ করেন। আমাকে সবচেয়ে বেশি করেন। এক দিন আমাকে বললেন, অ্যাই নচ্ছার মেয়ে, আমাকে ঘুম থেকে তুললি কেন? থাবড়া দিয়ে তোর দঁাত ফেলে দেব। আমি বললাম, আপনার দঁাতের অবস্থাই তো খুব খারাপ। আপনি কী করে অন্যের দঁাত ফেলবেন? উনি তেড়েমেড়ে বললেন, চুপ কর নষ্ট মেয়ে। তোর মা নষ্ট, তুইও নষ্ট। আমি হেসে বললাম, আপনি নষ্ট মেয়েকে বিয়ে করতে গেলেন কেন? তখন আর এক চোট গাল দিলেন। অতএব আমি তাঁকে নিদ্রা থেকে তুলে গালাগালি শুনতে রাজি নই। আপনি যদি চান ভিতরে গিয়ে কথা বলতে পারেন।”

বিতানের এ সব শুনতে খুব খারাপ লাগল। বাবার কি মাথাটাও খারাপ হয়ে যাচ্ছে? সে বিড়বিড় করে বলল, “না, কথা বলতে চাই না।”

ঊর্বী হেসে বলল, “গুড। তা হলে বসে পড়ুন।”

সোফায় বসল বিতান। বেতের এই সোফা তার ছেলেবেলার। একটু মেরামত হয়েছে, গদি, কভার বদলেছে। এক সময়ে এখানে সে কত বসেছে! কত দাপাদাপি করেছে! তার জন্য বকাবকিও শুনতে হয়েছে। তার পরেও এখন এ বাড়ির সবই বিতানের অচেনা ঠেকে। চেনা–অচেনা লাগাটা আসলে মনের উপর নির্ভর করে। মস্তিস্ক অনেক সময় চেনা অংশগুলোকে মুছে অচেনা করে দেওয়ার খেলা খেলতে ভালবাসে।

boierpathshala.blogspot.com

ঊর্বী বই হাতে উল্টো দিকের সোফায় ধপ করে বসে পড়ল। সে আজ কথা বলার মুডে আছে।

বিতান বলল, "তুমি পড়তে যাও।"

ঊর্বী পায়ের উপর পা তুলে গুছিয়ে বসল। তার পর মুখ ভেটকে বলল, "সে তো যেতেই হবে। জানেন, আমার লেখাপড়া করতে একদম ভাল লাগে না। কিন্তু পড়তে হবে। একটাই বাঁচোয়া, কলেজের এগজাম দু'দিন পিছিয়েছে। নইলে ডাঁহা ফেল করতাম। আমাদের কলেজে সে দিন রাত পর্যন্ত ঘেরাও হয়েছিল। টিচার-ইন-চার্জ, টিচার সবাই। কাউকে ছাড়া হয়নি। ভাগ্যিস হয়েছিল! আমিও ঘেরাওয়ে ছিলাম। সেই কারণে এগজাম পিছিয়েছে।"

কলেজ ঘেরাও শুনে বিতান ভুরু কোঁচকাল। কলেজের নাম জিজ্ঞেস করবে? থাক, কী হবে জেনে? ঊর্বী হাসছে। বলল, "আপনাকে একটা কথা বললে মজা পাবেন।"

বিতান বলল, "কী কথা?"

ঊর্বী ঝুঁকে পড়ে গলা নামিয়ে বলল, "জানেন, আমি নানান রকম কায়দায় টুকতে পারি। কেউ ধরতে পারবে না। ধরা পড়ার সময় পট করে এমন সমস্ত জায়গায় কাগজ লুকিয়ে ফেলি যে কেউ বার করতে পারবে না। বার করতে গেলেই কেস খেয়ে যাবে।" কথাটা বলে হিহি আওয়াজ করে হাসল। তার পর বলল, "এখন অবশ্য টেকনোলজির হেল্প নিই। হোয়াটসঅ্যাপে মেটিরিয়াল লিখে নিয়ে যাই। ওড়নার তলায় মোবাইল রেখে টুকি। টেকনিকটা ভাল না?"

একটা অন্যায় কাজের কথা যে কেউ এমন গর্বের সঙ্গে বলতে পারে বিতানের জানা ছিল না। সে চুপ করে রইল। ঊর্বী পা নামিয়ে ঠোঁট উল্টে বলল, "লাস্ট

boierpathshala.blogspot.com

দিন ধরা পড়ে গেলাম। আহিরী রায় বলে আমাদের এক জন সুন্দরী ম্যাডাম আছেন। শুধু দেখতে সুন্দর নয়, খুব বুদ্ধি। পাশে এসে আমাকে বললেন, ওড়নার নীচ থেকে মোবাইলটা বার করে দিয়ে দাও। আমি তো পুরো বোমকে গেছি। যাহ্ শালা, বুঝল কী করে!”

বিতান চমকে উঠল। ঊর্বী আহিরীদের কলেজে পড়ে? কই, সে তো জানত না! অবশ্য জানার কথাও নয়। ঊর্বীর সঙ্গে লেখাপড়া নিয়ে কোনও দিন আলোচনা হয়নি।

বিতানের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, “তার পর?”

ঊর্বী চোখ বড় বড় করে বলল, “কী আর হবে? আমি তো ভাবলাম খাতা ক্যানসেল করে দেবেন, নইলে বলবেন, গেট আউট। বাইরে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকো। ম্যাডাম যেমন বন্ধুর মতো ব্যবহার করেন, তেমনই আবার খুব রাগীও। আমি তো ভেবলে গেছি। আজ কেলো হল।”

বিতান স্থির চোখে তাকিয়ে বলল, “উনি কী করলেন?”

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ১৮

বিতান স্থির চোখে তাকিয়ে বলল, “উনি কী করলেন?” ঊর্বী কৌতুকের হাসি হেসে বলল, “ম্যাডাম সে সব কিছু করলেন না। শুধু আমার মোবাইলটা কেড়ে নিয়ে বললেন, দু’দিন পরে পাবে। বুঝুন কাণ্ড। মোবাইল নেই মানে আমার ফেসবুক চ্যাট, গান শোনা, মুভি দেখা— সব ভোগে।” কথা থামিয়ে হাসতে লাগল ঊর্বী।

এই বাড়িতে বসে কোনও কিছুতে মজা পাওয়া অসম্ভব। তার পরেও বিতান মজা পাচ্ছে। আহিরীর গল্প শুনছে বলেই পাচ্ছে।

“তোমাদের ম্যাডাম ফোন নিয়ে নিল?”

ঊর্বী চোখ বড় করে বলল, “অবশ্যই নিয়ে নিল। কিন্তু এগেন থ্যাঙ্কস টু ঘেরাও। ঘেরাও চলতে চলতে রাত হয়ে গেল। আমিও গিয়ে ম্যাডামকে পাকড়াও করলাম। বললাম, রাত হয়ে গেছে, বাড়িতে খবর দিতে পারছি না। মোবাইলটা ফেরত দিন প্লিজ। উনি দিয়ে দিলেন। ম্যাডাম খুব সুইট না? ফোন কেড়ে নেওয়ার জন্য ম্যাডামের ওপর যতটা ফায়ার হয়ে গিয়েছিলাম, সব ওয়াটার হয়ে গেল।”

boierpathshala.blogspot.com

কথা শেষ করে ঊর্বী ঠোঁট সরু করে কৌতুকভরা মুখে বিতানের দিকে তাকিয়ে রইল। বিতান অস্বস্তিতে মুখ সরিয়ে বলল, "তোমার মা'কে একটা ফোন করে দেখো তো কত দেরি হবে। আমার তাড়া আছে।"

ঊর্বী এই কথায় পাত্তা না দিয়ে বলল, "ও, আর একটা কথা। আপনাকে বলব ভেবে রেখেছিলাম। কয়েক দিন আগে, গড়িয়াহাটে আপনার সঙ্গে মুখোমুখি হয়েও না চেনার ভান করেছিলাম। এর জন্য স্যরি। বাট আমার কিছু করার ছিল না।"

ঊর্বী কোন দিনের কথা বলছে বিতান মনে করতে পারল না। বলল, "আমার খেয়াল নেই।"

ঊর্বী বলল, "আপনার খেয়াল না থাকতে পারে, আমার খেয়াল আছে। সে দিন কেন মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম জানেন?"

বিতানের আর ভাল লাগছে না। সে বলল, "আমি এ সব জানতে চাই না। তুমি মা'কে ফোন করো, নইলে আমি চলে যাব।"

ঊর্বী বলল, "সে আপনার ব্যাপার। ইচ্ছে হলে চলে যাবেন। কথাটা শুনে যান। সে দিন সঙ্গে বন্ধুরা ছিল। আপনার সঙ্গে কথা বললে আপনার পরিচয় বলতে হত। কী বলতাম? দাদা? ওরা বলত, কেমন দাদা? মাসতুতো না মামাতো? তখন পড়তাম বিপদে। নিজের দাদা বললে তো আকাশ থেকে পড়ত। বিশ্বাসই করত না। বলত, হাউ ফানি! তোর যে দাদা আছে বলিসনি তো কখনও! তোর থেকে এত বড়! এ সব কথার মধ্যে যাওয়ার থেকে না চেনাই ভাল। তাই না?"

বিতান ঠিক করে ফেলল এ বার সে উঠে পড়বে। এর মধ্যেই একটা ঘটনা ঘটল।

boierpathshala.blogspot.com

ঊর্বী দ্রুত হাতে মোবাইল ঘঁাটতে ঘঁাটতে বলল, “এই যে, এই যে দেখুন আহিরী ম্যাডামের ছবি। দেখুন কী স্মার্ট দেখতে! আমি অবশ্য দূর থেকে তুলেছি। মাস তিনেক আগের ফোটো।”

ঊর্বী ঘুরে এসে এক রকম জোর করে বিতানের সোফার পিছনে এসে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে মোবাইলটা বিতানের চোখের সামনে ধরল। তার পর স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে দ্রুত ফোটোটাকে বড় করে ফেলল। বিতান স্তম্ভিত হয়ে ছবিটা দেখল।

কলেজের গেটের সামনে বিতান আহিরীর গাড়ি থেকে নামছে। জানলা থেকে ঝুঁকে আহিরী হাসিমুখে হাত নাড়ছে। গাড়ির মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, সে এ বার কলেজে ঢুকবে।

মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল বিতানের। ঊর্বী তত ক্ষণে উল্টো দিকে চলে গেছে। হাসতে হাসতে বলল, “এই ছবি সে দিন ম্যাডাম যদি মোবাইল ঘেঁটে দেখে ফেলত? বিরাট কেলো হত।”

বিতান একটু চুপ করে রইল। গম্ভীর গলায় বলল, “ঊর্বী, তোমার ওই ম্যাডামের সঙ্গে আমার খানিকটা আলাপ আছে। উনি সে দিন আমাকে তার গাড়িতে লিফ্ট দিয়েছিলেন। এই ভাবে লুকিয়ে ওর ছবি তোলাটা তোমার উচিত হয়নি। এটা অন্যায়।”

ঊর্বী চোখ বড় করে বলল, “আমি তো ওর ফোটো তুলিনি! সম্পর্কে আমার আত্মীয় হয় এমন এক জনের ফোটো তুলেছি। যেই দেখতে পেয়েছি, মোবাইল তুলে খচ।” হাত তুলে ফোটো তোলার ভঙ্গি দেখাল ঊর্বী। তার পর বলল, “ভেবেছিলাম এক দিন ওঁকে ফোটোটা দেখিয়ে চমকে দেব। এটা অন্যায় হবে কেন?”

boierpathshala.blogspot.com

বিতান কী বলবে বুঝতে পারছে না। নিজের উপর রাগ হচ্ছে। প্রথম দিন বাদ দিলে গত এক বছরে সব মিলিয়ে সে দু'দিন আহিরীর কলেজে গিয়েছে। তাও কলেজের ভিতরে নয়, গেটের কাছে। এখন মনে হচ্ছে, সেটাও ঠিক হয়নি।

বিতান বলল, "তুমি তো শুধু আমার ফোটো তোলোনি, তোমার টিচারের ফোটোও তুলেছ।"

ঊর্বী গালের ভিতর ঠোঁট ঘুরিয়ে বলল, "আর এক দিনের ফোটোও আছে। সেটা গড়িয়াহাটে... এই যে... আপনি আর ম্যাডাম রেস্টুরেন্টে ঢুকছেন।"

এ বার দূর থেকেই মোবাইল দেখাল ঊর্বী। হাতটা শুধু বাড়িয়ে দিল। বিতান ছবিটা স্পষ্ট দেখতে পেল না। ঊর্বী বলল, "ওই দিনের কথাই তো বলছিলাম। আপনাকে দেখেও না দেখার ভান করে আড়ালে সরে গিয়েছিলাম। তার আগে কিন্তু ফোটো তোলা হয়ে গেছে। আমার মোবাইলে পিক্সেল হেভি। ছবি তুলতে যে আমার কী ভাল লাগে!"

কথা শেষ করে ঊর্বী আবার হেসে উঠল। বিতানের মনে হল, তার মাথা কাজ করছে না। এই মেয়ে কি আহিরীকে কোনও ভাবে ব্ল্যাকমেল করার কথা ভাবছে? বিতানের মতো এক জন 'কিছু নয়' ছেলের সঙ্গে সম্পর্কের কথা জানাজানি হয়ে পড়লে সেটা আহিরীর জন্য যথেষ্ট লজ্জার হবে।

ডোরবেল বেজে উঠল।

boierpathshala.blogspot.com

৯

চা তো এসেছেই, সঙ্গে বিস্কুটও এসেছে। তার পরেও মালবিকা বললেন, "কিছু খাবে? একটা ওমলেট করে দিই?"

বিতান বলল, “না। আমি খেয়ে এসেছি।”

বিতান শুধু চা নিল। প্রথম যখন এসেছিল, তখন প্রতিজ্ঞা করেছিল, এ বাড়িতে জলস্পর্শ করবে না। পরে মনে হয়েছিল, এ সব ছেলেমানুষি। কার উপর রাগ-অভিমান? বাবার উপর? উনি তো অন্যায় কিছু করেননি। ঠিক করেছেন। বিয়ে না করলে বাকি জীবনটা একা থাকতে হত। তা হলে অভিমান কিসের? জীবন তৈরির টালমাটাল সময়ে তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল বলে? হয়তো তাই। যে সময়ে বাবা-মা ছেলেমেয়ের পাশে থাকে, সেই সময় পরিমল মুখোপাধ্যায় তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। এক বারও তার কথা ভাবেননি। এ নিয়ে অভিমান তো তার ছিলই। কিন্তু অভিমানও একটা বয়স পর্যন্ত বহন করা যায়, তার পর ভুলে যেতে হয়। বিতান এ বাড়ি সম্পর্কে এখন নিস্পৃহ। ঊর্বীর মোবাইলের ছবিগুলো তাকে নতুন করে চিন্তায় ফেলেছে শুধু।

মালবিকার গলা আজ নরম। বললেন, “তোমার বাবার অবস্থা তো দেখছ, একেবারে শুয়ে পড়েছে।”

বিতান বলল, “শরীর কি আরও খারাপ হয়েছে?”

মালবিকা বললেন, “সে আর নতুন কী? রোজই একটু একটু করে বেশি খারাপ হচ্ছে। আজকাল তো বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়েই থাকেন। তবে সমস্যা সেটা নয়। সমস্যা অন্য। সে জন্যই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আমি বুঝতে পারছি, তোমার বাবা আর আমাদের সঙ্গে থাকতে চাইছেন না। চোখের সামনে আমাদের দেখলে বিরক্ত হচ্ছেন।”

বিতান অবাক হয়ে বলল, “মানে!”

boierpathshala.blogspot.com

মালবিকার বয়স পঞ্চাশ হতে এখনও বছর চার দেরি আছে। আগে বলা হত মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি। সেই ধারণা বহু দিন খারিজ হয়ে গিয়েছে। এখন পঞ্চাশেও মহিলারা নিজেদের শরীর এবং মনে ফিটফাট থাকতে পারেন। মেয়েরা যত কাজের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, বয়সের ভার তত হালকা করতে পারছে। মালবিকাকে কিন্তু বেশ বুড়োটে লাগছে। চাকরি আর সংসারের ক্লান্তি চোখেমুখে।

মালবিকা বিরক্ত গলায় বললেন, "মানে আমি কী করে বলব বিতান? তোমার বাবা বলতে পারবে। হয়তো বড় অসুখে তার বোধোদয় হয়েছে। এখন ওঁর মনে হচ্ছে, যা করেছিলেন সেটা ঠিক হয়নি।"

বিতান চুপ করে রইল। এ রকম একটা কথা বলার জন্য মহিলা তাকে ডেকে পাঠাবেন, সে ভাবতে পারেনি। এর জবাবই বা সে কী দেবে?

মালবিকা বললেন, "আমার মেয়েকে গোড়া থেকেই উনি সহ্য করতে পারেন না। শুধু আমার জন্য মেনে নিয়েছিলেন। এখন দেখলেই তেড়ে উঠছেন। খারাপ কথা বলছেন। আমার মেয়ে কেন এ সব টলারেট করবে? আমারও কোনও কিছু এখন তাঁর পছন্দ হয় না। আমিও মেজাজ হারাচ্ছি। সারা দিন অফিস, ঘরের কাজ করতে হয়। আমি কেন ওঁর গালমন্দ শুনব? এমন তো নয় যে আমি তাঁর খাই-পরি, তাঁর বাড়িতে থাকি। এই ফ্ল্যাটটাও তো এখন ওঁর নয়। আমি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে নাম ট্রান্সফার করেছি। সরকারি খাতায় এই ফ্ল্যাট এখন আমার নামে দেখানো আছে।"

বিতান মহিলাকে মনে মনে তারিফ করল। খুব উদ্যোগী তো!

মালবিকা একটু চুপ করে থেকে বললেন, "তোমার বাবা বোধহয় ভুলে গিয়েছিল আমি ঘা-খাওয়া মানুষ। আগের বার মেয়ের হাত ধরে পথে পথে

boierpathshala.blogspot.com

ঘুরতে হয়েছে। এ বার আমি গুছিয়ে নিয়েছি।” একটু থেমে দম নিয়ে ফের বলতে শুরু করলেন, “আমি তার সেবাও করব, আবার গালও শুনব, কেন? কথায় কথায় তিনি তোমার মায়ের সঙ্গে আমার তুলনা করছেন। তুমি কত ভাল ছেলে, আমার মেয়ে কত বজ্জাত তার ফিরিস্তি দিচ্ছেন। এত দিন পরে এটা বুঝতে পারলেন!”

বিতান নিচু গলায় বলল, “আমাকে এ সব বলছেন কেন?”

মালবিকা বিতানের মুখের দিকে এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, “তুমি তোমার বাবাকে নিয়ে যাও বিতান।”

বিতান অবাক হয়ে বলল, “আমি নিয়ে যাব? কী বলছেন!”

মালবিকা চোখ কুঁচকে বললেন, “ঠিকই বলছি। আমি অনেক দিন দেখলাম, এ বার তুমি দেখো।”

বিতানের মনে হল, মহিলা তার সঙ্গে রসিকতা করছেন। সে জোর করে হাসার চেষ্টা করল। বলল, “আমি কে?”

মালবিকা থমথমে গলায় বললেন, “তুমি ওর ছেলে। ছেলে নও? তোমার কোনও দায়িত্ব নেই?”

বিতানের মনে হল এখনই উঠে দাঁড়ায়। দরজা খুলে ছুটে পালায়। সে বলল, “এত বছর পরে হঠাৎ ছেলের দায়িত্ব পালন করার প্রশ্ন কোথা থেকে আসছে? উনি তো আমাকে বলে কখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেননি!”

মালবিকা বিদ্রুপের হাসি হেসে বললেন, “এত দিন পরে কোথায়? তুমি তো অনেক দিন থেকেই দায়িত্ব পালন করছ। বাবা ডাকলেই ছুটে আসছ, আমাকে

boierpathshala.blogspot.com

লুকিয়ে টাকা দিয়ে যাচ্ছ, বাকি কথা আমি ঠিক জানি না। নিশ্চয়ই আরও কিছু আছে।”

বিতান চুপ করে রইল। বাকি কিছু না থাকলেও, মাঝে মাঝে আসা, টাকা দেওয়া, এগুলো সত্যি।

মালবিকা আবার স্বর বদল করলেন। নরম ভাবে বললেন, “দেখো বিতান, তুমি বড়, তোমাকে বলতে এখন কোনও অসুবিধে নেই। মানুষটাকে আমি ভালবেসেই বিয়ে করেছিলাম। এমন কোনও বড় পদে তিনি চাকরি করতেন না, এই দু’কামরার ফ্ল্যাটটাও আহামরি কিছু নয়। সেই সময়ে আমার একটা আশ্রয়ের দরকার ছিল ঠিকই, কিন্তু চাইলে ওঁর থেকে সফল কোনও পুরুষমানুষকেও... তোমার বাবাকে আমি সত্যিই ভালবেসেছিলাম। এখনও বাসি। বাসি বলেই জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁকে কষ্ট দিতে চাইছি না। আমার বিশ্বাস, তিনি এই বিয়ের জন্য এখন অনুশোচনা করেন। তাঁকে মুক্তি দেওয়া উচিত।’

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ১৯

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

বিতান অস্ফুটে বলল, “উনি আমার কাছে গেলে শান্তি পাবেন এমন আপনি ভাবছেন কেন?” মালবিকা হাসলেন, “তুমিও জানো পাবেন।”

বিতান বলল, “এ সব আপনি জোর করে বলছেন। বাবা-ই বা আমার সঙ্গে থাকতে কেন রাজি হবেন?”

মালবিকা বললেন, “সে তুমি ওঁর সঙ্গে কথা বললেই জানতে পারবে। আমাকে বারবার বলছেন। কিছু হলেই বলেন, ছেলের কাছে গিয়ে থাকব। আমি ওঁর মন বুঝেই বলছি। দেখো বিতান, তোমার টাকাপয়সার সমস্যা হবে না। তোমার বাবার পেনশনের টাকাপয়সায় আমার কোনও দাবি থাকবে না। ওই টাকায় ওঁর খরচ চলে যাবে। কিছু টাকা বেঁচেও যেতে পারে।”

বিতান প্রায় আর্তনাদ করে বলল, “এ সব আপনি কী বলছেন? বাবাকে আমি কোথায় রাখব? আমার নিজেরই তো থাকার ঠিক নেই।”

boierpathshala.blogspot.com

মালবিকা চোখ সরু করে বললেন, “গড়িয়ায় যে দারুণ ফ্ল্যাটে তুমি থাকো, সেখানে রাখবে! বাবাকে তো তুমিই ফ্ল্যাটের কথা বলেছ। বলোনি?”

বিতান বলল, “ওই ফ্ল্যাট তো আমার নয়, আমার বন্ধুর। ও আমাকে থাকতে দিয়েছে।”

মালবিকা বললেন, “তোমাকে যখন দিয়েছে, তোমার বাবাকেও নিশ্চয়ই দেবে। যে দিন দেবে না, সে দিন কোনও অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা করে নেওয়ার মতো বয়স তোমার হয়েছে।”

কথা শেষ করে উঠে পড়লেন মালবিকা। বিতানও উঠে দাঁড়াল। সে এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। সত্যি বাবা তার কাছে চলে যেতে চায়?

মালবিকা বললেন, “আর কথা বাড়াব না। তোমার বাবা এ বার ঘুম থেকে উঠবেন। আজ শনিবার, অফিস ছুটি বলেই তোমাকে আসতে বলেছিলাম। দেখো বিতান, তুমি আমার কথা না-ও শুনতে পারো। কিন্তু মনে রেখো, আমি ওঁকে আর এখানে রাখব না। দোষটা আমার নয়, দোষটা ওঁর। উনি আমাকে এক সময় সহ্য করতে পারতেন, এখন আর পারছেন না। কেন পারছেন না? তুমি সন্তান, বলা উচিত নয়, তাই বলছি না। আমি অন্য কোনও ব্যবস্থা নেব। দ্যাট উইল বি হার্ড। অনেক দূরে, অসুস্থ অক্ষমদের কোনও আশ্রমে রেখে আসব ওঁকে। হাজার বললেও সে জায়গার ঠিকানা তুমি পাবে না। সময় নাও, সময় নিয়ে ভাবো। এক দিন আমি না থাকলে এসে ওঁর সঙ্গে কথা বলো। একটা ইনফর্মেশন দিই। মেবি সেন্টিমেন্টাল অ্যান্ড ফুলিশ, তাও তোমার জানা দরকার। তোমার বাবার মাথার বালিশের নীচ থেকে আই গট ইওর মাদার্স ফোটোগ্রাফ। বিয়ের ছবি। এটা আমার জন্য যথেষ্ট অপমানের নয় কি? আমি ওঁর রোগশয্যার পাশে বসে থাকব, আর উনি অন্য এক জনের ফোটো মাথায়

boierpathshala.blogspot.com

করে রাখবেন, এটা কি মানা উচিত? তোমার মা পারতেন? যাক, এ বার তুমি ভেবে দেখো। আমাকে জানিয়ো।”

আবাসন থেকে বেরিয়ে বিতান দেখল, আকাশে মেঘ জমেছে। ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে অল্প অল্প। এখন বৃষ্টির সময় নয়, তার পরেও বৃষ্টি আসছে। দুম করে বৃষ্টি পড়লে কলকাতার চেহারাটা নিমেষে বদলে যায়। মজার হয়ে যায়। প্রথম দফায় এক চোট হুড়োহুড়ি লাগে। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে পথের মানুষ ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। কলকাতা শহরে এখন মাথা বাঁচানোর অনেক জায়গা। শহরে এ দিক ও দিক কত ফ্লাইওভার। নীচে দাঁড়িয়ে পড়লেই হল। কোথাও কোথাও সাজানো-গোছানো বাস স্টপও হয়েছে। বৃষ্টির ছাঁট বাঁচিয়ে সেখানে দিব্যি থাকা যায়। দু’পা অন্তর ছোটবড় শপিং মল। ঢুকে পড়লে নিশ্চিন্ত। তবে বিতানের এতটা নিশ্চিন্তি পছন্দ হয় না। মাথার ওপর ঝমঝম বৃষ্টি, জমা জল, ট্রাফিক জ্যাম তার ভাল লাগে। প্রকৃতি কিছু ক্ষণের জন্য যাবতীয় শহুরে আদবকায়দা, নিয়মশৃঙ্খলা, অনেক ভেবে তৈরি করা রুটিনকে এলোমেলো করে দেয়।

অন্য দিন হলে এ রকম আচমকা মেঘ দেখে খুশি হত বিতান। আজ ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে এখানে না এলেই হত। মালবিকা নামের মহিলাটির চাপের সামনে পড়তে হত না। ঊর্বীর মোবাইল ফোনে ছবি দেখতে হত না। শুধু এরা দু’জনই বা কেন? আড়ালে থেকে পরিমল মুখোপাধ্যায় কি কম চাপ দিচ্ছে? পালিয়ে কি থাকা যেত? আজ না হোক কাল ওই মহিলা ঠিক যোগাযোগ করত।

বিতান কাঁকুড়গাছির মোড়ে পৌঁছে একটা সিগারেট কিনে ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে মুখ তুলল। মেঘের আকাশ আরও কালো হয়ে এসেছে। উল্টোডাঙার দিক

boierpathshala.blogspot.com

থেকে টংটং করতে একটা অলস উদাসীন ট্রাম মেঘের ছায়ায় ভাসতে ভাসতে আসছে। ছুটন্ত ঝলমলে শহরের বুকে তাকে লাগছে বেমানান। মনে হচ্ছে, 'অনেক হয়েছে, আর চলব না' বলে যে কোনও সময় থমকে দাঁড়াবে।

বিতান ফুটপাত ধরে হাঁটতে লাগল। মানুষ যথারীতি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বৃষ্টির আগেই যদি কোথাও পৌঁছে যাওয়া যায়। বিতানের কোনও তাড়া নেই। না কাজে যাওয়ার, না বাড়ি ফেরার। এই মুহূর্তে সে সেক্টর ফাইভে ছোটখাটো একটা কাজ করছে। রিয়েল এস্টেট কোম্পানির অফিসে দুপুর তিনটের পর বসতে হয়। পার্ট-টাইম কাজ। সকালবেলাটা একটি মেয়ে সামলায়। আগে পুরোটাই থাকত, রাত আটটা পর্যন্ত। বিয়ের পর সে আর অতটা দেরি করতে পারে না। তাই বিতানকে নেওয়া হয়েছে। বিতানের বেরোতে বেরোতে অনেক সময় রাত দশটাও হয়ে যায়। সম্ভাব্য কাস্টমার কেউ এলে বা ফোন করলে, প্রজেক্ট কত ভাল তা বোঝাতে হয়। শনি–রবিবার করে সাইট ভিজিট করাতে হয়। কলকাতার চারপাশে এখন অজস্র বাড়ি হচ্ছে। শহর ঠেলেঠুলে, জোর করে বড় হতে চাইছে। সকলেই চাইছে, যেখানেই থাকি শহরের সব সুবিধে যেন মেলে। কেউ আর বাড়ির ইট, বালি, চুনের কোয়ালিটি নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামায় না। ভাবটা এমন, ঘর তাসের হলেও আপত্তি নেই। প্রোজেক্ট থেকে বাইপাস, শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স যেন দূরে না হয়। যতই ডেস্কে 'ডিসট্যান্স লিস্ট' সাঁটা থাকুক, দূরত্বের সব প্রশ্নে সন্তুষ্ট করার মতো উত্তর সব সময় দেওয়া যায় না। তখন সুইমিং পুল, জিম, ফ্রি পার্কিং-এর কথা তুলে কথা ঘোরাতে হয়। সকালে যে মেয়েটি বসে সে এই বিষয়ে দক্ষ। দুটো কথার ফঁাকে ফঁাকে সে নানা কথা বানাতে পারে।

boierpathshala.blogspot.com

“ম্যাডাম, আপনি বেডরুম থেকে পাখির ডাক শুনতে পাবেন। ইন ফ্যাক্ট আমরা কিছু ফ্ল্যাট রাখছি যেখানে সকালে আপনার পাখির ডাকে ঘুম ভাঙবে। প্রাইসটা অবশ্য একটু বেশির দিকে। বুঝতেই তো পারছেন ম্যাডাম, শহরের সব ফেসিলিটির মধ্যে পাখির ডাক অ্যারেঞ্জ করা তো কস্টলি ব্যাপার।”

বিতান এ সব পারে না। তার ভালও লাগে না। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কাজটা ছেড়ে দেবে। কাজ ছাড়ায় সে অভ্যস্ত। অনেক বার প্রতিজ্ঞা করেছে, হুট করে কাজ ছাড়বে না। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে না। আসলে চাকরি ভাল না মন্দ বড় কথা নয়, বাঁধাধরা কাজে মন বসে না তার। মনে হয়, কেরিয়ার তৈরি তার কম্ম নয়। সরকারি বেসরকারি কোনও চাকরির পরীক্ষা বা ইন্টারভিউই সে খুব জোরের সঙ্গে দিতে পারে না। অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন মারাত্মক ভাল কিছু নয় যে পরীক্ষায় কম নম্বর পেলে কিছু এসে-যাবে না। তাকে বেশি পরিশ্রম করেই পরীক্ষায় বসতে হবে। সে জীবনের উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। কী হবে কেরিয়ার করে? পরিশ্রম থেকে সরে যায় বিতান। এই মনোভাবের জন্য মাঝে মাঝেই টাকাপয়সার সমস্যা হয়। ভাগ্যিস বাড়িটা পেয়েছিল, নইলে বিপদ হত। এই বিষয়টা নিয়ে আহিরী প্রায়ই তাকে বোঝায়। রাগ করে। ক’দিন আগেও বলেছে।

“ভাল লাগে না বললে চলবে? কাজ তো করতে হবে। নইলে খাবে কী?”

বিতান হেসে বলে, “আমার খাওয়ার বেশি খরচ নেই, ও ঠিক জুটে যাবে।”

আহিরী বিরক্ত হয়ে বলে, “এ কেমন কথা! জুটে যাবে আবার কী? চিরকাল বন্ধুর বাড়িতে থাকবে?”

বিতান বলল, “ছোটখাটো একটা কিছু করলেই চলবে। খুব বড় কোনও কাজ করার মধ্যে আমি নেই। বসেদের চোখরাঙানিই বলো, কাজের টার্গেটই বলো

boierpathshala.blogspot.com

আর দশটা–পঁাচটা চেয়ার টেবিলে বন্দি থাকাই বলো, আমার ভাল লাগে না। আমার কেরিয়ার ব্যাপারটাতেই কোনও ইন্টারেস্ট নেই। মনে হয়, কেরিয়ারের পিছনে ছুটলে জীবনকে প্রপারলি উপভোগ করা যায় না।”

আহিরী ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলে, “এ সব অলস অকর্মণ্য লোকের কথা। তোমার কথা সত্যি হলে বেকার, হাত গুটিয়ে বসে থাকা লোকেরাই জীবনকে সবচেয়ে বেশি উপভোগ করত। হুইচ ইজ নট কারেক্ট। কেরিয়ার মানে শুধু উপার্জন করা নয়, লেখাপড়া করে যা শিখেছি তাকে কাজে লাগানো।”

বিতান বলল, “ঠিকই বলছ, কিন্তু আমার ভাল লাগে না। আমি তো তেমন লেখাপড়া শিখিওনি। ইচ্ছে থাকলেও সুযোগ হয়নি। কলেজের সময় থেকেই নিজের ব্যবস্থা নিজেকে করতে হয়েছে।”

“ভাল না লাগলেও তো মানুষকে অনেক কিছু করতে হয় বিতান।”

বিতান হেসে বলল, “সে তো নানা রকম রেস্পনসিবিলিটি থাকে। বাবা–মা, স্ত্রী–পুত্র, ফ্যামিলি। আমার সে ঝামেলা নেই। যাকে বলে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে থাকা একটা জীবনের অধিকার পেয়েছি।”

আহিরী নিচু গলায় বলেছিল, “আজ নেই, কাল যে হবে না তা ভাবছ কেন?”

বিতান বলে, “আমি কিছুই ভাবছি না।”

আহিরী রাতে ফোন করে থমথমে গলায় বলেছিল, “বিতান, তুমি কি সত্যি কিছু ভাবছ না?”

বিতান হেসে বিষয়টা সহজ করার চেষ্টা করে। “তুমি এত সিরিয়াসলি নিলে আহিরী!”

boierpathshala.blogspot.com

আহিরী থমথমে গলায় বলে, “কিছু কিছু জিনিস সিরিয়াসলি নিতে হয়।”

বিতান বলে, “আমি তো রসিকতাই করি।”

আহিরী আরও থমথমে গলায় বলে, “নিজের জীবন নিয়ে রসিকতা করা যায়, কিন্তু যেখানে অন্যের জীবন জড়িয়ে, সেখানে রসিকতা চলে না।”

বিতান থতমত খেয়ে বলে, “আহিরী, তুমি কী বলতে চাইছ ঠিক বুঝতে পারছি না।”

আহিরী একটু চুপ করে থেকে বলে, “থাক। আমার থেকে শুনতে হবে না। যে দিন নিজে বুঝতে পারবে সে দিনের জন্য অপেক্ষা করা ভাল।”

দু’দিন আগে, ঘেরাওয়ের সময়, কলেজ থেকে ফোন করেও আহিরী একটা ‘ভদ্রস্থ’ চাকরি পাওয়ার কথা বলেছে। সে কি আসলে তার সঙ্গে একটা ‘ভদ্রস্থ’ জীবন কাটানোর কথা ভাবছে? ঊর্বীর মোবাইলের তোলা ছবিটা সেই জন্যই অস্বস্তিতে ফেলেছে। লজ্জাতেও। কলেজের গেটে মেধাবী, সুন্দরী অধ্যাপিকার ফোটো থাকবে কোনও ‘ভদ্রস্থ’ যুবকের সঙ্গে। বিতানের সঙ্গে কেন?

পকেটে রাখা মোবাইলে মেসেজ ঢোকার আওয়াজ হল। বিতান মোবাইল বের করে দেখল, ঊর্বী তাকে মেসেজ করেছে! এই প্রথম। ফুটপাতের মাঝখানেই থমকে দঁাড়িয়ে মেসেজ পড়ল বিতান। ‘স্যরি। আমি সব ফোটো ডিলিট করে দিলাম।’

পকেটে মোবাইল ঢোকাতে না ঢোকাতে হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামল।

boierpathshala.blogspot.com

সবুজ ময়দানের পাশে একটা ধবধবে সাদা রঙের বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

বিকেলবেলা কলকাতা ময়দানের গা ঘেঁষে এ রকম গাড়ি সব সময়েই দু-একটা চোখে পড়ে। ময়দানের হাওয়া খেতে আসে। কেউ গাড়ি থেকে নেমে ঘাসে খানিকটা হেঁটে নেয়, কেউ গাড়িতে বসেই বাদাম চিবোয়। কখনও দুজন নারীপুরুষ চুমু খায়। কিন্তু এই গাড়ি 'হাওয়া খেতে' আসেনি। দাঁড়িয়ে থাকলেও গাড়ির ইঞ্জিনটা চালু। কাচ তোলা। ভিতরে এসি চলছে নিঃশব্দে।

পর্ব ২০

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

গাড়ির সামনের সিটে বসে দুজন নিচু গলায় কথা বলছে। চালকের আসনে যে সুদর্শন মানুষটি বসে আছেন, তাঁর নাম কমলেশ রায়। তাঁর পাশে দু'দিনের না-কাটা কাঁচাপাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে বসে আছে বিভূতি। বিভূতির দাড়ি না কাটাটা আসলে এক ধরনের ছদ্মবেশ। হেলাফেলা ধরনের 'কমন ম্যান' সেজে থাকা।

boierpathshala.blogspot.com

কমলেশ বললেন, “তোমার ইনফর্মেশনে কোথাও গোলমাল করছে না তো?”

বিভূতি বললেন, “আমি স্যর ডবল চেক করে কাজ করি। আপনার বেলায় তো আমি আরও অ্যালার্ট থাকি।”

কমলেশ বলল, “তুমি বাড়িটা দেখেছ?”

“বাড়ি না। ফ্ল্যাট। উঠে দেখিনি। নীচ থেকে দেখেছি। আর স্যর, শুধু দেখিনি, ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের সম্পর্কে যতটা সম্ভব খোঁজও নিয়েছি।”

কমলেশ রায় আজ বিভূতিকে পিজি হাসপাতালের সামনে দাঁড়াতে বলেছিলেন। লাঞ্চের ঘণ্টাখানেক পর অফিস থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন। দীনেশের কাছ থেকে চাবি চাইলে সে একটু থতমত খেয়ে যায়। কমলেশ হেসে বলেন, “তোমার পাল্লায় পড়ে গাড়ি চালানো ভুলে না যাই। কত দিন যে স্টিয়ারিংয়ে বসা হয় না! দাও চাবিটা দাও, নিজে ড্রাইভ করে একটা কাজ সেরে আসি।”

বিভূতিকে ফোনে বলা ছিল কোথায় দঁাড়াবে। সে বাস স্টপে দঁাড়িয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে বিড়ি খাচ্ছিল। লোকটা এমন ভাবে ভিড়ে মিশে যেতে পারে যে চট করে আলাদা করা মুশকিল। কমলেশ রায় ভাবেন, মানুষ কী অদ্ভুত সব পেশা বেছে নিতে পারে। এই যে বিভূতি, ইচ্ছে করলেই তাঁর কাছ থেকে একটা চাকরিবাকরি চেয়ে নিতে পারত। নেয়নি। তাকে অফার করার পরও নেয়নি।

“স্যর, এই কাজ ছাড়তে পারব না।”

কমলেশ ভুরু কঁুচকে বলেছিলেন, “কেন পারবে না? গুপ্তচরবৃত্তিতে সম্মানও নেই, অর্থও নেই। কোনও কোনও সময়ে কাজ না থাকলে অবস্থা নিশ্চয়ই খুব খারাপ হয়। তার থেকে একটা কাজকর্ম করাই তো ভাল, সবাই যেমন করে।”

boierpathshala.blogspot.com

বিভূতি হেসে বলে, “সম্মান নেই কে বলল স্যর? যখন খবর এনে দিই পার্টি খুশি হয়, খাতির যত্ন করে। সম্মান স্যর এক-এক জনের কাছে এক-এক রকম। আপনি অফিসের চেয়ারে বসলে যে সম্মান পান, না বসলে কি আর পাবেন? সম্মান ব্যাপারটা অনেকটা বুদ্বুদের মতো স্যর। এই আছে, এই নেই। তার থেকে এটাই ভাল। নিজের মতো আছি। হ্যাঁ, টাকাপয়সার টানাটানি হয় ঠিকই, সে আর কী করা যাবে? তবে স্যর, কাজটাকে ভালবাসি। আমার বাবাও এই লাইনে ছিলেন। উনি ছিলেন দু’নম্বরি-স্পেশালিস্ট। ভেজাল, নকল, জালি জিনিসের খবর রাখতেন। যার যেমন দরকার, টাকা নিয়ে ইনফর্মেশন সাপ্লাই করতেন। বাবার সোর্স ছিল মারাত্মক। আমাকে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছেন। স্যর, পেশা কি আর শুধু টাকা দিয়ে বিচার হয়? এই যে কলকাতা শহরের ফুটপাতে পুরনো বই বিক্রি হয়, কত টাকা লাভ থাকে? অথচ এই পেশাটা উঠে গেলে, শহরটাকে আর কলকাতা বলেই মনে হবে না।”

এর পর আর কথা বাড়াননি কমলেশ। বুঝেছিলেন, এই লোক কাজটাকে ভালবেসেই করে। কমলেশ রায় আজ বিভূতিকে অতি গোপনীয় কাজে ডেকেছেন। বিভূতি সেই ‘খবর’ জোগাড় করেছে। সে আজ ফোন করেছিল।

কমলেশ গলা নামিয়ে বললেন, “টেলিফোনে শুনব না। আমার সঙ্গে দেখা করো। আরও কথা আছে।”

বিভূতি বলল, “কোথায় যাব স্যর?”

কমলেশ একটু ভেবে বললেন, “তুমি এখন কোথায় আছ?”

“পিজি হাসপাতালের কাছে। একটা কাজে আছি স্যর।”

কমলেশ বললেন, “ঠিক আছে, তুমি কাজ সারো, এক ঘণ্টা বাদে আসছি।”

boierpathshala.blogspot.com

কমলেশ চল্লিশ মিনিটের মাথায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। বিভূতিকে গাড়িতে তুলে রেসকোর্সের সামনে থেকে একটা চক্কর দিয়ে চলে এসেছেন ময়দানে। রাস্তার এক পাশে গাছের তলায় গাড়ি দাঁড় করিয়েছেন। আগে থেকে ভাবেননি এখানে আসবেন। যেতে যেতে মনে হল, এখানে দাঁড়িয়ে কথা বললেও তো হয়। গাড়িতে বসেই বিভূতি 'খবর' বলছে।

কমলেশ বললেন, "ফ্ল্যাটে আর কে থাকে?"

বিভূতি বলল, "ছেলে আর মা।"

কমলেশ বললেন, "মহিলার বয়স কত? সিক্সটি? নাকি কম?"

বিভূতি বলল, "দেখে তো ষাট হয়েছে বলে মনে হল না। তবে কাছাকাছি। ফিফটি সেভেন–এইট হতে পারে।"

কমলেশ চুপ করে থেকে একটু ভাবলেন। বললেন, "তার পর?"

বিভূতি বললেন, "আগে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের কাছে একটা ফ্ল্যাটে ছিল। সেই ফ্ল্যাট ছোট। বছরখানেক হল বেচেবুচে এখানে এসেছে। তারও আগে ছিল নর্থ ক্যালকাটায়। টালা পার্কে বাড়ি ভাড়া নিয়ে। স্যর, ওদের অরিজিনাল বাড়ি যে গ্রামে তার নাম... অদ্ভুত নামটা... দাঁড়ান কাগজ দেখে বলছি।" কথা থামিয়ে বিভূতি প্যান্টের পকেট হাতড়ে গাদাখানেক কাগজের টুকরো বের করে ঘাঁটতে লাগল।

কমলেশ শান্ত গলায় বললেন, "কাগজ দেখতে হবে না। আমি জানি। গ্রামের নাম ছায়াপাতা। আর কী জেনেছ? মহিলার পাস্ট?"

বিভূতি বলল, "বাবা দেবাদিত্য বসু মারা যাওয়ার পরই মা'কে দেশের বাড়ি থেকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিল সৌহার্দ্য। এই ছেলে এখন আপনার আন্ডারে

boierpathshala.blogspot.com

চাকরি করছে। অফিসে ঢোকার কিছু দিনের মধ্যেই সে ম্যানেজমেন্টের নজরে পড়েছে। কেন, এখনও জানতে পারিনি।”

কমলেশ খানিকটা অধৈর্য গলায় বললেন, “এ সব আমি জানি। নতুন খবর বলো।”

বিভূতি মাথা চুলকে বলল, “সৌহার্দ্যর মা শ্রীকণা বসু কলকাতার মেয়ে। সাধারণ পরিবারের। সাধারণ বললেও কম বলা হবে, বেশ নিম্নবিত্তই ছিলেন। বাবা ছোটখাটো চাকরি করতেন। এক মেয়ে, এক ছেলে। ছেলেটি পরে কাজকর্ম নিয়ে মিডল ইস্টে চলে যায়া। সে আর বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি। কলেজ পাশ করার পর বাড়ির লোক তড়িঘড়ি মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়।”

বিভূতির কথা থামিয়ে কমলেশ রায় বললেন, “তড়িঘড়ি বিয়ে দিয়ে দেয়! কেন? তড়িঘড়ি বিয়ে দিয়ে দেয় কেন?”

বিভূতি একটু চুপ করে থেকে মাথা চুলকে বলল, “স্যর এই ইনফর্মেশন এখনও আমি পুরোটা জোগাড় করতে পারিনি। বিয়ের আগে শ্রীকণা যেখানে থাকতেন, সেখানকার ঠিকানা জোগাড় করেছি। দমদমে। এক দিন গিয়েছিলাম, কিন্তু সে বাড়ি আর নেই, ফ্ল্যাট উঠে গেছে। শ্রীকণা বসুর বাবা–মা কেউই সম্ভবত বেঁচে নেই। আমি ওর এক আত্মীয়ের খোঁজ পেয়েছি। তার সঙ্গে কথা বলতে হবে।”

কমলেশ রায় হালকা বিরক্ত হয়ে বললেন, “এটা তো তোমার বিষয় বিভূতি। কার সঙ্গে কথা বলতে হবে তুমি জানো। আমি তো বলেছিলাম, এই মহিলার অতীত সম্পর্কে আমি ইনফর্মেশন চাই। বিশেষ করে তার কমবয়সের সময়টা কেমন ছিল, বন্ধুবান্ধব কেমন ছিল, কারও সঙ্গে অতিরিক্ত মেলামেশা ছিল কি

boierpathshala.blogspot.com

না, বিয়ে কী ভাবে হল— এই সব। তার ফ্ল্যাট, বাড়ি, গ্রামের হিসেব নিয়ে আমি কী করব? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা আমার চাই। জানি কাজটা টাফ। টাকাপয়সা নিয়ে ভাববে না।'

বিভূতি মাথা নামিয়ে রইল। কমলেশ রায় নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "আর এক জনের খবর? বিতান নামের ছেলেটির?"

বিভূতি সঙ্গে হাতলওয়ালা একটা চামড়ার ব্যাগ এনেছে। আদ্যিকালের ব্যাগ। কালচে হয়ে গেছে। ব্যাগ থেকে একটা নীল রঙের ফাইল বের করে কমলেশের দিকে এগিয়ে বলল, "স্যর, এর মধ্যে আছে।"

ফাইলটা নিয়ে কমলেশ প্লাস্টিক কভার উল্টোলেন। ভিতরে বাংলায় ঝকঝকে টাইপ করা দুটো পাতা। কমলেশ অবাক হলেন। ফাইলে টাইপ করা রিপোর্ট বিভূতির সঙ্গে যায় না। একটা কর্পোরেট চেহারা। বিভূতি কমলেশ রায়ের মনের কথা যেন বুঝতে পারল। লজ্জা পাওয়ার মতো হাসি হেসে বলল, "স্যর, এ সব না করলে আজকের দিনে চলে না। পার্টি পছন্দ করে। তবে স্যর, আমি নিজেই টাইপ করি। সিক্রেট ব্যাপার অন্য কারও হাতে ছাড়ি না। ভাল করেছি না?"

কমলেশ ভুরু কুঁচকে বললেন, "এটা করেছ ঠিক আছে, কিন্তু আমার কাজের বেলায় আর কখনও করবে না। লেখা মানে রেকর্ড থেকে যাওয়া। কম্পিউটারে তো থাকলই। এর পর থেকে তেমন হলে আমাকে নিজের হাতে পেনসিলে লিখে দেবে, তার বেশি নয়।"

বিভূতি বলল, "স্যরি স্যর।"

boierpathshala.blogspot.com

কমলেশ ফাইলটা পাশে রেখে বললেন, “পরে দেখে নেব। এই ছেলেটা সম্পর্কে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট কোনটা মনে হয়েছে?”

“স্যর, আমার কাছে সব পয়েন্টই সমান গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই ছেলেটির ফ্যামিলিতে বড় ধরনের কোনও লাফড়া আছে।”

কমলেশ মুখ ঘুরিয়ে বললেন, “লাফড়া!”

বিভূতি তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বলল, “স্যরি স্যর... গোলমাল। ছেলেটার চালচুলো কিছু নেই। বন্ধুর ফ্ল্যাট পাহারা দেয়। তার বদলে সেখানে থাকতে পেরেছে।”

কমলেশ ভুরু কঁুচকে ফেললেন। এ কেমন ছেলেকে আহি পছন্দ করেছে! মানিব্যাগ থেকে দু’হাজার টাকার একটা নোট বার করে বিভূতির দিকে এগিয়ে দিলেন।

“নাও ধরো। বাকিটা কাজ শেষ করলে পাবে। তুমি কোথায় নামবে?”

বিভূতি উজ্জ্বল মুখে টাকা নিল। বলল, “স্যর, আমাকে পিজির সামনে নামিয়ে দিল। অদ্ভুত একটা কাজ পেয়েছি। এক পেশেন্টকে তার পুরনো বৌ দেখতে আসে কি না নজর রাখতে হবে। আমার অ্যাসিসট্যান্টকে ওয়ার্ডের সামনে দঁাড় করিয়ে রেখে এসেছি। এ বার আমি যাব।”

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে কমলেশ বললেন, “পুরনো বৌকে চিনবে কী করে?”

“আমরা গিয়ে তাকে চিনে এসেছি স্যর।”

“কত দিনের ডিউটি?”

boierpathshala.blogspot.com

বিভূতি কাঁচুমাচু মুখে বলল, “কিছু মনে করবেন না স্যর, সেটা বলা যাবে না। সিক্রেট।”

কমলেশ বললেন, “স্যরি।”

পিজি হাসপাতালের সামনে গাড়ি দাঁড় করালেন কমলেশ। বিভূতি নামার আগে ‘এক সেকেন্ড’ বলে দ্রুত হাতে ব্যাগ থেকে একটা খাম বের করল। এগিয়ে দিয়ে বলল, “স্যর, এখানে ফটো আছে।”

কমলেশ অবাক হয়ে বললেন, “ফোটো! কার ফোটো?”

বিভূতি বলল, “শ্রীকণা বসুর। ভাল ফটো নয় স্যর। দূর থেকে মোবাইলে তোলা। বড় করতে গিয়ে ফেটে গেছে। সেই জন্য দিচ্ছিলাম না। তা ছাড়া আপনি তো ফটো চাননি। ভেবেছিলাম পুরো রিপোর্ট হলে আপনাকে একসঙ্গে...’

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ২১

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

কমলেশ কথার মাঝখানেই হাত বাড়িয়ে খামটা নিলেন। তাঁর ইচ্ছে করছিল এখুনি খাম খুলে দেখেন, কিন্তু নিজেকে সামলে নিলেন। বিভূতির সামনে এতটা কৌতূহল ঠিক হবে না। বিভূতি গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার পরও পাশে পড়ে থাকা খামে হাত দিলেন না। তাড়াহড়ো কিছু নেই।

অফিসে ঢুকে কমলেশ রায় খবর পেলেন, কম্পিউটার সিস্টেমে বড় ধরনের গোলমাল হয়েছে। সার্ভার ডাউন হয়ে গিয়েছিল। তাকে চালু করা গিয়েছে, কিন্তু তাতে নতুন জটিলতা হচ্ছে। চেয়ারে বসতেই মনোজ ত্রিপাঠীর ফোন।

“স্যর, আপনি কি কম্পিউটার অন করেছেন?”

কমলেশ বললেন, “না, শুনলাম কী গোলমাল করছিল। ঠিক হয়েছে?”

ত্রিপাঠী বলল, “বেসিক প্রবলেম ঠিক হয়েছে, কিন্তু এখনই কম্পিউটার খুলবেন না। ফাইল ডিলিট হয়ে যাচ্ছে।”

কমলেশ বললেন, “সে কী! সে তো ভয়ঙ্কর!”

boierpathshala.blogspot.com

ত্রিপাঠী বললেন, “আমাদের ইঞ্জিনিয়ার কাজ করছে। বাইরে থেকেও এক্সপার্ট কল করা হয়েছে।”

“তা হলে এখন গোটা অফিসে কাজ বন্ধ?”

ত্রিপাঠী শুকনো গলায় বলল, “এক রকম তা-ই। সবাই মেশিন খুলতে ভয় পাচ্ছে। যদি ফাইল ডিলিট হয়ে যায়!”

কমলেশ চিন্তিত গলায় বললেন, “দেখো কত তাড়াতাড়ি নরমালসি রেস্টোর করা যায়। জানিয়ো।”

কমলেশ রায় দরজার বাইরের ‘বিজ়ি’ আলো জ্বালালেন। ইন্টারকম তুলে চা পাঠাতে বললেন। বলে দিলেন বাইরে থেকে ফোন এলে বুঝেশুনে লাইন দিতে হবে। সব ফোন দেওয়ার দরকার নেই। পরে করলেই হবে। ইন্টারকমের রিসিভার নামিয়ে টেবিলের উপর ফেলে রাখা খামটা টানতে গিয়ে থমকে গেলেন কমলেশ রায়। এটা পরে, আগে বিতানের ফাইলটা দেখা দরকার। ফাইল নিয়ে দ্রুত চোখ বোলালেন কমলেশ। যত এগোতে লাগলেন তত ভুরু কোঁচকাতে থাকল তাঁর।

নবনী বরং কম করে বলেছে। ছেলেটার শুধু কাজকর্ম করার ইচ্ছে নেই এমনটাই নয়, মনে হয় যোগ্যতাও নেই। একটার পর একটা চাকরি ছেড়ে দেয়। অথবা তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। বাবা দ্বিতীয় বার বিয়ে করে ছেলেকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তার পরেও সেখানে যাতায়াত আছে। কেন যাতায়াত সে ব্যাপারে বিভূতির রিপোর্টে স্পষ্ট করে কিছু লেখা নেই। তবে ইঙ্গিত আছে। মনে হয়, টাকা চাইতে যায়। অন্য কোনও উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। ভদ্রলোকের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর একটি মেয়ে আছে। সেই মেয়ে

boierpathshala.blogspot.com

কলেজে পড়ে। মেয়েকে নিয়েই মহিলা বিতানের বাবার কাছে এসে উঠেছিল। ছেলেটি কেন ওই বাড়িতে যাতায়াত করবে? আহি কি এত সব জানে?

ফাইল পড়া শেষ হলে কমলেশ রায় চুপ করে বসে রইলেন কিছু ক্ষণ। নবনী ঠিক বলেছে। মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে। অবশ্যই বলতে হবে। আহি এই ছেলেকে নিয়ে জীবনে চলার কথা ভাবলে বিরাট বিপদে পড়বে। কিন্তু কী ভাবে তাকে আটকানো যাবে? আহি আর পাঁচ জনের মতো নয়। সে সেন্সিটিভ, জেদি। নিজে যা ভাল বুঝবে করবে। আজ পর্যন্ত কোনও বিষয়ে সে ভুল করেনি। এই কনফিডেন্স তাকে সমস্যায় ফেলবে। ঠিক মানুষ অনেক সময় মাত্র একটা ভুলে নিজের সাজানো-গোছানো জীবন লন্ডভন্ড করে ফেলে। এই ছেলে কোনও ভাবেই আহির সঙ্গে ম্যাচ করবে না। প্রেমের উন্মাদনা কেটে গেলে আহির সমস্তটাই বৃথা মনে হবে। তবে সবার আগে জানা দরকার, আহি এই ছেলেকে সত্যি কতটা পছন্দ করে।

কমলেশ ফাইল সরিয়ে রেখে চেয়ারে হেলান দিলেন। জটিল সমস্যায় পড়া গেল! মেয়ে তাকে বিশ্বাস করে। বাবা তার ভালবাসার মানুষকে সরিয়ে দিতে চাইছে, সে ভাবতেই পারবে না। তা হলে?

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিলেন কমলেশ। সোনালি বর্ডারের শৌখিন কাপ। কাপটা রাখতে গিয়ে থমকে গেলেন। সে দিন সৌহার্দ্য নামের ছেলেটা এই রকমই একটা কাপ ভেঙেছিল না? ভাঙেনি, ওর হাতে লেগে পড়ে গেল।

আপনা থেকেই ভুরু কুঁচকে গেল কমলেশের। টেবিলের কোনায় রাখা কাপটার দিকে ভাল করে তাকালেন। কাপটা সে দিন কী ভাবে পড়েছিল? হাতে লেগে? না কি হাতের ধাক্কায়? হঠাৎ এ রকম একটা অদ্ভুত প্রশ্ন মাথায় আসার কারণ কী? অস্বস্তি শুরু হল কমলেশের। তিনি মাথা ঝাঁকালেন। এ রকম একটা

boierpathshala.blogspot.com

তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? নিজের ওপর বিরক্তি হল। ঘটনাটা যেন উড়ে এসে মাথার ভিতর জুড়ে বসল। বেরোতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না। খচখচ করছে।

কাপটা টেবিলের কোনায় রাখলেন কমলেশ। যত কোনায় রাখলে সামান্য ধাক্কায় পড়ে যেতে পারে, ততটা কোনায়। তার পর হালকা ভাবে হাত লাগালেন। পড়ল না। আরও এক বার হাত দিলেন। ডিশের উপর রাখা কাপ সামান্য নড়ল, কিন্তু এ বারও পড়ল না। বোঝা-ই যাচ্ছে, কাপ টেবিল থেকে ফেলতে গেলে অল্প হলেও ধাক্কা লাগবে। হাতে ধাক্কা লাগলে কি বোঝা যাবে না? তার থেকেও বড় কথা, ধাক্কায় কাপ নীচে পড়লে একেবারে জানা যাবে না, এটা হতে পারে না। অথচ সে দিন সৌহার্দ্য এমন ভাবে ঘর থেকে বেরোল যেন কিছুই জানতে পারেনি! কাপটা পড়ল, ভাঙল, তার পরেও নির্বিকার ভাবে বেরিয়ে গেল। তবে কি সে ইচ্ছে করে কাপটা ফেলে দিয়েছিল? তার কোনও রাগ, ঘৃণা জানিয়ে গেল?

কমলেশ ঝিম মেরে বসে রইলেন। এ সব তিনি কী উল্টোপাল্টা ভাবছেন! কেনই বা ভাবছেন? তিনি কি কোনও অপরাধবোধে ভুগতে শুরু করেছেন? মনে হচ্ছে তা-ই। হাত বাড়িয়ে টেবিলে পড়ে থাকা খামটা টানলেন। তার মন বলছে, তিনি যা ভাবছেন সেটাই সত্যি। বিভূতির ‘খবর’ সে দিকেই ইঙ্গিত করেছে। সৌহার্দ্যও মায়ের নাম বলে, কাপ ভেঙে সে কথা বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

পোস্টকার্ড সাইজের ফোটোটা দেখে কমলেশ রায় চমকে ওঠার বদলে মুচকি হাসলেন। মনে মনে নিজেকে তারিফ করলেন। ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। কর্পোরেট জগতের শুকনো জীবন মানুষের মনকে পুরোপুরি দুমড়ে-

boierpathshala.blogspot.com

মুচড়ে দিতে পারে না। পারে না বলেই শ্রীকণাকে তিনি এক বারে চিনতে পারলেন।

সাঁইত্রিশ বছরে শ্রীকণা পুরোটাই বদলে গিয়েছে, কিন্তু তার চোখের মায়া এখনও মোছেনি। এই মায়া সে তার পুত্রের মধ্যেও রেখে দিয়েছে। প্রথম দিন সৌহার্দ্যর চোখ দেখে তাই মনে হয়েছিল, কোথায় যেন দেখেছি। শ্রীকণার চোখ দেখেই এক দিন তিনি তার প্রেমে পড়েছিলেন।

"তুমি আমাকে এত ভালবেসেছ কেন কমলেশ? কী পাও আমার মধ্যে?"

"তোমার চোখ আমার মাথা খারাপ করে দেয়।"

"ও! তা হলে আমাকে নয়, তুমি আমার চোখের সঙ্গে প্রেম করো?"

"শ্রীকণা, মানুষের মনের ভিতরটা চোখেই প্রকাশ পায়। যার চোখ এমন মায়া-মাখা, তার মনটাও না জানি কত মায়ার।"

"ধুস, পাগল একটা।"

"পাগল হব কেন? রবীন্দ্রনাথই তো লিখে গিয়েছেন, কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় মন, তাই কেমন হয়ে আছিস সারা ক্ষণ।"

কমলেশের মুখ থমথমে হয়ে গেল। এই ভাবে কি হুড়মুড়িয়ে সব মনে পড়বে? তরুণ বয়সের যাবতীয় ছেলেমানুষি!

মোবাইল তুলে নম্বর টিপলেন কমলেশ।

"স্যর বলুন।"

কমলেশ চাপা গলায় বললেন, "বিভূতি, শ্রীকণা বসুর ফাইলটা বন্ধ করে দাও। তার সম্পর্কে আমার আর কিছু জানার প্রয়োজন নেই।"

boierpathshala.blogspot.com

বিভূতি এক মুহূর্ত থমকে বলল, “আচ্ছা স্যর।”

কমলেশ বললেন, “চিন্তা কোরো না। বাকি পেমেন্ট তুমি পুরোটাই পাবে।”

ফোন রেখে কমলেশ আর এক বার ফোটোটা হাতে তুললেন। শ্রীকণার চুলে পাক ধরেছে। মুখটা ভারী হয়েছে। কিন্তু চিবুকের কাছের তিলটা এখনও একই রকম আছে। জীবন খুব অদ্ভুত। কম্পিউটারের ফাইলের মতো। মনে হয়, কত ফাইল ডিলিট হয়ে গেছে। আসলে হয় না, থেকে যায়। ফিরে আসে।

ইন্টারকম বেজে উঠল। কমলেশ ফোন ধরলেন।

“স্যর, ত্রিপাঠী।”

“সিস্টেম ঠিক হয়েছে?”

ত্রিপাঠী গম্ভীর গলায় বলল, “হ্যাঁ স্যর, ডিলিট ফাইলগুলো পাওয়া যাচ্ছে।”

কমলেশ বললেন, “গুড। কাজ তা হলে শুরু করা গেছে।”

ত্রিপাঠী বলল, “করা গেছে। তবে একটা জরুরি কথা আপনাকে বলার ছিল।”

“বলো।”

ত্রিপাঠী প্রায় ফিসফিস করে বলল, “স্যর, মনে হচ্ছে, সিস্টেমে কোনও সাবোটাজ হয়েছে।”

কমলেশ বললেন, “সে কী!”

boierpathshala.blogspot.com

আহিরীকে দেখতে পেয়ে বিতান হাত তুলল। বিতানের মুখ হাসি-হাসি। রাস্তার ও পাশে থাকলেও বিতানের হাসি বোঝা যাচ্ছে।

আহিরীর বুক ধক করে উঠল। বিতানের মুখে হাসি মানে নিশ্চয়ই আবার গোলমাল হয়েছে। গোলমাল হলে এই ছেলের মুখ হাসি-হাসি হয়ে যায়। এ আবার কেমন রসিকতা? এত দিনেও মেনে নিতে পারেনি আহিরী।

বিতানের রিয়েল এস্টেটের কাজটা সম্পর্কে আহিরীর কোনও আশা নেই। ওটা ঠিকঠাক কোনও কাজই নয়। আজ আছে কাল নেই। থাকলেও বা কী? টাকাপয়সা খুব কম। লোককে বলাও যাবে না। আজকের ইন্টারভিউটার দিকে সে তাকিয়ে আছে। আইটি কোম্পানির এই কাজটা যদি হয়ে যায়, খানিকটা স্বস্তি পাওয়া যাবে। এর আগে তিন–তিনটে কাজ ছেড়েছে বিতান।

প্রথমটা ছিল সেলসের চাকরি। একটা নতুন কোম্পানির ওয়াটার পিউরিফায়ার বেচতে হবে। দু'মাস যেতে না যেতে কাজটা ছেড়ে দিয়েছিল সে।

আহিরী জিজ্ঞেস করেছিল, "কেন? সমস্যা কী? বেশ তো শহরেই কাজ করতে পারতে। এই কাজে প্রসপেক্টও ভাল ছিল। মানুষ এখন খুব হেলথ কনশাস। হাইজিন খোঁজে।"

বিতান বলল, "তা হয়তো পারতাম, কিন্তু বেশি দিন মিথ্যে বলা পোষাল না। ফুলিয়ে ফঁাপিয়ে গুণের কথা বলতে হত। হয়তো আছে পঁাচ, বলতে হত পঞ্চাশ। মনে হচ্ছিল, লোক ঠকাচ্ছি।"

আহিরী বলল, "ঠকানোর কী আছে! সেলসের চাকরিতে একটু বাড়িয়ে তো বলতেই হয়। ও সব কাস্টমার কনভিন্সড করার কায়দা।"

boierpathshala.blogspot.com

বিতান বলল, “হতে পারে, কিন্তু আমি বুঝেছিলাম ও কাজ আমার দ্বারা হবে না। কোনও কিছু ফুলিয়ে ফঁাপিয়ে বলাতে আমি নেই। দুনিয়ার সব কায়দা তো সবার জন্য নয় আহিরী।”

আহিরীর এই যুক্তি পছন্দ হয়নি। তবে সে মুখ ফুটে বলেনি কিছু। পরের কাজটা ছিল কোনও এক স্ট্যাটিসটিক্যাল প্রোজেক্টের ফিল্ড ওয়ার্কারের। ঘুরে ঘুরে ডেটা সংগ্রহ করতে হত। বিতান গল্প করেছিল।

“বুঝলে আহিরী, কাজটা বেশ ইন্টারেস্টিং ছিল। নাম ছিল ‘আরবান ডিসকমফর্ট’। নাগরিক জীবনে সমস্যা। পলিউশন, ট্রাফিক জ্যাম, স্বার্থপরতা, নিঃসঙ্গতা, র‍্যাট রেস— সব এর মধ্যে পড়ে। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে লোকের সঙ্গে কথা বলতাম। মজা লাগত। চার ঘণ্টা কাজে চারশো টাকা। সেই সময়ে আমার জন্য তো বেশ ভালই রোজগার। আমার কাজও ওদের পছন্দ হচ্ছিল। বলল, এটা শেষ হলে নতুন প্রজেক্টে নেবে। কিন্তু এক দিন ফিল্ড অফিসারের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। আমি নাকি যে ফর্ম দেওয়া হয়েছে তার বাইরে প্রশ্ন করে বেড়াচ্ছি। ব্যস, কাগজপত্র ছুড়ে ফেলে চলে এলাম। ভাল করেছি না?”

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ২২

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

এই ঘটনাও ভাল লাগেনি আহিরীর। তার মনে হয়েছিল, বিতানের একটা না একটা অজুহাতে কাজ ছেড়ে দেওয়া আসলে এক ধরনের অস্থিরতা। তাও সে কিছু বলেনি। বিতান তো কোনও ছোট ছেলে নয়। তিন নম্বর চাকরিটা ভাল ছিল। কর্পোরেট অফিসে জুনিয়র ম্যানেজার। সে দিনের ঘটনা মনে আছে আহিরীর।

আজকের মতোই ঠিক সে দিনও এসে দাঁড়িয়েছিল আহিরী। সবে কলেজে পড়াতে শুরু করেছে তখন। কয়েক মাস হয়েছে মোটে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ছ'টার সময়। ঠিক ছিল, বিতান অফিস থেকে বেরোলে দুজনে কলামন্দিরে একটা প্রোগ্রাম শুনতে যাবে। আহিরী যে গাইডের কাছে গবেষণা করেছে তাঁর বউয়ের গানের অনুষ্ঠান ছিল। মহিলার গান আগেও শুনতে হয়েছে আহিরীকে। অতি খারাপ। গলা চড়ার দিকে উঠলে খ্যানখেনে হয়ে যায়। তার পরেও যেতে হবে। নইলে ভাববে কাজ ফুরিয়েছে, গাইডকেও ভুলে গিয়েছে। আহিরী ঠিক

boierpathshala.blogspot.com

করেছিল, একটু ক্ষণ থাকবে। বিতানকেও নিয়ে যাবে। আগে থেকে তাকে কিছু বলেনি। বিতান যদি রাজি না হয়, হল থেকে বেরিয়ে গাড়ি নিয়ে দুজনে ঘুরে আসবে। কোথাও খেয়ে, বাড়ি ফিরবে।

আহিরী সে দিন আগেই বিতানের অফিসের কাছে চলে যায়। জ্যামে-ট্যামে পড়েনি। রাস্তা পেরিয়ে বিতান কাছে আসতে আহিরী জিজ্ঞেস করেছিল, "কী হয়েছে, হাসছ কেন?"

বিতান মাথার চুলে আঙুল বুলিয়ে বলল, "একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। তাই হাসছি।"

আহিরী বলেছিল, "মজার ব্যাপারটা কী, জানতে পারি?"

বিতান বলেছিল, "অবশ্যই পারো। তবে আগে আমি কি কিছু খেতে পারি? আজ অফিসে কিছু খাওয়া হয়নি। খুব খিদে পেয়েছে। চলো কোথাও ঢুকে খাই।"

"ঠিক আছে। তার পর কিন্তু আমার সঙ্গে একটা জায়গায় যেতে হবে। রাগারাগি করবে না।"

বিতান হেসে বলেছিল, "তোমার সঙ্গে আমি সব জায়গায় যেতে রাজি।"

ছোট একটা রেস্তরাঁর সামনে গাড়ি দাঁড় করাল আহিরী। এখন কলকাতার অলিতে-গলিতে ভাল ভাল খাওয়ার জায়গা হয়েছে। একটা ভেজিটেবল চাউমিন নিয়ে দুজনে ভাগ করে নিল।

আহিরী বলল, "এ বার বলো মজার ব্যাপারটা কী?"

boierpathshala.blogspot.com

আয়েশ করে খেতে খেতে বিতান সে দিন বলেছিল, “মজার ব্যাপার অতি সামান্য। এই চাকরিটাও নট হয়ে গেল।”

আহিরী খাওয়া থামিয়ে মুখ তুলে বলল, “সে কী! চাকরি চলে গেল! কেন?”

বিতান বলল, “তা তো বলতে পারব না! লাঞ্চের পর ইন-চার্জ ডেকে বলল, কাল থেকে আর আসতে হবে না। বকেয়া যা আছে, তার সঙ্গে এক মাসের এক্সট্রা স্যালারি পেয়ে যাবেন। ক্যাশে চলে যান, এখনই দিয়ে দেবে। আজ আমি এক জন ধনী মানুষ আহিরী। পকেটে দেড় মাসের মাইনে। এই কারণে হাসছি। তোমার টাকা লাগলে বলো, ধার দিতে পারব। লাগবে?”

আহিরী হতভম্ব হয়ে বলল, “ওরা বলল আসবেন না আর তুমি কিছু বললে না?”

বিতান খানিকটা চাউমিন মুখে নিয়ে চোখ আধখানা বুঁজে ফেলল, “বিউটিফুল!”

আহিরী রেগে গিয়ে বলল, “কী বিউটিফুল? তোমার চাকরি যাওয়াটা বিউটিফুল!”

বিতান হেসে বলেছিল, “এদের খাবারটা বিউটিফুল।”

আহিরী থমথমে গলায় বলল, “যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও। তুমি কিছু বললে না?”

বিতান খাওয়া থামিয়ে আহিরীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, “কী বলব? এর আগের কাজগুলোও তো গিয়েছিল। তখন টাকাপয়সা কিছু পাইনি। এ বার তো তা নয়। কিছু টাকা অন্তত পেয়েছি। বেটার সিচুয়েশন। সবটা মার যায়নি।”

boierpathshala.blogspot.com

“এ বার তো তুমি ছাড়োনি, তা হলে কাজটা গেল কেন?”

বিতান বলল, “কেন গেল জিজ্ঞেস করে লাভ কী? আজকাল তো সব কনট্র্যাক্ট সার্ভিস। আমারটা তো মোটে ছ’মাসের ছিল। এখন বিনা নোটিসে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়ার নিয়ম আছে। কারণ লাগে না। শুনলাম আজ আরও দশ জনকে নোটিস দিয়েছে। পরে আরও দেবে। কোম্পানি ওভারহেড কমাচ্ছে। এ কী, তুমি হাত গুটিয়ে বসে আছ কেন? খাও।”

আহিরী নিচু গলায় বলেছিল, “কাজ চলে গেছে আর তুমি খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে?”

বিতান বলল, “কী করব? ডাক ছেড়ে কাঁদব?”

আহিরী চুপ করে রইল। বিতান একটা হাত বাড়িয়ে আহিরীর হাতের উপর রাখল।

“চিন্তা কোরো না। ঠিক আবার একটা কিছু হয়ে যাবে। উনিশ বছর বয়স থেকেই কিছু না কিছু করছি, সাতাশ হতে চলল। এত দিন পারলাম যখন, আবার পারব।”

আহিরী নিচু গলায় বলল, “এই ভাবে কত দিন চলবে? সবই তো নড়বড়ে কাজ। আজ আছে কাল নেই। এ বার একটা ঠিকঠাক চাকরির খোঁজ করো।”

বিতান হাসিমুখেই বলল, “আমি তো তোমার মতো লেখাপড়া জানি না আহিরী। তোমার মতো কলেজের মাস্টারনি হওয়ার পরীক্ষাও দিতে পারব না। আমি এক জন অর্ডিনারি ছেলে। আমি যে ধরনের চাকরির পরীক্ষাগুলো দিই তাতে শুধু পরীক্ষায় পাশ করলে হয় না, আরও কিছু লাগে। চেনাজানা লাগে, টাকা

boierpathshala.blogspot.com

লাগে, তোষামোদি লাগে। ও সব আমার নেই। আমাকে এ ভাবেই চলতে হবে। সুতরাং বেশি ভেবে লাভ কী?”

“তোষামোদি ছাড়া কারও চাকরি হয় না?”

বিতান গ্লাসের জলে চুমুক দিল, “হবে না কেন? অবশ্যই হয়। আমার মতো অ্যাভারেজে ছেলের হয় না। এখনকার ছেলেমেয়েদের মতো আমি স্মার্ট নই। কাজ চলে যাওয়ার পিছনে আমার নিজের অযোগ্যতাও নিশ্চয়ই আছে। এটাও এক ধরনের শহুরে জীবনের ক্রাইসিস। হয় কমপিটিশনে টিকে থাকো, নয় কেটে পড়ো।”

আহিরীর মনখারাপ হয়ে গিয়েছিল। লেখাপড়ায় বিরাট ডিগ্রি নেই, ফড়ফড় করে দুটো ইংরেজি বলতে পারে না তো কী হয়েছে? মানুষ হিসেবে বিতান তো ভাল। সে এক জন সৎ মানুষ। তার কোনও দাম নেই? তবে বিতান যখন নিজের সমস্যা নিয়ে রসিকতা করে, তখন তার রাগ হয়। সে অবশ্য বলে, “আহিরী, এটা রসিকতা নয়, রসবোধ। রসবোধ হল পদ্মপাতার মতো। দুঃখ কষ্ট সব পিছলে যায়।’

আহিরী কড়া গলায় বলে, “স্যরি, এত রসবোধ আমার নেই, দরকারও নেই। আমার সহ্যও হয় না। আমি কাঠখোট্টা বাস্তবের মানুষ।”

বিতান কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, “জো আজ্ঞা জঁাহাপনা। আপনি যা বলবেন। এ বার থেকে আমি রামগরুড়ের ছানা হয়ে যাব। তার মতো মুখ করে থাকব। নো হাসি, নো মসকরা। চিন্তা একটাই, দাড়িওলা রামগরুড় কি হয়? আমি কি দাড়ি কেটে ফেলব?”

boierpathshala.blogspot.com

আহিরী সে দিন নিজেকে সামলাতে পারেনি। বিতানের হাতে জোর চিমটি কাটে। “আহ্!” বলে ওঠে বিতান। আহিরী চাপা গলায় বলে, “আবার ঠাট্টা করলে আরও জোর চিমটি কাটব।”

সে দিন মন এতটাই খারাপ হয়েছিল যে গান শুনতে আর যেতে পারেনি আহিরী। বিতানের সঙ্গে খানিকটা এলোমেলো ঘুরে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল।

আজও একটা ইন্টারভিউ ছিল বিতানের। ওয়াক-ইন ইন্টারভিউ। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়েছিল। হায়দরাবাদের কোম্পানি, কলকাতায় নতুন অফিস খুলছে। বিজ্ঞাপনে বলেছিল, ইন্টারভিউ হল-এই জানিয়ে দেওয়া হবে। বিতানের হাসিমুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তাকে জানিয়ে দিয়েছে যে তার হয়নি। এই ইন্টারভিউয়ের জন্যই বিতানকে ভাল করে প্রিপারেশন নিতে বলছিল সে। সে দিন কলেজ থেকে ফোনে খানিকটা কড়া কথাও বলে ফেলেছিল। সেই কারণেই আরও আসা।

বিতান বলল, “কখন এলে?”

“কিছু ক্ষণ। বলেছিলাম তো আসব। খানিক আগে মেসেজ দিয়েছি, দেখোনি?”

সিগারেটের প্যাকেট বের করল বিতান। প্যাকেট খুলে দেখল, ফঁাকা।

“না, মোবাইলের মেসেজ সব সময় দেখি না।”

“আমারটাও দেখো না?”

বিতান হেসে বলল, “ও দিকে অনেক সময়েই তাকাই না। যাক, আহিরী, টাকা ধার দাও দেখি। সিগারটে কিনব।”

আহিরী ব্যাগ খুলে টাকা বের করে দিল।

boierpathshala.blogspot.com

“এত লাগবে না।”

আহিরী নির্বিকার ভঙ্গিতে বলেছে, “ধার তো। বেশি করেই নাও। কম ধার নিলে ভুলে যাবে।”

এগিয়ে গিয়ে ফুটপাতের দোকান থেকে সিগারেট কিনে ধরাল বিতান। আহিরীর কাছে এসে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, “চলো।”

আহিরী বলল, “আগে সিগারেট শেষ করো। জানো তো গাড়িতে স্মোকিং নট অ্যালাওড।”

বিতান উদাস মুখ করে বলল, “এই জন্য গাড়ি কিনি না। দঁাড়াও, সিগারেটটা আয়েশ করে শেষ করি। ধারের পয়সায় কেনা জিনিস হুটোপাটি করে খাওয়া যাবে না।”

আহিরী মুখ ফেরাল। রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। অফিস ছুটি হয়েছে। সল্টলেক সেক্টর ফাইভে কমবয়সি ছেলেমেয়েদের ভিড়। বুকে আই কার্ড ঝুলিয়ে আকাশছোঁয়া অফিসবাড়ি থেকে সবাই বেরিয়ে আসছে। বাস, ক্যাব ধরছে। নিজেদের বাইক, গাড়ি, পুল কারও রয়েছে। নাইট শিফট শুরু হবে এ বার। তার ভিড়ও বাড়ছে। কলকাতার পুরনো বিবাদীবাগের অফিসপাড়ার থেকে এই অফিসপাড়ার একেবারে আকাশ পাতাল তফাত। একটা ঝলমলে ব্যাপার আছে। বয়স কম বলে ছেলেমেয়েরা অনেক ক্ষণ কাজ করেও কেউ ধুঁকছে না, মুখও গোমড়া নয়। বরং রাস্তাতেই গোল হয়ে দঁাড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে তারা। হাসছে, ঝগড়া করছে। কেউ কেউ খেতে যাওয়ার প্ল্যান করছে। কোনও কোনও দলের দিকে তাকালে মনে হচ্ছে, অফিস নয়, ইউনিভার্সিটি ছুটি হয়েছে। আহিরীর ইচ্ছে করল, গিয়ে ওদের আড্ডায় ঢুকে পড়ে।

boierpathshala.blogspot.com

বিতান সিগারেট শেষ করলে আহিরী বলল, “কোথায় যাবে?”

বিতান হালকা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, “স্বর্গের দিকটায় গেলে কেমন হয়? একটু পরেই চাঁদ উঠবে। স্বর্গের কিনারায় দাঁড়িয়ে বাদাম খেতে খেতে তুমি আর আমি জ্যোৎস্না দেখব।”

আহিরী মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এত গোলমালের মধ্যেও এই ছেলের রসিকতা বন্ধ হয় না। চাকরির কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছে। এমনও হতে পারে, হালকা ভাব দেখিয়ে আহিরীর কাছ থেকে সে সমস্যা আড়াল করে রাখতে চায়। ভান করছে, সব ঠিক আছে। সব যে ঠিক নেই, আহিরী ভাল করেই জানে। সমস্যা ঘন হয়ে আসছে। বিতান যদি এ বারও কোনও কিছু করে উঠতে না পারে, তার পক্ষে খুব মুশকিল হবে। বাড়ি কী ভাবে সামলাবে? বাইরেই বা কী বলবে? কারও দিকে না তাকিয়ে, কারও আপত্তি না শুনেও সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু বিতান কি তার জন্য তৈরি? এই সিদ্ধান্ত একা নেওয়া যায় না।

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ২৩

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

বিতান বলল, “ওয়র্ডসওয়র্থ স্বর্গের আলো নিয়ে অবশ্য অন্য রকম কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন, স্বর্গের সব আলোই আসলে ভোরের আলো। দ্য লাইটস অব হেভেন ফল হোল এন্ড হোয়াইট/ অ্যান্ড ইজ নট স্যাটায়ার্ড ইনটু ডাইজ়/ দ্য লাইট ফরএভার মর্নিং লাইট।”

আহিরী নিজেকে হালকা করার জন্য বলল, “রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওয়র্ডসওয়র্থ আবৃত্তি করাটা ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে না? তোমার কবিতা শোনার জন্য ভিড় হয়ে গেলে সমস্যা হবে। চলো অন্য কোথাও যাই।”

বিতান ঘুরে আহিরীর মুখোমুখি হল। বলল, “তোমাকে একটা কথা বললে রাগ করবে?”

আহিরী বলল, “তোমার কোন কথাটা রাগ করার মতো নয়?”

boierpathshala.blogspot.com

বিতান হেসে বলল, “আমি যে রাগ করার মতোই মানুষ। আহিরী, তোমার সঙ্গে অনেক রসিকতা করেছি, আজ কয়েকটা সিরিয়াস কথা বলব।”

আহিরী একটু থমকাল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, “বাপ রে, হঠাৎ গুড বয় হয়ে গেলে যে বড়?”

বিতান চোখ পাকিয়ে বলল, “যারা হাসিঠাট্টার মধ্যে থাকে তারা ব্যাড বয় না কি?”

আহিরী এ বার খানিকটা রাগের সুরে বলল, “ব্যাড নয়, ওটা আসলে জীবনের রিয়েলিটিকে এড়িয়ে থাকার একটা ধরন। লুকিয়ে রাখারও বলতে পারো।”

বিতান বলল, “যদি সেটা বাধ্যতামূলক হয়?”

আহিরী ভুরু কুঁচকে বলল, “কে তোমাকে বাধ্য করছে? নিজে যা ভাল মনে করবে সেটাই ঠিক।”

বিতান বলল, “ঝগড়াটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে না করে, কোথাও গিয়ে করলে ভাল হত না?”

আহিরী বলল, “স্যরি। এস গাড়িতে ওঠো।”

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে আহিরী বলল, “কোন দিকে যাবে? হোয়্যার ইজ ইয়োর হেভেন? সিট বেল্টটা লাগাও।”

বিতান বলল, “আমার স্বর্গ সব সময়েই আমার বাড়ি, আমার ঘর। দেয়ার ইজ নো বস, নো চাপ। আগে ট্র্যাফিকের ভিড় টপকে চলো বাইপাসে উঠি।”

আহিরী চুপ করে গাড়ি চালাতে লাগল। সেক্টর ফাইভের রাস্তাগুলো সরু। সতর্ক হয়ে গাড়ি চালাতে হয়। যারা জায়গাটা বানিয়েছিল, তাদের দূরদর্শিতার অভাব

boierpathshala.blogspot.com

ছিল। এই দেশে এটা বড় সমস্যা। পরিকল্পনার সময় কেউ দূরটা দেখতে চায় না। এখানেও বুঝতে পারেনি, এক সময় অফিস, গাড়ি, লোকজনের এতটা চাপ বাড়বে। একটা সময়ে পিক আওয়ারে গাড়ি নড়তে চাইত না। তাও তো 'ওয়ান ওয়ে সিস্টেম' দিয়ে এখন অবস্থা কিছুটা সামলানো হয়েছে। আহিরীর মনে হল, জীবনে এ রকম কোনও সিস্টেম থাকলে ভাল হত। পথের মতো জীবনের জটও ছাড়ানো যেত। বিতান কোথায় যেতে চাইছে? কফি শপে? রুবি মোড় থেকে একটু গেলে গলির মধ্যে ছিমছাম একটা কফি শপ আছে। কয়েক বার দুজনে বসেছে।

বিতান সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, "সিরিয়াস কথা নম্বর এক হল, আজকের ইন্টারভিউতেও ফেল করেছি। নিজের ইচ্ছেতেই ফেল করেছি। ওরা জিজ্ঞেস করল, হায়দরাবাদ বা কোচিতে যেতে রাজি আছি কি না। বললাম, না।"

আহিরী স্টিয়ারিং থেকে মুখ ঘুরিয়ে অবাক গলায় বলল, "কেন? রাজি নও কেন?"

বিতান একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমি গেলে তুমি খুশি হতে?"

আহিরী উত্তেজিত হয়ে বলল, "আমার খুশি হওয়া না হওয়ার কী আছে? চাকরি করতে হলে তো বাইরে যেতেই হবে। এখন ক'টা লোক কলকাতায় বসে আছে? আমাদের মতো যারা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ায় তাদের কথা আলাদা। তাও বাইরের ভাল কোনও ইনস্টিটিউটে চান্স পেলে চলে যাবে।"

বিতান আহিরীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, "তুমিও যাবে?"

boierpathshala.blogspot.com

আহিরী খানিকটা তেড়েফুঁড়ে বলল, “শিয়োর! ইউরোপ বা আমেরিকার কোথাও পড়ানোর চান্স পেলে ছেড়ে দেব? সে রকম হলে ওখানে গিয়ে আবার রিসার্চ করব। আমি তো তোমার মতো কেরিয়ার না করা, গুটিয়ে থাকা মানুষ নই।”

বিতান মৃদু হেসে বলল, “কেরিয়ারের জন্য যোগ্যতা লাগে আহিরী ম্যাডাম।”

যুবভারতী স্টেডিয়ামকে ডান দিকে রেখে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে বাইপাসে উঠল আহিরী। তার রাগ হচ্ছে। কলকাতার বাইরে যেতে হবে বলে ভাল চাকরির সুযোগ কেউ ছেড়ে দেয়!

“তুমি বাইরে যেতে রাজি হলে না কেন?”

বিতান বলল, “বললে বিশ্বাস করবে না।”

সামনের গাড়িটাকে আলোর সিগনাল দিয়ে জায়গা দিতে বলল আহিরী। জায়গা দিচ্ছে না। নিশ্চয়ই গ্লাসে তাকে দেখে নিয়েছে। মেয়েদের গাড়ি চালানো আজও এই শহর পুরো মেনে নিতে পারেনি। অ্যাক্সিলেটরে হালকা চাপ বাড়িয়ে আহিরী বলল, “তাও শুনি!”

বিতান বলল, “আমার এখানে কাজ আছে।”

সামনের গাড়িটার একেবারে গায়ের কাছে চলে গেল আহিরী। হর্ন দিল। লাভ হল না। ইচ্ছে করে যেন তাকে আটকাচ্ছে।

“তোমার কাজ!”

boierpathshala.blogspot.com

বিতান বলল, “বলেছিলাম, বিশ্বাস করবে না। যাই হোক, তোমাকে সেকেন্ড সিরিয়াস কথাটা বলি। আমি এখন যে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিটায় পার্ট টাইম কাজ করছি সেটাও ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”

সামনের গাড়িটাকে ওভারটেক করতে করতে আহিরী দাঁতে দাঁত চেপে বলল, “স্কাউন্ড্রেল!”

বিতান ভুরু তুলে বলল, “কে? আমি তো?”

আহিরী বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল, “ডোন্ট বি ওভারস্মার্ট। গালটা ওই গাড়ির ড্রাইভারের জন্য। যাক, এই কাজটা ছেড়ে দিয়ে ভাল করলে। ফুল বেকার হতে পারলে।”

আহিরীর ব্যঙ্গ বিতান গা করল না। বলল,‘কোম্পানির মালিককে বলেছি, ভোরবেলা ফ্ল্যাটের জানলায় কীভাবে পাখি ডাকবে আমি কাস্টমারদের শোনাতে পারব না স্যার। আপনি বরং আমার জায়গায় কোনও হরবোলাকে রাখুন। ওরা পশুপাখির ডাক ভাল পারবে।’

আহিরী থম্ মেরে গাড়ি চালাতে লাগল। বিতান বলল,‘আমার হাতে আরও একটা সিরিয়াস কথা আছে। এটাই লাস্ট। কথাটা গাড়িতে বলা যাবে না। বলল, “তুমি কি শুনবে?”

আহিরী বলল, “আমি শুনতে চাই না।”

বিতান অল্প হেসে বলল, “তুমি রেগে গেছ আহিরী। আমি চাকরিটা নিলে তুমি খুশি হতে। সেটাই স্বাভাবিক। স্যরি।”

আহিরী সত্যি রেগে গিয়েছে। কিন্তু এতখানি প্রকাশ পেয়ে যাওয়ায় একটু লজ্জা পেল। ছেলেমানুষি হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, “আমার রাগের

boierpathshala.blogspot.com

কী আছে? তুমি নিশ্চয়ই সুবিধে অসুবিধে বুঝেই ডিশিসন নিয়েছ। এ বার বলো, কোথায় তুমি তোমার লাস্ট সিরিয়াস কথাটা বলতে চাও।”

বিতান একটু চুপ করে থেকে বলল, “থাক। এক দিনে অনেক সিরিয়াস কথা বলা হয়ে গেছে। তুমিও অনেক রাগারাগি করলে। পরে কোনও দিন বলব। বরং চলো, আজ তোমাকে কফি বানিয়ে খাওয়াই। গরম কফি খেয়ে মাথা ঠান্ডা করবে।”

গিয়ার বদলে আহিরী অবাক গলায় বলল, “তুমি কফি বানাবে মানে!”

বিতান চোখ বড় করে বলল, “কেন? আমি কফি বানাতে পারি না? শুধু কফি কেন, রান্নাও করতে পারি। সব সময় আমাকে তুমি শুধু আন্ডারএস্টিমেট করে গেলে আহিরী, আর আমার উপর রাগ করে গেলে। টিপিক্যাল মাস্টারনি টাইপ হয়ে যাচ্ছ। সবাইকে ছাত্র হিসেবে দেখছ, ধমক দিচ্ছ, আর জ্ঞান বিতরণ করছ— ভাল করে লেখাপড় করো, ভাল চাকরি পাও, ভাল সংসার করো।”

আহিরী বলল, “কী বলব? লেখাপড়া না করে উচ্ছন্নে যাও?”

বিতান বলল, “আবার ঝগড়া করছ? আমি রোজ খাই কী? ঘাস? নিজের রান্না নিজে করে খাই। তোমাদের মতো তো আমার বাড়িতে কুক নেই।”

আহিরী বলল, “সারপ্রাইজ়িং! আমি তো জানি, তুমি ভাত সেদ্ধ ছাড়া কিছুই পারো না। ও হ্যাঁ, ডিম ভাজতে পারো। আমাকে বলেছিলে।”

বিতান মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, “নিজেকে ডেভেলপ করেছি। সাহস থাকলে চলো, আজ পরীক্ষা হয়ে যাক। আজ আমার বাসস্থানে তোমার ডিনারের নেমন্তন্ন।”

boierpathshala.blogspot.com

আহিরীর ভাল লাগছে। এত ক্ষণে সে সহজ হতে পেরেছে। সত্যি কি সে টিপিক্যাল মাস্টারনি টাইপ হয়ে যাচ্ছে? নিশ্চয়ই হচ্ছে। সারা ক্ষণ ভবিষ্যতের কথা ভাবছে। বিতানের কেরিয়ার নিয়ে ভাবা মানে তো আসলে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়েই ভাবা। বিতান বিতানের মতো। এলোমেলো। কেরিয়ারবিমুখ। সে অল্প নিয়ে থাকতে চায়। তার বিশ্বাস–অবিশ্বাস, ভ্যালুজ় তার মতো। এই মানুষটাকে সে ভালবেসেছে। সেই ভালবাসায় ভবিষ্যতের হিসেব কষা অঙ্ক ছিল না। তা হলে? এত টেনশন কেন? মা ভাল বিয়ের চাপ দিচ্ছে বলে? শুধু কি তা-ই? নিজের খচখচানি নেই? কলেজে পড়াচ্ছে, সমাজে এক ধরনের সম্ভ্রম পাচ্ছে, সে কেমন ছেলের সঙ্গে মিশছে পঁাচ জন দেখবে, তা নিয়েও কি চিন্তিত নয়? শুধু মায়ের চাপের কথা বললে কেন হবে? নিজের ওপর রাগ হল আহিরীর।

বিতান বলল, “কী হল, আমার হাতের প্রিপারেশনে ডিনার করবে তো?”

আহিরী বলল, “সিরিয়াসলি বলছ না কি?”

বিতান বলল, “অবশ্যই। আর একটু গেলেই আমার ফ্ল্যাট। তুমি তো কখনও গিয়ে দেখোনি আমি কেমন ভাবে থাকি। সেটাও দেখে আসবে।”

আহিরী এ বার থতমত খেয়ে খেল। বিতানের সঙ্গে তার ফ্ল্যাটে যাবে? যেখানে বিতান ছাড়া আর কেউ থাকে না। এই প্রস্তাব আগে কখনও বিতান তাকে দেয়নি। যাওয়া ঠিক হবে? আহিরী দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল। না, ঠিক হবে না। যে ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন থাকবে কোনও ঠিক নেই, তার সঙ্গে একা ফ্ল্যাটে সময় কাটানোর কথা ভাবতে তার অস্বস্তি হচ্ছে। অন্য কেউ হলে এই অস্বস্তি হত না। বিতান বলেই হচ্ছে। এই ছেলের সঙ্গে সে মনের দিক থেকে যুক্ত।

boierpathshala.blogspot.com

রুবি পেরিয়ে আরও খানিকটা গিয়ে বঁা পাশে গাড়ি দঁাড় করাল আহিরী। যতটা সম্ভব সুন্দর করে হেসে বলল, “আজ থাক। বাড়িতে চিন্তা করবে। ঘেরাওয়ের ঘটনাটার পর থেকে মা চিন্তা করে।”

বিতান বলল, “ডিনার করতে হবে না। কফি খেয়ে যাও প্লিজ়।”

বাঁ হাতটা বাড়িয়ে বিতানের হাতের উপর রাখল আহিরী। বলল, “আজ নয়। পরে এক দিন।”

বাইরের রাস্তা আলো-ঝলমলে হলেও, গাড়ির ভিতরটা আলো–ছায়া মাখা। বিতান আহিরীর মুখের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে বলল, “পরে এক দিন কি আর সময় হবে আহিরী?” তার পর একটু হেসে, দরজা খুলে বলল, “থাক। তোমারও তো একটা প্রেস্টিজ আছে। চলি। গুড নাইট।”

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ২৪

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

বিতান নেমে যাওয়ার পর আহিরী গাড়ি স্টার্ট দিল। মিনিট পাঁচেক ড্রাইভ করার পরই বুঝল, তার মন খারাপ। খুব মন খারাপ। সে মোবাইল তুলে নম্বর টিপল।

"মা, আমি এক বন্ধুর বাড়িতে কফি খেতে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হবে। আরে না না, ঘেরাও টেরাও নয়... গাড়ি চালাচ্ছি শুনতে পাচ্ছ না? উফ, কার বাড়ি তুমি শুনে কী করবে? আমি কি স্কুলে পড়ি? কার বাড়ি বললে নিশ্চিন্ত হবে? আমাদের এইচওডি চান্দ্রেয়ীদির বাড়ি বললে? খুশি?"

মোবাইল ড্যাশবোর্ডে রেখে আহিরী নিজের মনে বলল, "মহিলার মাথাটা পুরো গেছে।"

সামনের মোড় থেকে গাড়ি ঘোরাল আহিরী।

boierpathshala.blogspot.com

“তুমি শিয়োর?”

সৌহার্দ্য বলল, “হ্যাঁ স্যর।”

কমলেশ রায় স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, “কী ভাবে শিয়োর হলে জানতে পারি?”

সৌহার্দ্য বলল, “স্যর, আমি আগে একটা ফার্মে কাজ করেছি। সেখানে সেম প্রবলেম হয়েছিল। হঠাৎ এক দিন সার্ভার ডাউন হয়ে গেল। সব কম্পিউটার একসঙ্গে ডাউন। ঠিক করার
পর দেখা গেল, অনেক ফাইল ডিলিট হয়ে যাচ্ছে। তার পর পি সি ধরে ধরে চেক করার সময় বিষয়টা ধরা পড়ে।”

কমলেশ বলেন, “কী ধরা পড়ে?”

সৌহার্দ্য শান্ত ভাবে বলে, “ধরা পড়ে ইট ওয়াজ নট আ টেকনিক্যাল ফল্ট স্যার। সিস্টেমে ইচ্ছাকৃত ভাবে ভাইরাস ইনপুট করা হয়েছে।”

কমলেশ ত্রিপাঠীর দিকে তাকালেন। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে সে নার্ভাস। সৌহার্দ্যকে সে–ই জেনারেল ম্যানেজারের কাছে নিয়ে এসেছে। কম্পিউটার সারানোর পর সৌহার্দ্যই তাঁকে ভাইরাসের ঘটনাটা জানায়। বলে, এটা কেউ ইচ্ছে করে করেছে। ত্রিপাঠীর বিশ্বাস হয়নি। এতগুলো মেশিন ইচ্ছে করে শাট ডাউন করা যায় না কি!

সৌহার্দ্য বলল, “কেন যাবে না? ভাইরাস ঢুকিয়ে দিলেই সম্ভব। অফিসের সার্ভার অ্যাফেক্টেড হলেই তো সব কোলাপ্‌স করবে।”

boierpathshala.blogspot.com

ত্রিপাঠী অবিশ্বাসের সুরে বললেন, “ইঞ্জিনিয়ার তো কিছু বলল না! বাইরে থেকে যে এল, সেও...”

সৌহার্দ্য বলল, “কেন বলেনি আমি বলতে পারব না স্যর। মনে হয় ধরতে পারেনি।”

এর পরই ত্রিপাঠী ঘাবড়ে গিয়ে কমলেশ রায়কে ফোন করেন। এই ছেলের কথা তিনি পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারেননি। ক’দিন আগেই সৌহার্দ্য তাদের চমকে দিয়েছে। যে ভুল এত বছরেও কেউ বুঝতে পারেনি, মাত্র ক’দিন এসে তা খুঁজে বের করেছে। একে দুম করে অবিশ্বাস করা মুশকিল। সৌহার্দ্য তাঁর ঘর থেকে চলে যাওয়ারই পরেই তিনি জেনারেল ম্যানেজারকে ফোন করেছেন। সৌহার্দ্যকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ঘরে এসেছেন। সৌহার্দ্য খুব সহজ ভাবেই কথা বলেছে। তার চোখমুখ বলছে, ঘটনা সম্পর্কে সে নিশ্চিত।

কমলেশ রায় বললেন, “ইচ্ছাকৃত ভাবাটা আমাদের বেশি হয়ে যাচ্ছে না তো? বাইরে থেকেও তো ভাইরাস ঢুকতে পারে। সারা পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ।”

ত্রিপাঠী বললেন, “উই ইউজ় লেটেস্ট অ্যান্টি-ভাইরাস সফটওয়্যার, স্যর।”

সৌহার্দ্য বলল, “হতে পারে স্যর। তবে আমার পুরনো অফিসের এক্সপিরিয়েন্স অন্য কথা বলছে। সেখানেও অ্যান্টি-ভাইরাস প্রোটেকশন ছিল। যে কাজটা করেছিল, সে জেনেবুঝেই করেছিল।”

কমলেশ চেয়ারে হেলান দিলেন। সৌহার্দ্য ছেলেটাকে তিনি বোঝার চেষ্টা করছে। ছেলেটা কি তার সঙ্গে কোনও খেলা খেলতে চাইছে? সে কি তার মায়ের সঙ্গে কমলেশ রায়ের রিলেশনের কথা জানে? জানে বলেই প্রথম দিন

boierpathshala.blogspot.com

বাবার নাম জিজ্ঞেস করায় মায়ের নামও জুড়ে দিয়েছিল! বহু দিনের লুকিয়ে থাকা ভুল খুঁজে বার করে নজরে পড়তে চেয়েছে। পড়েছেও। এক লাফে জেনারেল ম্যানেজারের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তার পর কাপ ভেঙে সাবধান করেছে। বুঝিয়ে গিয়েছে, আমি কিন্তু ছাড়ব না। আর আজ এসে বলছে, অফিসে সাবোটাজ হয়েছে! এই পর্যন্ত ভেবে কমলেশ মনে মনে নিজেকে ধমক দিলেন। কী উদ্ভট কথা ভাবছেন তিনি! তাঁর যুক্তিবুদ্ধি কি সব লোপ পেল? সৌহার্দ্য তাঁর কথা জানবে কী করে? তার মা নিশ্চয়ই নিজের ভেঙে যাওয়া প্রেমের গল্প ছেলের কাছে করবে না। ত্রিপাঠীর কথায় ঘোর কাটল কমলেশের।

"স্যর, হোয়াট শুড উই ডু নাউ?"

কমলেশ চিন্তিত ভাবে বললেন, "ভাবতে হবে। সৌহার্দ্য যা বলেছে তা যদি সত্যি হয় সেটা একটা ক্রাইম। মেজর ক্রাইম। ফলে আমাদের আগে মোর দ্যান হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিয়োর হতে হবে। বাইরে থেকে কাউকে এনে স্টাফেদের পি সি চেক করতে গেলে সবারই সন্দেহ হবে। আপত্তিও করতে পারে। একেই কিছু দিন আগেই প্রোডাকশন ম্যানেজার আদিত্য সাহার ঘটনাটা ঘটেছে। আমাদের প্রতিটা স্টেপ ভেবেচিন্তে ফেলতে হবে।"

সৌহার্দ্য বলল, "স্যর, আপনারা যদি অনুমতি দেন আমি এক বার চেষ্টা করতে পারি।"

ত্রিপাঠী অবাক হয়ে বললেন, "তুমি চেষ্টা করবে! কী চেষ্টা করবে?"

সৌহার্দ্য বলল, "স্যর, একটা সময় আমি কম্পিউটার নিয়ে কিছু পড়াশোনা করেছি। নিজের ইন্টারেস্টেই। আমার ধারণা, খুব বেশি সার্চ করতে হবে না। প্রোডাকশন আর অ্যাকাউন্টসের মেশিনগুলো একটু দেখলেই হবে।"

boierpathshala.blogspot.com

কমলেশ বললেন, “কেন?”

সৌহার্দ্য মাথা নামিয়ে বলল, “কেন তা এখনই বলতে পারব না। তবে মনে হচ্ছে।” একটু থেমে সৌহার্দ্য হাসল। বলল, “আমি অবশ্য চাইব, আমার এই সন্দেহ মিথ্যে প্রমাণ হোক।”

কমলেশ ও ত্রিপাঠী মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। বসের ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন ত্রিপাঠী। সৌহার্দ্যকে বললেন, “তোমার কথা শুনলাম। আমরা একটু কথা বলে নিই। দেন উই শ্যাল টেক আ ডিসিশন।”

সৌহার্দ্য উঠে দাঁড়াল। চেয়ার সরিয়ে ওঠার সময় কমলেশ খুব মন দিয়ে নজর করলেন, ছেলেটার বঁা হাতটা ঠিক কোথায় থাকে। সামনে রাখা চায়ের কাপে ধাক্কা মারে কি?

না, সৌহার্দ্য স্বাভাবিক ভাবেই হাত সরিয়েছে। তা হলে সে দিন কী ঘটেছিল? প্রথম দিনের নার্ভাসনেস? এ নার্ভাস হওয়ার মতো ছেলে নয়।

সৌহার্দ্য ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ত্রিপাঠী বললেন, “কী করব স্যর? আমার তো মনে হয় এই ছেলের ওপর ডিপেন্ড না করে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলা উচিত। সে কিছু সাসপেক্ট করছে কি না জানা দরকার।”

কমলেশ ভুরু কুঁচকে বললেন, “অবশ্যই। ত্রিপাঠী, আমার বিশ্বাস, ছেলেটি বেশি বলছে।”

ত্রিপাঠি বললেন, “মোটিভ?”

কমলেশ অস্ফুটে বললেন, “পুরোটা বুঝতে পারছি না। হয়তো কোম্পানির অ্যাটেনশন চাইছে।”

boierpathshala.blogspot.com

ত্রিপাঠী বললেন, “অলরেডি তো কিছুটা পেয়েছে। আজও পেল। অ্যাটেনশন পাওয়ার মতোই ছেলে। ও যা বলছে তা যদি সত্যি হয়...”

কমলেশ বললেন, “এখনই ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলো। দরকারে আমিও বসব। ইট’স আ ভেরি সিরিয়াস ম্যাটার। দেরি করা ঠিক হবে না।”

ত্রিপাঠী চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন, “আমি যোগাযোগ করছি স্যর। মুম্বই থেকে ঘটনার একটা রিপোর্ট চেয়েছে। আমি প্রাইমারি একটা লিখে আপনার মেলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দেখে নিন।”

ঘর ফাঁকা হলে চেয়ারে হেলান দিলেন কমলেশ রায়। কয়েকটা দিনের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা পর পর ঘটে গেল। সৌহার্দ্যর সঙ্গে যোগাযোগ, এত বছর পরে কোথা থেকে যেন ভেসে এল শ্রীকণা, আহির বিয়ের জটিলতা, অফিসের সমস্যা। সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে নবনীর সঙ্গে দূরত্ব। জীবনের এটাই নিয়ম। যখন ঘটনা ঘটতে থাকে তারা আসে পর পর, ঢেউয়ের মতো। খুব দ্রুত ঘটতে থাকে।

শ্রীকণার সঙ্গে সম্পর্কের শেষটুকুও খুব দ্রুত ঘটেছিল। ঘটেছিল, না কি তিনি ঘটাতে বাধ্য হয়েছিলেন?

কমলেশ ইন্টারকমে আর এক কাপ চা চাইলেন। অফিসে সত্যি যদি সাবোটাজ হয়ে থাকে সেটা তাঁর জন্য মোটেও ভাল নয়। কেরিয়ারে একটা খুঁত থেকে যাবে। আর ক’টা দিনই বা কাজ করবেন? হেড অফিস থেকে যতই বলুক, তিনি এ বার এক্সটেনশন নেবেন না। একটাই চিন্তা, বাড়িতে সারা দিন থাকা যাবে না। একটা ইনভল্‌ভমেন্ট খুঁজে নিতে হবে।

boierpathshala.blogspot.com

শ্রীকণার সঙ্গে আলাপ কলেজে। থার্ড ইয়ার তখন। ফার্স্ট ইয়ার আসার পর প্রতি বছরের মতো সে বারও হইহই করে 'ফ্রেশার্স ওয়েলকাম' হল। পড়াশোনায় মনোযোগী ছাত্র কমলেশ এই সবের মধ্যে থাকতেন না। ফাংশনের সময় পিছনে বসে খানিকটা সময় কাটিয়ে পালিয়ে যেতেন। সে বারও তাই প্ল্যান ছিল। এই ফাংশনের একটা মজা ছিল, ফার্স্ট ইয়ারের নতুন ছেলেমেয়েদের জোর করে স্টেজে তুলে দেওয়া। তারা গান, আবৃত্তি, নাচ করবে। না পারলে দুটো কথা বলবে। তাও যদি না চায় শুধু হাত নাড়লেও চলবে। কিন্তু স্টেজে এক বার উঠতেই হবে। সে দিনও এই সব হচ্ছিল। কমলেশ উঠব উঠব করছেন, এমন সময় জড়োসড়ো ভাবে একটি মেয়ে স্টেজে এল। বাকিদের মতোই শাড়ি, আর চুলের বেণীতে ফুলের মালা জড়ানো। এই ধরনের ফাংশনে অল্পবয়সি মেয়েরাও 'বাঙালি' সাজতে খেপে ওঠে। কমলেশ ওঠার আগে মেয়েটির দিকে তাকান। শরীর ঝনঝন করে ওঠে। মেয়েটি যে খুব রূপসি এমন নয়, কিন্তু দুটো চোখে এ কী মায়া! এমন চোখ কমলেশ আগে দেখেননি। মেয়েটি মাথা নিচু করে গান শুরু করল, দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি/ তাই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ, তৃষিত আকুল আঁখি...

উদ্দাম হুল্লোড় নিমেষের জন্য যেন থমকে গেল। কমলেশ গানবাজনা বোঝেন না। মেয়েটি ভাল গাইছে না মন্দ, কোনও ধারণাও তার নেই। কিন্তু এটুকু বুঝলেন, লাজুক, সাধারণ এই মেয়েটিকে পাশে না পেলে তাঁর জীবনটাই অর্থহীন, শূন্য হয়ে যাবে। এই মায়াভরা চোখের দিকের তাকিয়ে তাঁকে সারা জীবন পথ চলতে হবে।

boierpathshala.blogspot.com

যারা প্রেমের পাশ দিয়ে কখনও যায় না এবং পণ করে থাকে, 'আর যাই করি, প্রেমে পড়ে সময় নষ্ট করব না', তারা হঠাৎ প্রেমে পড়লে বিরাট সমস্যা। একটা ঘোর তৈরি হয়। যুক্তি, বুদ্ধি সব লোপ পায়। কমলেশ রায়ের তা-ই হল। মেয়ে হিসেবে শ্রীকণা সত্যি সাধারণ। মধ্যবিত্ত পরিবার, সংসার চলে টেনেটুনে। শ্রীকণার বাবা দুই ছেলেমেয়েকে কষ্ট করে লেখাপড়া শেখাতেন। কোনও উচ্চাশা ছিল না। ছেলে চালিয়ে নেওয়ার মতো একটা চাকরি পাবে, মেয়ের মোটামুটি একটা ঘরে বিয়ে হবে। বুদ্ধিদীপ্ত, লেখাপড়ায় চৌখস, স্বভাব–চরিত্রে ভাল, সুদর্শন একটি তরুণ তার প্রেমে পড়েছে জেনে শ্রীকণা প্রথমটায় যত না অবাক হয়েছিলেন, তার থেকে বেশি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। সেই পর্যায় কেটে যাওয়ার পর তিনিও কমলেশকে আকুল হয়ে ভালবাসতে শুরু করলেন।

শ্রীকণার বাড়িতে জানাজানি হল। খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে নয়, কিন্তু বাবা–মা, এমনকি কাছের কয়েক জন আত্মীয়ও জেনে গেল— এই সাধারণ বাড়ি এক অসাধারণ ছেলেকে পেতে চলেছে। শ্রীকণার বাবা গদগদ হয়ে পড়লেন। মা মাঝে মাঝেই নাকি আনন্দে চোখের জল মুছতেন। মেয়েকে সকাল-বিকেল বিরক্ত করতেন।

"কী রে! আর কত দিন?"

শ্রীকণা বলতেন, "উফ মা, সে কি চার্টার্ড পড়া ছেড়ে বিয়ের পিঁড়িতে লাফ দিয়ে এসে বসবে?"

"তা না। তবে দু'বাড়ির মধ্যে তো একটা পাকা কথা হওয়া দরকার।"

শ্রীকণা বলেতেন, "না, ওরা ঠিক আমাদের মতো ছাপোষা মানুষ নয়। সময় হলে সব করবে। ও তো বাড়িতে বলে রেখেছে।"

boierpathshala.blogspot.com

শ্রীকণার বাবাও মেয়ের কথা সমর্থন করতেন। স্ত্রীকে বলতেন, “ছেলেটাকে লেখাপড়া করতে দাও তো!”

কমলেশ এ সব শ্রীকণার মুখে শুনেছিলেন। মুখে হাসলেও মনে মনে হালকা চিন্তিত হতেন। তত দিনে নিজের উজ্জ্বল কেরিয়ার দেখতে পাচ্ছেন কমলেশ। বুঝতে পারছিলেন, তার জন্য একটা ঝকঝকে জীবন অপেক্ষা করে আছে। তবে শ্রীকণাকে ভালবাসায় কোনও খামতি দেখাননি। শ্রীকণাও উজাড় করে দিয়েছিলেন। যাবতীয় মধ্যবিত্ত ট্যাবু সরিয়ে রেখে কমলেশের শরীরের ভালবাসাও গ্রহণ করেছেন তিনি। সেই মিলনের আগাম কোনও পরিকল্পনা ছিল না। একেবারে হঠাৎই হয়েছিল।

পর্ব ২৫

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

এক শান্ত, নিস্তব্ধ দুপুরে কমলেশ শ্রীকণার বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন। ইংল্যান্ডে ম্যানেজমেন্ট পড়ার দুর্দান্ত সুযোগের খবর জেনেছিলেন সে দিনই। ভেবেছিলেন, শ্রীকণাকে খবরটা দিয়ে চমকে দেবেন। গিয়ে দেখলেন, শ্রীকণা

boierpathshala.blogspot.com

ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই। উত্তরপাড়া না ব্যান্ডেলে আত্মীয়ের বিয়েতে গিয়েছে সবাই।

"তুমি যাওনি?"

শ্রীকণা বলেছিলেন, "ধুস, এখন কোনও অনুষ্ঠানবাড়িতে গেলে কেবল একটাই প্রশ্ন, তোর কবে বিয়ে। কান ঝালাপালা হয়ে যায়। আমি আর কোথাও যাই না। শরীর খারাপ বলে কাটিয়ে দিই।"

"বেশ করো। চট করে কিছু খেতে দাও দেখি। খুব খিদে পেয়েছে। খেতে খেতে তোমাকে একটা দারুণ খবর দেব।"

বাড়িতে তৈরি ঘুগনি আর পাঁউরুটি এনে দিলেন শ্রীকণা। মেনু দেখে মজা পেলেন কমলেশ। ঘুগনি পাঁউরুটি দিয়ে কবে শেষ টিফিন করেছেন মনে পড়ল না। খাওয়া শেষ করে বিদেশে পড়তে যাওয়ার খবরটা দিলেন। শ্রীকণার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আবার ম্লানও হয়ে গেল।

"মন খারাপ হয়ে গেল?"

শ্রীকণা জোর করে হেসে বললেন, "ছি ছি, ভাল খবরে মন খারাপ হবে কেন? কত দিন থাকবে?"

কমলেশ শ্রীকণার হাত ধরে পাশে বসিয়েছিলেন। "যত তাড়াতাড়ি পারি কোর্স শেষ করে চলে আসব। এই সুযোগ খুব কম জনেই পায়।" বলতে বলতে শ্রীকণার হাত ধরেছিলেন।

শ্রীকণা ম্লান হেসে বলেছিলেন, "তুমি তো কম জনের এক জন। এই পড়া এখানে পড়া যেত না?"

boierpathshala.blogspot.com

কমলেশ ভুরু কুঁচকে বিরক্ত গলায় বললেন, “যাবে না কেন? তা হলে ওই দশ জনের এক জন হয়ে থাকতে হবে।”

শ্রীকণা বলল, “ও। আমি তো এত জানি না।”

কমলেশ নিজেকে সামলে নরম গলায় বলেছিলেন, “আমার স্বপ্ন ছিল চার্টার্ড পাশ করার পর বিদেশ থেকেও আরও ডিগ্রি নিয়ে আসব। শ্রীকণা, আমার স্বপ্ন সত্যি হলে তুমি খুশি হবে না?”

শ্রীকণা বলেছিলেন, “আমি খুশি হয়েছি।”

কমলেশ বলেছিলেন, “ওই ভাবে বললে হবে না, হেসে বলতে হবে।”

শ্রীকণা হেসে বলেছিলেন, “আচ্ছা, হেসেই বলছি, আমি ভীষণ ভীষণ খুশি।”

দু’হাতে শ্রীকণার মুখ চেপে ধরে বন্ধ হয়ে যাওয়া চোখের পাতায় চুমু খেয়েছিলেন কমলেশ।

“এই, কী হচ্ছে! ছাড়ো ছাড়ো!” বলতে বলতে গভীর লজ্জা নিয়ে সে দিন আত্মসমর্পণ করেছিলেন শ্রীকণা। ঘরের এক পাশে রাখা সামান্য তক্তপোশের ওপর শ্রীকণাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে কমলেশ অনুভব করেছিলেন, শুধু চোখ নয়, এই মেয়ের সারা শরীর জুড়ে মায়া ছড়িয়ে আছে। অপটু, অনভিজ্ঞ হাতে শ্রীকণাকে আদরে পাগল করে দিতে দিতে কমলেশ সে দিন তাঁর কানে ফিসফিস করে বলেছিলেন, “আমার জন্য অপেক্ষা করবে। যত দেরি হোক, আমার জন্য অপেক্ষা করবে।”

কমলেশের বুকে আঙুল বোলাতে বোলাতে শ্রীকণা বলেছিলেন, “আচ্ছা, আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি না?”

boierpathshala.blogspot.com

কমলেশ বলেছিলেন, “খেপেছ? আমি স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে যাচ্ছি, তুমি কী করবে?”

শ্রীকণা একটু থমকে থেকে বলেছিলেন, “কেন, স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া যায় না?”

কমলেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, “এটা ঠিক নয় শ্রীকণা। কোথায় তুমি বলবে, আমি যেন ভাল করে কোর্সটা শেষ করতে পারি, তা না করে তুমি বিয়ে-টিয়ের মতো পাতি বিষয় নিয়ে ভাবছ।”

“রাগ করছ কেন? মজা করলাম তো।”

কমলেশ শ্রীকণার মুখটা কাছে টেনে এনে বললেন, “বললাম তো অপেক্ষা করবে।”

শ্রীকণা গাঢ় স্বরে বললেন, “সাবধানে থাকবে। মেমসাহেবদের পাল্লায় পড়বে না। আর... আর শুনেছি ও সব জায়গায় সবাই খুব ড্রিংক-ট্রিঙ্ক করে। তুমি কিন্তু একদম না... মাতালে আমার বড্ড ভয়।”

কমলেশ হোহো হেসে উঠে বলেছিলেন, “তুমি কি একশো বছর আগের মানুষ শ্রীকণা?”

টেবিলে চা দিয়ে গিয়েছে। চোখ খুলে, চেয়ারের ব্যাক-রেস্ট থেকে মাথা তুলে কমলেশ হাত বাড়ালেন। চা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। কাপটা সরিয়ে নিজের মনেই হাসলেন কমলেশ। জীবনের অনেক উত্তাপই এ রকম। কখন যে ঠান্ডা হয়ে যায়, বোঝাও যায় না। হঠাৎ এক সময় খেয়াল হয়।

সে দিনের পর থেকেই খটকা শুরু হয়েছিল। বিদেশে পড়া শুরু করেই কমলেশ খুব দ্রুত বুঝতে পেরেছিলেন, বড় ভুল করেছেন। শ্রীকণার মতো শান্ত, অতি সাধারণ মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করা উচিত হয়নি। তিনি যে জীবনে

boierpathshala.blogspot.com

প্রবেশ করতে চলেছেন, সেখানে শ্রীকণা বেমানান। টিফিনের মেনুতে ঘুগনি–পঁাউরুটি, মেমসাহেবদের সঙ্গে না মেলামেশা করা, মদ খাওয়া নিয়ে সেকেলে ভাবনাচিন্তা হয়তো বাইরে থেকে বদলানো যাবে, ভিতর থেকে যাবে না। এটা কি কমলেশ হঠাৎ জানতে পারলেন? নিজেকেই প্রশ্ন করেছিলেন কমলেশ। না, শ্রীকণা যে এক জন সাধারণ মেয়ে, সে কথা তিনি সেই কলেজ-জীবন থেকেই জানতেন। তিনি নিজেও তো অসাধারণ কিছু ছিলেন না। লেখাপড়া, কেরিয়ারের মধ্যে দিয়ে যত একটু একটু এগিয়েছেন, আর পঁাচ জনের থেকে আলাদা হয়েছেন। শ্রীকণার সঙ্গে মেলামেশা করেই বুঝেছেন, টাকাপয়সা, শিক্ষা, রুচিতে দুটো পরিবারে তফাত অনেকটাই। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজনই হয়নি। নিজের পারিবারিক আভিজাত্য, বাবা–মা, দুই দিদির নাক-উঁচু আচরণ তাঁকে হয়তো খানিকটা ক্লান্ত করেছিল। শ্রীকণাকে ভাল লাগার এটাও একটা বড় কারণ। এই মেয়ে সাধারণ মেয়ে। তখন তো ভাবতে হয়নি এই 'সাধারণ মেয়ে'টিকে তরুণ বয়সে ভাল লাগছে ঠিকই, কিন্তু সারা জীবন পাশে নিয়ে চলতে কেমন লাগবে? মায়াভরা দুটো চোখ কখনও অর্থহীন, অসহ্য মনে হবে না তো? এত দিনের ভালবাসা, আবেগ, মুগ্ধতা বিয়ের মতো একটা সামান্য কারণে বিশ্রী কলহ, হিংসা, ডিভোর্সে ভেসে যাবে না তো? যাবেই তো। কমলেশ স্পষ্ট দেখতে পেলেন। জীবন তাঁর ঝকঝকে কেরিয়ারের জন্য বারবার বাধা তৈরি করছে। সে দিন শরীরের ভালবাসায় মেতে 'অপেক্ষা' করতে বলাটা কি ভুল হয়েছে? হতে পারে। মানুষ কি ভুল করে না? সেই ভুল সংশোধনও করে।

কিন্তু কী ভাবে? শ্রীকণাকে এ সব কথা মুখে বলা যাবে না। চিঠি লিখে? না, তাও নয়। এ প্রত্যাখান শ্রীকণা বুঝতে পারবে না। কমলেশ ক'দিন খুব অশান্তির মধ্যে রইলেন। ক্লাসে মন বসল না, রাতে ঘুম হল না।

boierpathshala.blogspot.com

এক ঝিরঝিরে বৃষ্টির বিকেলে হাইড রোডের পাবে বসে বিয়ার খেতে খেতে কমলেশ নিজেকে বোঝালেন, কিছু কিছু সময় জীবনকে কঠিন হতে হয়। চারপাশে অনেকেই ভুল বোঝে, নিন্দে করে। করুক। শ্রীকণা আর তাঁর স্বার্থেই, তিনি শ্রীকণাকে ভুলে যাবেন। ভুলতে হবে। তিনি ভুলতে শুরুও করলেন। যোগাযোগ একেবারে বন্ধ করে দিলেন। দেশে ফিরলেন পাঁচ বছর পর। সঙ্গে দু'বছর ম্যানেজমেন্ট পড়া ডিগ্রি আর তিন বছর বিদেশে চাকরি করার জবরদস্ত সিভি। কলকাতায় নয়, বিমান থেকে কমলেশ নামলেন মুম্বই। সেখানেই বিখ্যাত মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি তাঁকে প্রথম পোস্টিং দেয়। নবনীকে বিয়ে তারও এক বছর পর। ম্যাট্রিমনিতে যোগাযোগ।

মোবাইল বেজে উঠল। কমলেশ রায় চমকে উঠলেন। এত খুঁটিনাটি সব মনে আছে! না কি মস্তিস্ক ভুলে যাওয়া সব কিছু ফিরিয়ে দিচ্ছে আবার? ডিলিট হয়ে যাওয়া ফাইল ফিরে পাওয়ার মতো!

মোবাইলটা বেজেই চলেছে। ক্লান্ত ভাবে কমলেশ ফোন তুললেন। নবনীর ফোন।

১৩

বিতান রান্নাঘরে। টুংটাং, খুটখাট আওয়াজ হচ্ছে। আহিরীকে বলে দিয়েছে, রান্নাঘরে উঁকিঝুঁকি দেওয়া চলবে না।

আহিরী গলায় কৌতুক নিয়ে বলল, "ঠিক আছে যাচ্ছি না। কিন্তু কী বানাচ্ছ জানতে পারি?"

boierpathshala.blogspot.com

বিতান কঁাধ ঝঁাকিয়ে কায়দা করে বলল, “অবশ্যই পারো। কিন্তু সবটা পারো না। সারপ্রাইজ় এলিমেন্ট নষ্ট হয়ে যাবে। আমি তোমার জন্য আজ একটা ইতালিয়ান ডিশ বানাচ্ছি ম্যাডাম।”

আহিরী আঁতকে উঠে বলল, “এই রে! বিতান, সুস্থ ভাবে বাড়ি ফিরতে পারব তো? আমাকে কিন্তু ড্রাইভ করতে হবে।”

বিতান বলল, “দেখেছ, তুমিই আমাকে বলো, সব ব্যাপারে রসিকতা করবে না? বলো কি না?”

আহিরী বলল, “সরি স্যর।”

বিতান বলল, “আমি গান চালিয়ে দিচ্ছি, তুমি শোনো। অনুভবের মিউজিক সিস্টেমটা চমৎকার। ইচ্ছে না থাকলেও আমাকে মাঝে মাঝে চালাতে হয়। অনুভব এসে যদি দেখে না চালিয়ে ওটা বিগড়েছে, বিরাট চেঁচামেচি করবে। হয়তো সারানোর খরচ চেয়ে বসবে।”

ফ্ল্যাটটা সাজানো গোছানো। মালিক যে শৌখিন তা বোঝা যায়। যাকে সে থাকতে দিয়েছে, সেও যত্ন করেই রেখেছে। ড্রইংরুমটা বেশ। সোফা ছাড়াও নিচু ডিভান রয়েছে। ডিভানের ওপর কুশন। আহিরী কোলের ওপর একটা কুশন নিয়ে ডিভানে পা তুলে বসেছে। বসেছে আরাম করে, কিন্তু অস্বস্তিও হচ্ছে। সকাল থেকে এক শাড়ি–জামায় রয়েছে, এই জন্য অস্বস্তি। শাড়িটা সুন্দর। কটন কোটা, গোলাপি-কালো কম্বিনেশন। আজ কলেজে কয়েক জন কলিগ প্রশংসা করেছে। করিডরে কয়েক জন ছাত্রীও বলল, “ম্যাম, ইউ আর লুকিং গর্জাস।”

boierpathshala.blogspot.com

আহিরী হেসে বলেছে, “থ্যাঙ্কু। রেজাল্ট ভাল হলে তোমাদেরও এ রকম গর্জাস লাগবে।”

সাজগোজে আলাদা করে বিরাট মন না দিলেও কলেজে আসার সময় শাড়িটা বেছেই পরে আহিরী। ফ্যাশনের জন্য নয়, রুচিশীল আর এনার্জেটিক দেখানোর জন্য। সে বিশ্বাস করে, এক জন শিক্ষককে কখনওই ক্লান্ত, বিষণ্ণ দেখানো উচিত নয়। তাকে যত ঝলমলে দেখাবে, ছেলেমেয়েরাও তত নিজেদের একঘেয়েমি ঝেড়ে ফেলতে পারবে। এই ব্যাপারটা নিয়ে আজও কোনও কোনও শিক্ষক-শিক্ষিকার নাক-কোঁচকানো ভাব আছে। আহিরী তর্কও করেছে। একটা সময় ছিল, শিক্ষকরা যেমন-তেমন পোশাক পরে কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে আসতেন। পুরুষরা কাঁধে তাপ্পি দেওয়া ব্যাগ, এক মুখ দাড়ি, ময়লা জামাকাপড়ে ক্লাস নিতেন। মহিলারা সাদা শাড়ি, হাতখোঁপা, হাতে গাদাখানেক বইয়ে ছিলেন স্বচ্ছন্দ। সময় বদলেছে। যে ছেলেমেয়েরা বাইরে ঝলমলে জীবন দেখছে তারা লেখাপড়ার জগৎটাকে বিবর্ণ দেখবে কেন? কেন তাদের মনে হবে লেখাপড়া নিয়ে থাকা মানে ময়লা পোশাক, তাপ্পি দেওয়া ব্যাগ? তখন বেতন কম ছিল, এখন তো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা গাড়ি চড়ছে। ভাল ফ্ল্যাট কিনছে। পোশাক ফিটফাট থাকতে সমস্যা কোথায়? এই বিশ্বাসেই কলেজে যাওয়ার আগে নিজের সাজপোশাকে একটু হলেও খেয়াল রাখে আহিরী।

আহিরীর মনে হচ্ছে, স্নান করতে পারলে হত। বিতানকে দেখে হিংসে হচ্ছে। সে একটা কালো রঙের ক্যাজুয়াল ট্রাউজার পরেছে। গায়ে লাল টি-শার্ট। আর সে কিনা বসে আছে জবুথবু হয়ে, সারা দিনের ঘাম আর ধুলো মেখে। বিচ্ছিরি!

boierpathshala.blogspot.com

মিউজিক সিস্টেম চালু করে দিয়ে গিয়েছে বিতান। পেন ড্রাইভে গান বাজছে। কারপেন্টার্সের 'টপ অব দ্য ওয়ার্ল্ড'। আহিরীর খুব প্রিয় গান। বিতান জানল কী করে? গাড়িতে শুনেছে নিশ্চয়ই।

আহিরী ভেবেছিল, বেল টিপে বিতানকে চমকে দেবে। যদিও সে ফ্ল্যাটের নম্বর জানে না। তাতে কী? ঠিক জেনে নেওয়া যাবে। জানা হল না। গেটে সিকিয়োরিটি আটকে দিল। বিতান মুখোপাধ্যায়ের নাম বলে লাভ হল না। ফ্ল্যাটের নম্বর চাই। যাওয়ার অনুমতিও চাই। আহিরী বাধ্য হয়ে বিতানকে ফোন করল। বিতান ফোন ধরল তিন বার বাজার পর।

"কী হয়েছে?"

আহিরী বলল, "বড় বিপদ হয়েছে। তুমি ভিআইপি হয়ে গেছ।"

বিতান অবাক হয়ে বলল, "মানে!"

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ২৬

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

তোমার ফ্ল্যাটের গেটে দাঁড়িয়ে আছি। পারমিশন ছাড়া ভিআইপির ফ্ল্যাটে যেতে অ্যালাও করছে না। আটকে দিয়েছে। এসে উদ্ধার করো।”

বিতান চিৎকার করে বলল, “তুমি... তুমি এসেছ আহিরী? এক মিনিট দাঁড়াও আমি আটতলা থেকে লাফ দিচ্ছি।”

আহিরী প্রতিজ্ঞা করেছে, বিতানের ফ্ল্যাটে সে কিছুতেই এমন আচরণ করবে না যাতে বিতানের মন খারাপ হয়ে যায়। তাকে যেন একজন খিটখিটে মাস্টারনি মনে না হয়, যার একটাই কাজ, সবাইকে নিজের ছাত্রছাত্রী ভেবে জ্ঞান দেওয়া। সত্যি তার ভাবনাচিন্তা কেমন বুড়িয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ নিয়ে এত ভাবার কী হয়েছে? মা বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে বলে? না কি বিতান ফাইনাল কিছু বলছে না তাই? যা খুশি হোক। এখন এ সব গোল্লায় যাক। আজ শুধু একটাই কাজ, বিতানের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করা। বড্ড বকাবকি করা হয়ে

boierpathshala.blogspot.com

গেছে। ছেলেটা এমনিতেই চাপে থাকে, তার উপর সেও যদি চাপ দেয়, বেচারি যায় কোথায়?

এক মিনিট না হোক, বিতান খুব তাড়াতাড়ি এসে হাজির হল। তখনও তার চোখ ছানাবড়া হয়ে আছে। গাড়ি পার্ক করিয়ে, লিফটে করে নিজের ফ্ল্যাটে এসেও বিতানের যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না, আহিরী এসেছে।

আরাম করে বসার জন্য আহিরী সোফার বদলে ডিভানটাই বাছল।

"হাঁ করে দেখছো কী? যাও কী সব রান্না করবে করো। আমার তো হেভি খিদে পেয়েছে। সেই জন্যই তো গাড়ি ঘুরিয়ে চলে এলাম।"

বিতান থতমত গলায় বলল, "আমার মাইরি বিশ্বাস হচ্ছে না। সত্যি এটা তুমি তো!"

আহিরী বলল, "তোমাকে মাইরি বিশ্বাস করতে হবে না। তুমি খাবারের ব্যবস্থা করো।"

বিতান চোখ বড় করে বলল, "এ কী! আহিরী তুমিও স্ল্যাং ইউজ় করছ!"

আহিরী ডিভানে বসে পা দোলাতে দোলাতে বলল, "আরও জানি। শুনবে? ভাবো কী? আমি স্টুডেন্ট ক্যান্টিনে আড্ডা মারা প্রফেসর। চাইলে তোমাকেও ঝক্কাস কয়েকটা শিখিয়ে দিতে পারি। আচ্ছা বলো তো..."

বিতান ঘাবড়ে যাওয়ার অভিনয় করে বলল, "ওরে বাবা, থাক থাক। বলতে হবে না। অত সহ্য হবে না।"

আহিরী হাসতে হাসতে বলল, "ছেড়ে দিলাম।"

boierpathshala.blogspot.com

বিতান ভুরু কুঁচকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে বলল, “কী ব্যাপার বলো তো আহিরী, এইটুকু সময়ের মধ্যে এতটা বদলে গেলে! এত ক্ষণ ধমকধামকের ওপর ছিলে, পারলে কান ধরে ওঠবস করিয়ে ফেলো, এখন কমপ্লিটলি চেঞ্জড!”

আহিরী একটা উদাসীন ভাব দেখিয়ে বলল, “তাতে কী হয়েছে? বদলের জন্য কি অনেক বেশি সময় লাগে? কুঁড়ি থেকে ফুল হতে কত ক্ষণ লাগে? মোমেন্টস? দুম করে কোন মুহূর্তে ফুটে যায়। গৌতম বুদ্ধ গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কত সময় ধরে? বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলেন জ্যোৎস্নায় চারপাশ ভেসে যাচ্ছে। ব্যস, মনে হল, সংসার অসার। তিনি বেরিয়ে পড়লেন। তার পর ধরো... গাছ থেকে আপেল পড়তেই নিউটন ‘ইউরেকা’ বলে লাফ দিয়েছিলেন। কত সময় লেগেছিল?”

বিতান চোখ গোল গোল করে বলল, “বাপ রে, তুমি তো দেখছি নাটকের ডায়লগও দিচ্ছ!”

মিউজিক সিস্টেমে নিচু গলায় গান বাজছে—‘সাচ আ ফিলিং কামিং ওভার মি/ দেয়ার ইজ় ওয়ান্ডার ইন মোস্ট এভরিথিং আই সি/ নট আ ক্লাউড ইন দ্য স্কাই, গট দ্য সান ইন মাই আইজ়/ অ্যান্ড আই ওন্ট বি সারপ্রাইজ়ড ইফ ইট্‌স আ ড্রিম।’

সত্যি খানিকটা যেন স্বপ্নের মতো লাগছে আহিরীর। খুব ভাল লাগছে। ভাগ্যিস এসেছে! নইলে আজকের গোটা দিনটাই তেতো হয়ে থাকত। বিতানের ওপর শুধু রাগই হত। মনে হত, ছেলেটা স্বার্থপর। তার কথা একটুও ভাবছে না। রাগ হত নিজের ওপরেও। ছেলেটাকে শুধু বকঝকাই করে। তার সমস্যা বোঝার চেষ্টা করে না। বিয়ে করবে বলে তো বিতান তার সঙ্গে মিশতে শুরু

boierpathshala.blogspot.com

করেনি। সেও করেনি। টাকা ফেরত দেওয়ার ছুতো করে কলেজে প্রথম যে দিন এসেছিল বিতান, সেই রাতেই তাকে হোয়াটসঅ্যাপ করেছিল আহিরী।

“সে দিন পাখির ছবি কী তুলেছিলেন? দেখাবেন না?”

একটু পরে বিতান লিখে পাঠাল, “দেখানোর কোনও চান্স নেই, পাখি সব উড়ে গেছে।”

আহিরী লিখল, “মানে!”

“ছবি পছন্দ হয়নি। ক্যামেরা থেকে মুছে দিয়েছি।”

“অন্যায় করেছেন। কিছু ছবি নিশ্চয়ই ভাল হয়েছিল।”

“না হয়নি। পাখিদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ওরা বলেছে, এর পর ওদের কাছে মোবাইল দিয়ে দিলেই হবে। ওরা সেলফি তুলে পাঠিয়ে দেবে। সে ছবি ঢের ভাল হবে। তখন আপনাকে দেখাব।”

আহিরী মুচকি হেসে লিখল, “অবশ্যই দেখাবেন। মানুষের সেলফি দেখে দেখে ক্লান্ত। এ বার পাখিদের সেলফি দেখতে চাই। শুধু বলে দেবেন, ওরা যেন আকাশে ওড়ার সময় ফোটো তোলে।”

এর কিছু ক্ষণ বাদে বিতান একটা ফোটো পাঠিয়েছিল। বকের মতো একটা সাদা পাখি ঝিলের জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে। মুখ আর ঠোঁটটা লাল। ঘাড় এক পাশে কাত করে দার্শনিক একটা ভাব নিয়ে বসে আছে। খানিকটা উদাসীনও।

ছবির তলায় বিতান লিখেছিল, “এটা আমার সেলফি। এই মাইগ্রেটরি বার্ডটি বরফের দেশ সাইবেরিয়া থেকে এসেছে। আবার ফিরে যাবে।”

boierpathshala.blogspot.com

খুব মজা পেয়েছিল আহিরী। এক জন বুদ্ধিমান রসিক মানুষের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। যে মানুষটার কোনও ভান নেই। এই ভাললাগাটাই ধীরে ধীরে 'ভালবাসা' হয়ে গিয়েছে।

বিতান একটা কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকল।

"বোর হচ্ছ না তো? আর একটু ওয়েট করো। তার পরই গরম গরম সার্ভ করব।"

আহিরী বলল, "দেখো, এমন গরম খাবার দিয়ো না যাতে তোমার মুখ পোড়ে। তার আগে অনুগ্রহ করে ওয়াশরুমটা দেখিয়ে দাও। অনেক ক্ষণ থেকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি। হাতমুখ না ধুয়ে আর পারছি না। নতুন সাবান আছে?"

বিতান শশব্যস্ত হয়ে বলল, "ওহো স্যরি। আমার আগেই দেখিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। নো চিন্তা, একেবারে প্যাকেট ছিঁড়ে সাবান দিচ্ছি।"

আহিরী উঠে পড়ে বলল, "ঘরদোর এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ কী করে?"

বিতান হাত উল্টে বলল, "আমাকে কিছু করতে হয় না। লোকজন আছে। অনুভব দূর থেকে কন্ট্রোল করে। তবে আমার আর ভাল লাগছে না। এখান থেকে চলে যাব ঠিক করেছি। অনুভবকেও বলেছি।"

ড্রয়িংরুম লাগোয়া ঘরে ঢুকে আলো জ্বালাল বিতান। ভিতরে পা রেখে একটু থমকাল আহিরী। এই ঘরটা অগোছালো। বিছানা এলোমেলো। এক পাশে জামাকাপড় ডঁাই করে ফেলে রাখা। বেডসাইড টেবিলে বইপত্র, ছাই-ভর্তি অ্যাশট্রে। একটা ব্যাচেলর-ব্যাচেলর ভাব। ঘরের গন্ধটাও কেমন যেন পুরুষমানুষের শরীরের গন্ধের মতো। সিগারেট, ঘাম, আফটারশেভ লোশন

boierpathshala.blogspot.com

মিশলে যেমন হয়। এই অগোছালো ঘরটা বেশি পছন্দ হল আহিরীর। বিতানের চরিত্রের সঙ্গে যায়। মাপে ছোট এই যা। তা হোক।

বিতান তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে খাটের জামাকাপড় সরাতে গেল। লজ্জা পাওয়ার হাসি হেসে বলল, "এই সবই কাচা হয়েছে। ভাঁজ করে রাখতে পারেনি।"

আহিরী হাত তুলে বলল, "থাক। ভাল লাগছে। যাই বলো এই ঘরটা আমার বেশি পছন্দ।"

বিতান বলল, "মাস্টার বেডরুমটা খুব টিপটপ করে সাজানো। ওটা তালা মেরে রেখেছি। অনুভবকে বলে দিয়েছি, ওই ঘরে শুলে আমার ঘুম হবে না। আমি গেস্ট রুমেই থাকব। তুই যদি চাপাচাপি করিস পালাব। ও আর কিছু বলেনি। তবে আমি এমনিই এ বাড়ি ছেড়ে দেব।"

আহিরী কিছু একটা বলতে গিয়ে চুপ করে গেল। এখন এ সব কথা ভাল লাগছে না। তার ভিতরটা কেমন ফুরফুরে লাগছে। সে বলল, "সে যখন ছাড়বে দেখা যাবে। এখন তো ছাড়ছ না। এ বার ঘর থেকে ভাগো দেখি। ওইটা ওয়াশরুম তো? ফ্রেশ টাওয়েল আছে?"

বিতান হকচকিয়ে বলল, "টাওয়েল! টাওয়েল দিয়ে কী হবে?"

আহিরী ফিক করে হেসে বলল, "তোমার মুখে চাপা দিয়ে খুন করব।" তার পর চোখ বড় করে শাসানির ভঙ্গিতে বলল, "টাওয়াল দিতে বলেছি দাও। হাতমুখ মুছব কী দিয়ে? শাড়ির আঁচল দিয়ে?"

বিতান বিছানায় রাখা কাপড়চোপড়ের স্তূপ ঘেঁটে সত্যি একটা কাচা তোয়ালে বার করে ফেলল। আলমারির তাক থেকে একটা নতুন সাবানও দিল।

boierpathshala.blogspot.com

“বাহ্, তুমি তো দেখছি বেশ সংসারী! গুডবয়।”

বিতান বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘরের দরজায় লক লাগিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল আহিরী। ছোট বাথরুম কিন্তু পরিচ্ছন্ন। বেসিনের কল খুলে হাত পেতে দিল। আহ্, কী আরাম! এক মুহূর্ত ভাবল আহিরী, তার পর দ্রুতহাতে শাড়ি-জামা খুলে বাথরুমের আধখোলা দরজা দিয়ে ছুড়ে দিল ঘরের খাটে।

নগ্ন হয়ে শাওয়ারের তলায় মাথা বঁাচিয়ে দঁাড়াল আহিরী। চুল যেন না ভেজে। আহ্, কী শান্তি! সারা দিনের ক্লান্তি, বিরক্তি, অভিমান ধু্য়ে যেতে লাগল জলের ধারায়। আহিরী গুনগুন করে গাইতে লাগল, ‘অ্যান্ড দি ওনলি এক্সপ্ল্যানেশন আই ক্যান ফাইন্ড... ইয়োর লাভ পুট মি অ্যাট দ্য টপ অব দ্য ওয়র্ল্ড...’

শাওয়ার বন্ধ করে গা মুছতে মুছতে আহিরী নিজের মনেই অবাক হল। সত্যি সে বদলে গেল না কি? এই প্রথম সে বিতানের সঙ্গে কোনও বাড়িতে একা আছে, অথচ মনে হচ্ছে, এই বাড়িতে সে আর বিতান বহু কাল ধরে থাকে। একসঙ্গে খায়, গল্প করে। ভালবাসে, ঝগড়া করে। ইমোশনকে সে চিরকাল নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। আবেগ কেউ যেন দেখে না ফেলে। বুদ্ধিমতী মেয়ে হওয়ার এটাই সমস্যা। প্রেম করার জন্য কত পুরুষ যে হঁাকপাক করেছে তার ঠিক নেই। এখনও করে। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপে রোজই কেউ না কেউ প্রেম নিবেদন করছে। বিবাহিত, অবিবাহিত দুই–ই আছে। এদের মধ্যে কিছু আছে যারা ‘প্রেম– প্রেম’ বলে কান্নাকাটি করে, আসলে সেক্স চায়। ফঁাদে ফেলে যদি দেখা করা যায়। আবার কেউ কেউ আছে, সত্যি প্রেমে কাতর। একটা সময় মাথা গরম হয়ে যেত। ফোন করলে ধমকাত, আর বিরক্ত করলে ‘থানায় যাব’ বলে ভয় দেখিয়েছে। এখন আর এ সব গায়ে লাগে না। বিতান

boierpathshala.blogspot.com

সবটার দখল নিয়েছে। এক দিন সে ফোন না করলে আহিরীর মন খারাপ হয়ে যায়। তবে চট করে সে প্রকাশ করে না। ভালবাসার মানুষের উপরে রাগ অভিমান খুব জটিল ব্যাপার। তারা যে কখন কী করবে বোঝা যায় না।

তোয়ালে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল আহিরী। নিজের পোশাকের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে থমকে গেল। মুচকি হাসল একটু। বিতানকে চমকে দিলে কেমন হয়? বড় রসিকতা-করিয়ে এ বার তার রসিকতা দেখে কুপোকাত হয়ে যাক। খাটের উপরে পড়ে থাকা নিজের শাড়ি, জামা, অন্তর্বাস থেকে হাত সরিয়ে নিল আহিরী।

বিতান হাতে ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। ঘেমেনেয়ে একসা। ঘরে ঢুকেই সে চমকে উঠল। ডিভানে এটা কে বসে আছে!

“এ কী! আহিরী... তুমি!”

আহিরী হাতের ম্যাগাজিনটা সরিয়ে রেখে গম্ভীর ভাবে বলল, “না আমি নই, তুমি।”

বিতান থতমত গলায় বলল, “এ সব কী পরেছ!”

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ২৭

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র।

আহিরী মাথার চুল বাঁচিয়ে গা ধুয়েছে, তার পরেও কিছুটা জল লেগেছে। সেই জল ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "নিজের জামাকাপড় চিনতে পারছ না? একে বলে ট্র্যাক প্যান্ট, আর এটা একটা ফুল স্লিভ শার্ট। তোমার জামাকাপড়ের স্তূপ থেকে বের করলাম। চোখগুলো অমন গোল গোল হয়ে গেল কেন? মনে হচ্ছে ধপাস করে পড়ে যাবে।"

বিতান একই রকম অবাক হওয়া গলায় বলল, "এ সব কখন পরলে?"

"কখন পরেছি তাতে তোমার কী? ঘড়ি ধরে জামাপ্যান্টের ভাড়া আদায় করবে না কি?"

বিতান কথা গুলিয়ে বলল, "না, তা নয়...।"

আহিরী কড়া গলায় বলল, "তোমার এখানে অন্য কারও স্নান করা বারণ? বন্ধু বকবে?"

boierpathshala.blogspot.com

বিতান জিভ কেটে বলল, “তা কেন? ভাল করেছ। বেশ করেছ। আসলে এই ড্রেসে তো তোমাকে কখনও দেখিনি, তাই চমকে গেছি।”

আহিরী হেসে বলল, “রসিকতাসম্রাট, এত ঘাবড়াবেন না। মনে রাখবেন, রসিকতা আমিও জানি। অনেক ক্ষণ ধরেই মনটা স্নান-স্নান করছিল। ওয়াশরুমে ঢুকে শাওয়ারটা দিলাম খুলে। গা ধোওয়ার পর মনে হল, শাড়ির ভারে জবুথবু হয়ে না থেকে হালকা কিছু পরি। কিছু ক্ষণ তো এখানে আছি। দেখলাম, তোমার জামাপ্যান্টই বেস্ট। কেমন লাগছে আমাকে?”

বিতান এক পা পিছিয়ে, ভুরু কুঁচকে, এ পাশ- ও পাশ ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, “হলিউডি মুভির কোনও নায়িকার মতো। সিক্সটিজ়ের কোনও এক জন... গ্রেস কেলি? অড্রে হেপবার্ন? মেরিলিন মনরো? চিন্তায় ফেললে। কোন জন, ঠিক ধরতে পারছি না। দাঁড়াও বলছি। আর একটু দেখতে হবে।”

আহিরী দু’হাতে বিতানের গলা চেপে ধরল।

“একদম খুন করে ফেলব। আমার রূপ নিয়ে ঠাট্টা? জানো, এই রূপের জন্য দেশে-বিদেশে কত লোক পাগল!”

বিতান কান্নার অভিনয় করে বলল, “মরে যাব... মরে যাব। ট্রে উল্টে পড়বে।”

আহিরী বলল, “পড়ুক। আগে স্যরি বলো।”

বিতান বলল, “স্যরি, স্যরি, স্যরি।”

আহিরী হেসে, গলা ছেড়ে, ডান হাত দিয়ে বিতানের নাক নেড়ে দিয়ে বলল, “গুড বয়। দাও এ বার কী করেছ। খিদে ডবল হয়ে গেছে।”

boierpathshala.blogspot.com

ডিভানের উপরেই ট্রে রাখল বিতান। দুটো বড় বড় মেলামাইনের বাটি। চামচও দেওয়া আছে।

“এই নাও, ইতালিয়ান ডিশ। দ্য গ্র্যান্ড পাস্তা।”

আহিরী বাটি হাতে নিয়ে চোখ বড় করে বলল, “এই তোমার রান্না!”

বিতান বলল, “অবশ্যই। ঠিকমতো পাস্তা রান্না করা কম খাটুনি না কি? তোমাদের ভাত আর মাছের ঝোলের থেকে মোটেই কম নয়। আমি তো বেশির ভাগ দিনই এতেই লাঞ্চ সারি। চিজ, দুধের পরিমাণ ঠিকমতো হয়েছে কি না দেখো। তুমি খাবে তাই নার্ভাস হয়ে বানিয়েছি।”

আহিরী উৎসাহে চামচে করে তুলে একটু মুখে দিল। তার পর চোখ বঁুজে বলল, “ফ্যান্টাস্টিক!”

বিতান খুশি-খুশি গলায় বলল, “এই জন্যই বলছি, চিন্তা কোরো না। চাকরি-বাকরি না পোষালে একটা রেস্টুরেন্ট খুলব। কলকাতা এখন সিটি অব রেস্টুরেন্টস। সেই সিটিতেই ঠঁাই হবে মোর।”

আহিরী হাসি-হাসি মুখে খেতে লাগল। নুন কম হয়েছে। রসুনকুচিও আর একটু দেওয়া দরকার ছিল। কিন্তু সে সমালোচনার মধ্যে গেল না। বিতানের খুশির কাছে এই সব অতি তুচ্ছ। শুধু বিতান কেন, সে নিজেও খুব খুশি। আজ না এলে অনেক ভাললাগা মিস হত। কম বয়সে প্রেম করা হয়নি। প্রেম যখন হল, তখন অনেকটা পরিণত হয়ে গিয়েছে সে। ফলে প্রেমের হইহই ব্যাপারটা পাওয়া হয়নি। আজ সে তার স্বাদ পাচ্ছে। বিতানের ভিতরের এই ছেলেমানুষটাকে দেখা হত না। শুধু কি বিতানের ছেলেমানুষি? সে নিজেও তো ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছে!

boierpathshala.blogspot.com

“আজ না এলে এই চমৎকার খাওয়াটা মিস করে যেতাম বিতান। বাড়িতে ফোন করে বলে দিচ্ছি— ডিনার অফ।”

বিতান বলল, “দূর, এখন তো মোটে সাতটা। একটু পরেই খিদে পাবে। জানো আহিরী, সত্যি সত্যি ভাবছি বিজ়নেস করব। কারও আন্ডারে চাকরি-টাকরি করা আমার পোষাবে না।”

আহিরী খুব সহজ ভাবে বলল, “রেস্টুরেন্ট খুলবে?”

“না না, ও তো মজা করলাম। অত টাকাপয়সা কোথায়? অন্য কিছু ভাবতে হবে।”

আহিরী খাওয়া শেষ করে বাটি-চামচ নামিয়ে বলল, “ও সব পরে ভেবো। তোমার রান্নায় যদি নম্বর দেওয়ার কোনও স্কোপ থাকত, তা হলে আমি অনেক নম্বর দিতাম।”

বিতান কুর্নিশ করার ভঙ্গি করে বলল, “এ বার কফি হবে জঁাহাপনা!”

বিতান কফি করতে গেলে আহিরী উঠে জানালার ধারে দঁাড়াল। কাচের বড় বড় দুটো জানলা। বাইরে আকাশ ভরা তারা। নীচ দিয়ে বাইপাস ছুটছে। গাড়ির হেডলাইট আলোর মালা তৈরি করেছে। দূরের আকাশছোঁয়া বাড়িগুলোতে বিন্দু বিন্দু আলোর ফোঁটা। কাচ সরাতে হুড়মুড় করে খানিকটা ঠান্ডা হাওয়া ঢুকে পড়ল ঘরে। আহিরীর চুল এলোমেলো করে দিল।

“এই নাও।”

বিতান কখন পাশে এসে দঁাড়িয়েছে, বুঝতে পারেনি আহিরী। তার হাত থেকে কফির মগ নিয়ে আহিরী নিচু গলায় বলল, “এই জায়গাটা ভীষণ সুন্দর। এখান থেকে বাইরেটা দেখতে এত ভাল লাগছে!”

boierpathshala.blogspot.com

বিতান হেসে বলল, “আরও সুন্দর করে দেব?”

আহিরী কৌতূহল নিয়ে তাকাল। বিতান ঘরের লাইটগুলো নিভিয়ে দিয়ে মিউজ়িক সিস্টেমে গান চালাল। গমগমে পুরুষকণ্ঠ গেয়ে উঠল— ‘আই লাভ ইউ বিকজ় ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, ডিয়ার...’

আহিরীর পাশে এসে দাঁড়াল বিতান। নিচু গলায় বলল, “জিম রিভস গাইছেন।”

সত্যি জায়গাটা আরও সুন্দর হয়ে গেল। আহিরীর এ বার মনে হচ্ছে, সে আকাশেই দাঁড়িয়ে আছে। সে কেমন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেল।

বিতান গাঢ় স্বরে বলল, “তোমাকে আজ খুব সুন্দর লাগছে আহিরী।”

আহিরী জানালায় হাত রেখে বলল, “বকাঝকা করছি না বলে?”

বিতান বলল, “সেটা এক রকম সুন্দর। এটা আর এক রকম।”

আহিরী হেসে ফিসফিস করে বলল, “ও, বুঝেছি। তোমার পোশাক পরেছি তাই।”

বিতান বাইরের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক গলায় বলল, “মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে। আমার সঙ্গে দেখা হয়ে তোমার কষ্টই বাড়ছে। কত ভাল ছেলের সঙ্গে তোমার দেখা হতে পারত। হবেও, আহিরী। সে তার বন্ধুর নয়, নিজের ফ্ল্যাট থেকেই তোমাকে এমন সুন্দর একটা আকাশ দেখাবে। আমাকে ভুলে যাও আহিরী। আমার অনেক গোলমাল। অনেক ভুল। তোমার পাশে আমাকে মানায় না।”

boierpathshala.blogspot.com

আহিরী দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে বিতানের ঠোঁটের উপরে হাত রাখল। বলল, “চুপ, একদম চুপ। আর এক বার এ সব বললে খুন করে ফেলব।”

বিতান আহিরীর হাত ধরে ফিসফিস করে বলল, “এটাই তো সত্যি আহিরী। জীবন সম্পর্কে আমার ভাবনা যে একেবারে ছন্নছাড়া। তোমাদের সুরের সঙ্গে তা মিলবে না। তোমাদের পরিচিতজনের কাছে বলার মতো কোনও পরিচয় আমার নেই। কেউ যখন বলে তোমার সঙ্গে আমাকে দেখেছে, সঙ্কোচে মরি। তোমার কথা ভেবে গুটিয়ে যাই। আমাকে ভুলে যেতে হবে তোমায়।”

আহিরী এগিয়ে গিয়ে তার দুটো হাত বিতানের দুই কাঁধে রাখল। তার পর নিজের ঠোঁট দুটো চেপে ধরল বিতানের ঠোঁটের ওপর। এক সময় মুখ তুলে অস্ফুটে বলল, “আমাকে তোমার অগোছালো ঘরে নিয়ে চলো বিতান। প্লিজ নিয়ে চলো।”

বিতান আহিরীকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল।

১৪

শ্রীকণার শরীর ভাল নেই।

সকালে বাথরুম থেকে বেরোনোর সময় মাথা ঘুরে গেল। তিনি দরজা ধরে নিজেকে সামলেছেন। টলমলে পায়ে ঘরে এসে খাটের ওপর কিছু ক্ষণ বসে রইলেন। ধীরে ধীরে শরীরটা ঠিক হল। তার পরেই উঠে পড়েছেন। অনেক কাজ। যতই লোক থাকুক, তাদের বলে না দিলে ঠিকমতো কিছু করে না।

boierpathshala.blogspot.com

কলকাতায় আসার পর সৌহার্দ্য এক জন এক জন করে হেল্পিং হ্যান্ড বাড়িয়েছে। শ্রীকণা বারণ করলে শোনেনি।

“অনেক করেছ, আর নয়।”

শ্রীকণা বলেছিলেন, “দুটো তো মোটে মানুষ, রান্নাটা তো অন্তত আমাকে করতে দিবি। তার মধ্যে তুই তো বেশির ভাগ দিনই আবার বাড়িতে খাস না। রান্নার জন্য লোক রেখে কী হবে?”

সৌহার্দ্য বলেছে, “অনেক হেঁশেল ঠেলা হয়েছে মা। তোমার জীবন থেকে ওই ফেজ় এখন গন। এখন থেকে তুমি শুধু ইনস্ট্রাকশন দেবে আর এক একটা স্পেশাল ডিশ বানিয়ে আমাকে খাওয়াবে।”

সকালের এই সময়টায় শুয়ে থাকলে চলে না। তা ছাড়া শুয়ে থাকলেই সৌহার্দ্যর সন্দেহ হবে। শরীর খারাপ, বুঝলেই জোর করে শুইয়ে রাখবে। মাথাই তুলতে দেবে না। মায়ের কিছু একটা হলে বড্ড খেপামি করে ছেলেটা। শ্রীকণা অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।

“তুই বাইরে থাকলে কী হত? আমার অসুখ করত না? না কি আমি মরে যেতাম?”

সৌহার্দ্য বলে, “মা, আমি তো বলেছি, যেখানে যাব তোমাকে ব্যাগে ভরে নিয়ে যাব।”

“ছেলেমানুষের মতো কথা বলিস না। এ বার নিজের কথা ভাব। তোর কিছু হলে কে দেখবে? আমি তো চিরকাল থাকব না। বিয়ে কর এ বার।”

সৌহার্দ্য বলে, “এই ডায়ালগ বাঙালি মায়েরা দুশো বছর ধরে দিয়ে যাচ্ছে। আর কত বছর দেবে কে জানে!”

boierpathshala.blogspot.com

শ্রীকণা বলেন, “কথা ঘোরাস না। এ বার একটা বিয়ে কর।”

সৌহার্দ্য সিরিয়াস হবার ভান করে বলে, “পাত্রী খুঁজছি মা।”

শ্রীকণা স্থির চোখে তাকিয়ে বলেন, “সত্যি? না কি ঠাট্টা করছিস?”

সৌহার্দ্য বলে, “অবশ্যই সত্যি। এখন পর্যন্ত সতেরো জনকে পছন্দ করেছি। ওটা পঁচিশ হলেই তোমার কাছে আসব। লটারি হবে। লাকি ড্র। ঝুলি থেকে তুমি যার নাম তুলবে, তাকেই অ্যাপ্রোচ করব। সে রাজি হলেই বিয়ে।”

শ্রীকণা রেগে গিয়ে বলেন, “কোনও মেয়ে তোকে বিয়ে করতে রাজি হবে না। এ রকম ফাজিলকে বর হিসেবে কে মেনে নেবে?”

সৌহার্দ্য কাঁচুমাচু হওয়ার অভিনয় করে বলে, “সেটাও একটা কথা। মা, তুমি বরং একটা কাজ করো। পেপারে ‘পাত্রী চাই’ কলমে অ্যাড দাও। সব সু–এর ওপর ছাড়বে। সুদর্শন, সুচাকুরে, সুচতুর, সুফাজিল পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই।”

শ্রীকণা হেসে ফেলে বলেন, “ছোটবেলায় তো এত পাজি ছিলি না সোহো! সারা ক্ষণ কেমন বই মুখে বসে থাকতিস!”

সৌহার্দ্য দু’হাত ছড়িয়ে দিয়ে নাটকীয় কায়দায় বলে, “এই সমাজ, এই সংসার আমাকে পাজি বানিয়েছে।” তার পর কাছে এসে বলে, “আসলে কী জানো মা, বাবার দাপটে গুটিয়ে থাকতাম। প্রাণ খুলে হাসতেও পারিনি। তুমিও তাই।”

শ্রীকণা বলেন, “থাক ও সব পুরনো কথা। এ বার তোর দাপট থেকে আমাকে বঁাচতে দে দেখি!”

সৌহার্দ্য বেলা করে ওঠে। উঠেই অফিসের জন্য হুটোপাটি শুরু করে দেয়। শ্রীকণা রান্না না করলেও ছেলের ব্রেকফাস্ট নিজের হাতে গুছিয়ে দেন। সেই

boierpathshala.blogspot.com

ব্রেকফাস্ট কোনও রকমে গিলতে গিলতে ছেলে দৌড় লাগায়। আজ ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলেন, সৌহার্দ্য ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। ডাইনিং টেবিলে বসে ল্যাপটপে খুটখাট করছে।

শ্রীকণা বললেন, "আজ হল কী! সকাল সকাল উঠে পড়েছিস যে বড়?"

সৌহার্দ্য বলল, "ভাল ছেলে হয়ে গেছি মা। চা দাও। চা খেতে খেতে তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

শ্রীকণা রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, "তোর সঙ্গে কথা বলার মতো সময় আমার নেই।"

পর্ব ২৮

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

ছেলের ব্রেকফাস্ট করতে করতে শ্রীকণা বুঝতে পারলেন, মাথাটা ভারী লাগছে। বয়স হয়েছে, শরীর তো মাঝে মাঝে বিগড়োবেই। ছেলেটা না বুঝতে পারলেই হল। শ্রীকণা চা বসালেন। কিছু ক্ষণের মধ্যে টোস্ট, ডিমসেদ্ধ, আপেল এনে টেবিলে রাখলেন।

boierpathshala.blogspot.com

সৌহার্দ্য বলল, “তুমি খাবে না?”

শ্রীকণা বললেন, “আমি এখন খাই? আমাকে কি অফিস ছুটতে হবে? বল কী বলবি।”

সৌহার্দ্য টোস্ট তুলে কামড় দিয়ে সহজ ভাবে বলল, “মা, মনে হচ্ছে কলকাতার পালা শেষ। মনে হচ্ছে কেন, শেষই ধরে নাও। যাদের সঙ্গে নেগোসিয়েশন চলছে তারা আমার ডিমান্ড প্রায় সব ক’টাই মেনেছে। দু–একটা খুচরোখাচরা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। সেগুলো ফাইনাল হলেই আমাকে জানিয়ে দেবে। সেই মেল দেখতেই এই সাতসকালে উঠে ল্যাপটপ খুলে বসেছি।”

শ্রীকণা বললেন, “দিল্লি না মুম্বই?”

সৌহার্দ্য চামচে ডিমসেদ্ধ কাটতে কাটতে বলল, “আর একটু দূরে। ইংল্যান্ড। লন্ডনে অফিস, ওয়ার্কশপ আউটস্কার্টে। সব জায়গাতেই যাতায়াত করতে হবে।”

শ্রীকণার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, “বাঃ খুব ভাল। মুখটা বাড়া, একটু আদর করে দিই।”

সৌহার্দ্য মুখ বাড়িয়ে বলল, “আদর পুরোটা কোরো না। একটু ধরে রেখো। অফার লেটারটা ওরা পাঠাক, তার পর বাকিটা করবে।”

সৌহার্দ্য মায়ের দিকে মাথাটা ঝঁুকিয়ে দিল। শ্রীকণা হাত বাড়িয়ে ছেলের থুতনি ছুঁলেন। তাঁর চোখের কোল ভিজে উঠল। কপালে চন্দনের টিপ নিয়ে ছেলের প্রথম দিন ছায়াপাতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার ছবিটা চোখে ভেসে উঠল।

boierpathshala.blogspot.com

সৌহার্দ্য টোস্টে জ্যাম লাগাতে লাগাতে বলল, "ছেলের বিলেত যাত্রার খবরে তুমি কিঞ্চিৎ ইমোশনাল হয়ে পড়লে। আমি তোমার আবেগকে সম্মান দিয়েই বলছি, আজকাল চাকরি করতে দেশের বাইরে যাওয়াটা কমন প্র্যাকটিস। কোম্পানি একটু বড় হলেই পাঠিয়ে দেয়। কখনও দু–তিন বছরের অ্যাসাইনমেন্টে, কখনও পাকাপাকি।"

শ্রীকণা বললেন, "তোর বাবা বেঁচে থাকলে খুব খুশি হতেন।"

সৌহার্দ্য কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলল, "শিয়োর। অফার লেটারের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন্স দেখলে আরও খুশি হতেন।"

শ্রীকণা বললেন, "আজ আর গাল দিস না। আজ একটা শুভ দিন।"

সৌহার্দ্য চোখ বুঁজে পাউরুটি চিবোতে চিবোতে বলল, "বাবাকে আমি তো কখনওই গাল দিই না। উনি যা করেছেন, আমার ভালর জন্যই করেছেন। সেই ভাল আমার হচ্ছেও। প্রফেশনে একটার পর একটা বেটার অফার পাচ্ছি। সেইমতো জাম্পও দিচ্ছি। কিন্তু মা, আমি যে আমার অন্য রকম ভাল চেয়েছিলাম। এই বিদেশ যাওয়াটা যদি আমার অ্যাকাডেমিক কারণে হত আমি খুশি হতাম বেশি।"

শ্রীকণা বললেন, "যা হয়নি তা নিয়ে এত অনুশোচনা ঠিক নয়।"

সৌহার্দ্য বলল, "আমি কি অনুশোচনা করি? তোমাকে মাঝে মাঝে বলি এই যা। আমি তো আমার কেরিয়ারকে আমার পিঠে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নিয়েছি। শুধু অফিস নয়, আমার জীবনযাপনও সে রকম। পার্টি করি, গার্লফ্রেন্ড মেনটেন করি, অফিসে কী ভাবে ম্যানেজমেন্টের নজরে থাকা যায় তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকি।"

boierpathshala.blogspot.com

শ্রীকণা কপালের দু'পাশে এক ধরনের ব্যথা অনুভব করছেন। তিনি চোখমুখ স্বাভাবিক রাখলেন।

"ঠিক আছে হয়েছে। তুমি কী করো তার অত ফিরিস্তি আমাকে দিতে হবে না। যাওয়া কবে?"

সৌহার্দ্য চা খেতে খেতে বলল, "বললাম যে। আগে সবটা ফাইনাল হোক। তবে এই অফিসকে আজই হয়তো মেল করে দেব। তোমাকে বলার দুটো কারণ আছে। এক, বিদেশ যাওয়ার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। তুমি সেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করো। আমি আগে গিয়ে জয়েন করব। তার পর তোমার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্য দেশ। ইচ্ছে করলেই তো কাউকে নিয়ে গিয়ে পাকাপাকি রেখে দেওয়া যায় না। ভিসার অনেক নিয়মকানুন আছে।"

শ্রীকণা নিচু গলায় বললেন, "আমি আর কোথাও যাব না সোহো। আমাকে আর টানিস না। আমার ক্লান্ত লাগছে। আমি এখানেই থাকব। মাঝে মাঝে নাহয় তোর কাছে ঘুরে আসব।"

সৌহার্দ্য বলল, "এখানে একা তুমি কী করে থাকবে!"

শ্রীকণা হেসে বললেন, "একা কোথায়? কত লোক আছে। তা ছাড়া আমাদের উর্বরা আছে না? ওদের সঙ্গে আরও জড়িয়ে যাব। ওখানে কত কাজ!"

কলকাতা আসার পর থেকেই 'উর্বরা' সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত শ্রীকণা। মেয়েদের হাতের কাজ শেখান। ছায়াপাতায় থাকবার সময় সেলাই করতেন। সেই বিদ্যে কাজে লাগছে। ওখানে কত মেয়েদের সঙ্গে দেখা হয়। তাদের যে কত যন্ত্রণা, কত অপমান সহ্য করতে হয়েছে তার ঠিক নেই। ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য আবার নতুন করে লড়াই করছে। এখানে কাজ খুব ভাল লাগে শ্রীকণার। এই রকম

boierpathshala.blogspot.com

জায়গায় গেলে বোঝা যায়, কলকাতা শহর শুধু ব্যস্ত, স্বার্থপর নয়, শহরটার খুব বড় একটা মন আছে। মায়ের এই কাজে সৌহার্দ্যেরও সমর্থন রয়েছে। ফাংশন, এগজ়িবিশন হলে ডোনেশন জোগাড় করে দেয়।

সৌহার্দ্য একটু চিন্তিত হয়ে বলল, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে।"

শ্রীকণা বললেন, "আর কিছু দেখার নেই। এটাই ফাইনাল। তুই চলে গেলে সব সময়ের জন্য এক জন লোক রেখে আমি এখানেই থেকে যাব। এখন তো সব সময় যোগাযোগ করা যায়।"

সৌহার্দ্য বলল, "তোমাকে ভিডিয়ো কল, স্কাইপ— সব শিখিয়ে দেব।"

শ্রীকণা বললেন, "তা হলে কিসের চিন্তা?"

সৌহার্দ্য কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শান্ত ভঙ্গিতে বলল, "মা, এ বার আমি তোমাকে দু'নম্বর কথাটা বলব। মন দিয়ে শুনবে।"

শ্রীকণা নড়েচড়ে বসলেন। ছেলের এই ভঙ্গি তিনি চেনেন। ছেলে সত্যি সিরিয়াস কথা বলতে চায়। সৌহার্দ্য একটু ভেবে নিয়ে বলতে শুরু করল। সম্ভবত মনে মনে গুছিয়ে নিল।

"মেয়েটির নাম আহিরী রায়। মোটের ওপর সুন্দরী, লেখাপড়া করেছে। কলেজের টিচার। স্মার্ট, আধুনিক, সাহসী মনের মেয়ে। নিজে গাড়ি চালিয়ে কলেজে যায়। ক্যান্টিনে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আড্ডা মারে। প্রিন্সিপাল না টিচার-ইন-চার্জ ঘেরাও হলে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নেগোশিয়েট করে ঘেরাও তোলার ব্যবস্থা করে। পরিবারটিও শিক্ষিত। বাবা বড় কোম্পানির উঁচু পদে আছেন। মেয়েটি এখনও বিয়ে করেনি।"

boierpathshala.blogspot.com

এতটা বলে সৌহার্দ্য থামল। শ্রীকণা ভুরু কঁুচকে বললেন, ‘‘ব্যাপার কী? একটা অবিবাহিত মেয়ে সম্পর্কে এত খোঁজখবর নিয়েছিস যে বড়?’’

সৌহার্দ্য বলল, ‘‘আমি নিইনি। আমার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ব্যাচমেট অর্জক নিয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পাট চুকিয়ে ফিজিক্স পড়তে চলে গিয়েছিল। তার পর কম্পিউটার সায়েন্স। অর্জক এখন আমেরিকায়। এই মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের কথাবার্তা হয়েছিল, আর এগোয়নি। কিছু দিন আগে তার সঙ্গে হঠাৎই ফেসবুকে যোগাযোগ হল। তার পর হোয়াটসঅ্যাপ-এ কথা বলি। চাপা স্বভাবের ছেলে। অনেক দিন পরে যোগাযোগ হলে বন্ধুদের যেমন বিয়ে-থা, গার্লফ্রেন্ড নিয়ে প্রশ্ন করতে হয়, আমিও করলাম। দেখলাম, বাঙালি মেয়ে বিয়ের ব্যাপারে অভিমান। চেপে ধরতে আহিরী রায়ের কথা বলল। কলকাতায় এসে মেয়েটির সঙ্গে দেখাও করেছে। প্রোপোজ়ও করে গেছে। কিন্তু সাড়া পায়নি। আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু যখন মেয়েটির আরও পরিচয় জানতে পারলাম, চমকে যাই।’’

সৌহার্দ্য থামল। শ্রীকণা শরীরে আবার অস্বস্তি বোধ করছেন। বঁা কঁাধের কাছটায় একটা ব্যথা হচ্ছে। ব্যথা লুকিয়ে তিনি বললেন, ‘‘কী পরিচয়?’’

সৌহার্দ্য কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শ্রীকণার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘‘শি ইজ় দ্য ডটার অব মাই বস।’’

‘‘তাই!’ শ্রীকণার গলাতেও বিস্ময়। বললেন, ‘‘এ তো একেবারে গল্পের মতো!’’

সৌহার্দ্য হাত বাড়িয়ে মায়ের হাত ধরে চোখের পাতা না ফেলে দঁাতে দঁাত চেপে বলল, ‘‘মা, গল্পটা আর একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।’’

শ্রীকণা অবাক হয়ে বললেন, ‘‘মানে!’’

boierpathshala.blogspot.com

সৌহার্দ্যর চোখ ঝকঝক করছে। সে আরও নিচু গলায় বলল, "ইউ উইল টক টু দিস ফ্যামিলি। আমি অপেক্ষা করছিলাম, এখন আমার আর কোনও বাধা নেই। আহিরী রায়ের বাবার কোম্পানি আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আমি তোমাকে সব কনট্যাক্ট নম্বর দিয়ে দেব। ইফ আই অ্যাম নট রং, তুমি মেয়েটির মাকে চিনতেও পারো। ওঁর নাম বনানী রায়। উনিও তোমাদের ওই উর্বরা সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত। আমি অফিস থেকে শুনেছি, বছরে এক বার করে ডোনেশন যায়।"

শ্রীকণা সাগ্রহে বললেন, "কী নাম বললি?"

"বনানী রায়।"

শ্রীকণা বললেন, "মনে হচ্ছে চিনি।"

মায়ের হাত ছেড়ে দিয়ে সৌহার্দ্য বলল, "তুমি ওঁর সঙ্গে কথা বলো।"

শ্রীকণা শরীরের অস্বস্তি ভুলে হেসে বললেন, "পাগলের মতো এ সব কী বলছিস সোহো! তোর বন্ধুর হয়ে আমি কী বলব? আমি কে? তার বাড়ির লোককে বুঝতে দে। তারা বলুক।"

সৌহার্দ্য এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "বন্ধুর জন্য নয়, তুমি আমার জন্য বলো।"

শ্রীকণা থমকে গেলেন। ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, "তুই কি আবার আমার সঙ্গে ঠাট্টা শুরু করছিস সোহো?"

সৌহার্দ্য চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। পায়চারি করতে করতে অনেকটা নিজের মনেই বলতে থাকে, "আহিরী রায়ের পাত্র হিসেবে আমি তো কিছু কম যোগ্য নই। তার বাবার কোম্পানিতে ইতিমধ্যেই আমি আমার ক্রেডিবিলিটি প্রমাণ

boierpathshala.blogspot.com

করেছি। নিজের অ্যাসাইমেন্ট তো করেইছি, যা আমার কাজের মধ্যে পড়ে না, তাও করেছি। কোম্পানির ভিতর একটা বড় সাবোটাজ় হচ্ছিল। কম্পিউটার সিস্টেমে ভাইরাস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আমি নোটিস করায় ওরা অ্যালার্ট হয়েছে। না করালে বড় ক্ষতি হয়ে যেত। দে আর ভেরি হ্যাপি।"

শ্রীকণা বললেন, "তুই সত্যি ওই মেয়েকে বিয়ে করতে চাস?"

সৌহার্দ্য শ্রীকণার চেয়ার ধরে, চোয়াল শক্ত করে বলল, "না মা, বিয়ে করতে চাই না। বিয়ের সব ফাইনাল করে বিদেশ চলে যেতে চাই।"

শ্রীকণা চমকে উঠলেন। ছেলে এ সব কী বলছে! এ তো অমানুষের মতো কথা! এ সব ভাবনা ওর মাথায় এল কী করে! শ্রীকণা বুঝতে পারছেন, তার কান, মাথা গরম হয়ে আসছে। শরীর ভারী লাগছে।

"কী পাগলের মতো বকছিস সোহো? বিয়ে করব বলে পালিয়ে যাবি!"

সৌহার্দ্য বাঁকা হেসে বলল, "ইয়েস। প্লিজ় আর কিছু জানতে চেয়ো না। পালিয়ে যাওয়ার কথাটা আমি তোমার কাছে লুকোতে পারতাম। লুকোইনি। যাতে তুমি আমাকে পরে ভুল না বোঝো।"

শ্রীকণা ধমক দিলেন, "আমি কক্ষনও এ কাজ করব না। তুই এ রকম বিশ্রী একটা কথা আমাকে বললি কী করে? তুই এত নিচুতে নেমেছিস!"

সৌহার্দ্য একটু হেসে বলল, "আমি জানতাম তুমি এ রকম একটা কিছু বলবে। তোমার মতো নরম মনের মানুষের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। ঠিক আছে, আমি কিন্তু একটা সুযোগ..." একটু থেমে সৌহার্দ্য বলল, "আমি সব বলে দিলে তুমি হয়তো আমার ওপর এ ভাবে রাগ করতে না।"

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ২৯

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন শ্রীকণা। বললেন, “আমি তোর কোনও কথা শুনতে চাই না। তুই সামনে থেকে চলে গেলে আমি খুশি হব।”

সৌহার্দ্য সামান্য হেসে বলল, “চিন্তা কোরো না, আমি অফিসে বেরিয়ে যাচ্ছি। মাথা ঠান্ডা করো। আমি সামান্য একটা প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম মা। তার বেশি কিছু নয়।”

সৌহার্দ্য বেরিয়ে যাওয়ার পর, রান্নার মাসিকে সব বুঝিয়ে নিজের ঘরে এলেন শ্রীকণা। মাথাটা টলমল করছে। খানিক ক্ষণ শুয়ে থাকা দরকার।

শ্রীকণা শুয়ে শুয়ে ভাবলেন, আজ সোহো যা বলল, সেই কাজ তো কমলেশ তার সঙ্গে করেছিল। কোনও খবর না পেয়ে প্রথমে খুব চিন্তা হয়েছিল। অসুখবিসুখ, দুর্ঘটনা হয়নি তো? তখন যোগাযোগের এত উপায়ও ছিল না। কমলেশ ঠিকানা, ফোন নম্বর কিছুই দেয়নি। দুশ্চিন্তায় খাওয়াদাওয়া সব ছেড়ে দিয়েছিলেন শ্রীকণা। কমলেশের কথা বাড়িতে সবাই জানত। এমনকি বাইরে

boierpathshala.blogspot.com

যাওয়ার আগে ছেলে এক দুপুরে ফাঁকা বাড়িতে এসেছিল, সে কথাও। মা রাগের ভান করেছিল, কিন্তু চোখমুখ বলছিল, খুশি হয়েছে। আহা রে, ছেলেটা কত দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে, দুজনে একটু একা থাকবে না? সেই ছেলে বিদেশে গিয়ে উধাও। মেয়ের অবস্থা দেখে বাবা মা'কে বলেছিলেন, "আমি কমলেশের বাড়িতে খোঁজ নিয়ে আসছি।"

বাবা ফিরেছিলেন থমথমে মুখে। বলেছিলেন, ভয়ঙ্কর অপমানিত হতে হয়েছে। পরিচয় শোনার পর ভাল করে কথাও বলতে চায়নি ওরা। শুধু বলেছে, ছেলের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আছে। সে পড়তে গেছে, কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে।

তার পরেও অপেক্ষা করেছিলেন শ্রীকণা। এক পরিচিত লোক মারফত খবর পেয়েছিলেন, লন্ডনে কমলেশ খুব ভাল আছে। আপাতত সে দেশে ফিরছে না। বাবা সব শুনে মা'কে বললেন, "অনেক নাটক হয়েছে। এ বার বিয়ে দিয়ে দাও। আর অপেক্ষা করলে মেয়ের বেলেল্লাপনা জানাজানি হয়ে যাবে।"

হাতের কাছে যাকে পাওয়া গেল তার সঙ্গেই কথা পাকা হল। গ্রামের স্কুলমাস্টার। শ্রীকণা ক্ষীণ আপত্তি করেছিলেন। মা ফোঁস করে উঠে বলেছিল, "তোকে যে অ্যাবরশন করাতে হয়নি এই যথেষ্ট। চুপ করে থাক।" অতীত গোপন রেখে বিয়ে হল। তার পরেও সৌহার্দ্যর বাবা সব জেনে গিয়েছিল।

সোহো ওর বসের মেয়ের সঙ্গে সেই একই কাজ করতে চাইছে! কী যেন মেয়েটার নাম? মাহিরী? শায়েরি? নামটা সুন্দর, কিন্তু মনে পড়ছে না। কোন প্রতিশোধের কথা বলতে চাইছিল? নিশ্চয়ই অফিসের কোনও ঝামেলা। ছি ছি, অফিসের গোলমালের জন্য এত নীচে নামতে চাইছে সোহো!

শ্রীকণা পাশ ফিরে শুলেন। বুকে একটা চাপ অনুভব করলেন।

boierpathshala.blogspot.com

১৫

কমলেশ রায় অফিসে, নিজের ঘরে বসে আছেন। তার মন খারাপ। মন খারাপের নানা কারণ রয়েছে। সবটা বুঝতে পারছেন না। কিছু স্পষ্ট, কিছু অস্পষ্ট। জীবনের সবচেয়ে লম্বা পথটাই হেঁটে ফেলেছেন। কত চড়াই-উতরাই পেরিয়েছেন। কেরিয়ারের শীর্ষে পৌঁছেছেন। মানুষের ভালবাসা, সম্ভ্রম কম পাওয়া হল না। যেমন তাঁকে মানায়, তেমন এক জন জীবনসঙ্গিনী পেয়েছেন। কেরিয়ার তৈরির সময় নিঃশব্দে আগলে রেখেছিল সে। কাজ, ট্যুর, পার্টি নিয়ে পাগলের মতো মেতে থাকতে গিয়ে দিনের পর দিন সময় দিতে পারেননি নবনীকে। সে এক দিনের জন্যও অনুযোগ করেনি। আর? আর আহিরীর মতো চমৎকার একটা মেয়ে আছে। তার পরেও আজ কেমন ফঁাকা, ছোট লাগছে নিজেকে। কমলেশ নিজেকেই বললেন, ‘‘ব্যাক টু ইয়োর সেন্সেস। নিজের চেতনায় ফেরো।’’

অফিসে আসার পরেই ত্রিপাঠী তাঁর কাছে একটা ‘কনফিডেনশিয়াল’ ফাইল পাঠিয়েছে। তাতে লেখা, কম্পিউটার ভাইরাসের ঘটনায় যে ‘পিসি’টিকে চিহ্নিত করা গেছে, সেটি আর কারও নয়, খোদ জেনারেল ম্যানেজারের পার্সোনাল সেক্রেটারি নিলয় সান্যালের। এটা নিলয়ের দ্বিতীয় কম্পিউটার মেশিন। তার ডেস্কেই আছে। ফাইলে ত্রিপাঠী আরও লিখেছে, সৌহার্দ্য ছেলেটি ঠিকই বলেছিল, তবে মেশিন খঁুজতে কারও ব্যক্তিগত কম্পিউটার ঘাঁটতে হয়নি। সার্ভার থেকেই মেশিনের নম্বর বার করা গেছে। বোঝা গেছে, কোন মেশিন

boierpathshala.blogspot.com

থেকে গোলমালটা হয়েছে। নিলয় সান্যাল এখনও জানে না, গোটা অফিসের কম্পিউটার সিস্টেম কোলাপ্‌স করার পিছনে তার মেশিন দায়ী।

কমলেশ রায়ের মনে পড়ল, বিভূতি এই ছেলেটি সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। বাইরের যে এজেন্সি এখানে ব্র্যান্ড প্রোমোশনের বরাত পেয়েছে, সেখানকার কোন তরুণীর সঙ্গে নাকি নিলয়ের ভাব-ভালোবাসা হয়েছে। কাজের ব্যাপারে ব্যক্তিগত দুর্নীতির সম্ভাবনা আছে।

কমলেশ ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়িয়েও সরিয়ে নিলেন। বাইরে থেকে নিলয় আড়ি পাতে না তো? তিনি মোবাইলে ত্রিপাঠীকে ধরলেন।

"তোমার ফাইল দেখেছি। ইঞ্জিনিয়াররা কি শিয়োর, এই ঘটনা ইচ্ছাকৃত?"

ত্রিপাঠী বললেন, "এখনও পর্যন্ত নয়।"

কমলেশ বললেন, "তা হলে কী করা উচিত?"

ত্রিপাঠী বললেন, "বুঝতে পারছি না স্যর। নিলয় সাবোটাজ় করেছে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে কিছু করা যাবে না। আবার বেনিফিট অব ডাউট দিতেও ভয় করছে স্যর। ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসে আছে। একেবারে আপনার ঘরে। স্যর, পুলিশকে ইনফর্ম করলে কেমন হয়? ওদের তো সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্ট আছে।"

কমলেশ বললেন, "একেবারেই নয়। কেউ যেন কিছু না জানে ত্রিপাঠী। আমাদের ইন্টার্নাল ইনভেস্টিগেশন আগে শেষ হোক। আপাতত নিলয়কে ট্রান্সফার করো।"

"ও সন্দেহ করবে না?"

boierpathshala.blogspot.com

কমলেশ বললেন, “না। এমন কাজ দাও যাতে খুশি হবে। অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবে না।”

ত্রিপাঠী অবাক হয়ে বললেন, “খুশি হবে? আপনি কি ওকে প্রোমোশন দিতে বলছেন? এত বড় অপরাধের পর...”

কমলেশ বললেন, “অপরাধ এখনও তো প্রমাণ হয়নি ত্রিপাঠী। এমনও তো হতে পারে, দেখা গেল সবটা অ্যাক্সিডেন্টাল। আপাতত আমরা ওকে প্রোডাক্ট প্রোমোশন অ্যান্ড ব্র্যান্ডিং-এর কাজে আউটডোর পাঠিয়ে দেব। বাইরের যে এজেন্সি এ ব্যাপারে কাজ করছে তাদের সঙ্গে কোম্পানির তরফে লিয়াজোঁ রেখে কাজ করবে। এইচআর-কে বল, যেন আজই ওকে ডেকে কথা বলে। আমি যত দূর ওকে জানি, এই অফার ও লুফে নেবে।”

ত্রিপাঠী বলল, “স্যর, আপনি যখন বলছেন তা-ই হবে।”

কমলেশ গলা নামিয়ে বললেন, “আমার কাছে খবর আছে, ওই এজেন্সিতে কাজ করে এমন একটি মেয়ের প্রতি নিলয় দুর্বল। রিলেশনও আছে। ওর সঙ্গে কাজ করার লোভ ও ছাড়তে পারবে না। এর মধ্যে ইনভেস্টিগেশন শেষ করা হবে। অপরাধ প্রমাণ হলে ভাল, না হলেও সমস্যা নেই। প্রোমোশন, ব্র্যান্ডিং-এর কাজে ভুল ও করবেই। পার্সোনাল কারণে বাইরের এজেন্সিকে টাকাপয়সা পাইয়ে দেওয়ার চার্জে তখন ওর বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেব। সেই অ্যাকশন মৃদু না জোরালো হবে, তখন ঠিক করা যাবে। সন্দেহ যখন হয়েছে, অ্যাকশন নিতেই হবে। কেয়ারলেস থাকাটাও একটা অপরাধ। ওর মেশিন থেকে এত বড় গোলমাল হবে কেন? তুমি দ্রুত নিলয়কে সরানোর ব্যবস্থা করো। অন্য এক জনকে আমার এখানে পাঠাও। নতুন কাউকে।”

boierpathshala.blogspot.com

ত্রিপাঠী নিশ্চিন্ত গলায় বললেন, "স্যর, এ সব তো আমি জানতাম না। এখুনি এইচআর হেডকে বলে নিলয়ের জন্য চিঠি তৈরির ব্যবস্থা করছি। আর আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারির জন্য আমাদের কাছে কয়েকটা সিভি আছে। প্লেসমেন্ট এজেন্সিকেও ফোন করে দিচ্ছি।"

ফোন ছেড়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলেন কমলেশ। একটা জটিল সমস্যার আংশিক সমাধান করা গেল মনে হচ্ছে। তবে এর পরে আরও জটিল সমস্যা আসছে। জটিল এবং স্পর্শকাতর। সেই সমস্যার কোনও আধখানা সমাধান হবে না। যদি হয় পুরোটাই হবে, নইলে নয়। তিনি ফাইল টেনে নিলেন। গত কয়েক মাস প্রোডাকশনের প্রতিদিনের রিপোর্ট দেখেন কমলেশ।

কাল রাতে ঘুমোনোর আগেও নবনী মেয়েকে নিয়ে অনেক ক্ষণ কথা বলেছেন। নবনী রাতে ঘুমের ওষুধ খান। বড়জোর দু–একটা কথা বলেই চোখ বোজেন। কাল ছিলেন অস্থির এবং উত্তেজিত। রিডিং ল্যাম্প জ্বালিয়ে বিছানায় আধশোয়া হয়ে বই পড়ছিলেন কমলেশ। নবনী রাতের প্রসাধন সেরে খাটে বসে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "মেয়ের জন্য কিছু ভাবলে? ওর সঙ্গে কথা বলেছ?"

কমলেশ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "ভেবেছি।"

বিরক্ত নবনী বললেন, "শুধু ভেবে কী হবে?"

কমলেশ বইয়ের পাতা উল্টে বললেন, "কী হবে জানি না। একটা চেষ্টা তো করতে হবে।"

নবনী বললেন, "আমার ধারণা, ওই বাজে ছেলেটার সঙ্গে আহি ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়িয়েছে। জেদ করে বাড়িয়েছে। যেহেতু আমি অর্জকের সঙ্গে ওর বিয়ের চেষ্টা করছি, তাই। মায়ের সব কথাই তো ওর কাছে শত্রুর কথা। মেজদি সে

boierpathshala.blogspot.com

দিন বাইপাসে আহির গাড়ি দেখেছে। পরমা আইল্যান্ডের কাছে সিগনালে দাঁড়িয়েছিল। পাশে ওই খারাপ ছেলেটা বসে আছে। মুখে দাড়ি। তুমি কি মুখের সামনে থেকে বইটা সরিয়ে আমার কথা শুনবে?”

কমলেশ বই সরিয়ে বললেন, “মুখে দাড়ি থাকলেই খারাপ ছেলে হবে তার কোনও মানে নেই। আহির কলিগও হতে পারে।”

নবনী বললেন, “তুমি ফালতু তর্ক করছ। অর্জকের মা সে দিন দুঃখ করছিল। আহি তার ছেলের সঙ্গে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপে টুকটাক চ্যাট করে, কিন্তু আসল কথায় যায় না। আমি বলেছি, এত দিন যখন অপেক্ষা করেছে, ছেলেকে আর ক’টা দিন অপেক্ষা করতে বলো।”

কমলেশ বললেন, “এটা তুমি বাড়াবাড়ি করছ নবনী। মেয়ের হয়ে তুমি কাউকে কথা দিতে পারো না। তার কোনও সিদ্ধান্ত যদি তোমার পছন্দ না হয়, তাকে সতর্ক করতে পারো ব্যস, তার বেশি নয়। তা ছাড়া অর্জক ছেলেটাই বা কী রকম? কোনও মেয়ে তাকে বিয়ে করতে না চাইলেও এ ভাবে হ্যাংলামো করতে হবে না কি!”

নবনী রেগে গেলেন, “হ্যাংলামো বলছ কেন? কাউকে পছন্দ হওয়াটা হ্যাংলামো? তা ছাড়া আহি যতই ওই ছেলেকে নিয়ে ঘুরে বেড়াক, আমি আমার মেয়েকে চিনি। মাথা ঠান্ডা করে ভাবলে সে অর্জকের মতো ছেলেকে নিশ্চয়ই মেনে নেবে। ও তো জীবনে সব কিছু হিসেব করে করেছে, বিয়েটাই বা করবে না কেন?”

কমলেশ হেসে বললেন, “আহি কি এখনও তোমার সেই ছোট্ট খুকি? নিজের ভালমন্দ সে বোঝে না? অন্য কেউ বলবে আর সে মেনে নেবে?”

boierpathshala.blogspot.com

নবনী হিসহিসিয়ে বললেন, “না। বোঝে না। অনেক মাতব্বরকে তো দেখছি। বিয়ের রাত কাটতে না কাটতে সুটকেস টানতে টানতে ফিরে আসছে।”

কমলেশ বললেল, “আহি এক জন শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী মেয়ে, আর পঁাচ জনের সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেলাটা ভুল হবে নবনী।”

পর্ব ৩০

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

নবনী নাক দিয়ে ফুঁয়ের আওয়াজ করে বললেন, “শিক্ষা আর বুদ্ধির দৌড় দেখতে পারছি। একটা অকর্মণ্য, অযোগ্য, বেকার ছেলেকে নিয়ে ঘুরছে। আমার বিশ্বাস, ওই বদ ছেলে আহিকে নিজের ফ্যামিলি সম্পর্কেও কিছু বলেনি। ফ্যামিলিটাও খুব খারাপ। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর ওর বাবা এক জন কমবয়সি মহিলাকে বিয়ে করে। সেই মহিলা...”

কমলেশ স্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে বলেছেন, “থাক, আমি জানি।”

boierpathshala.blogspot.com

নবনী ভুরু কঁুচকে বললেন, “জানো! তুমি কী ভাবে জানলে?”

কমলেশ বললেন, “তুমি বলার পর আমি কিছু খোঁজখবর নিয়েছিলাম।”

নবনী খানিকটা তেড়েফুঁড়েই বললেন, “তা হলে হাত গুটিয়ে বসে রয়েছ কেন? তোমার আহ্লাদের মেয়েকে ডেকে বলো, সে যেন নিজের পায়ে কুড়ুল না মারে।”

কমলেশ পাশ ফিরে শুতে শুতে বললেন, “নবনী, প্রেমে পড়লে মানুষের নিজের ভালমন্দ মাথায় থাকে না। এখন শুয়ে পড়ো। রাত হয়েছে।”

নবনী উলটো পাশ ফিরতে ফিরতে চাপা গলায় বললেন, “নিজের ভালমন্দ কী ভাবে বুঝতে হয় তুমি তো জানতে। জানতে না? এখন মেয়েকে শেখাতে পারছ না?”

সেই পুরনো খোঁচা। কমলেশ চুপ করে রইলেন। ইচ্ছে করলেই তিনি বলতে পারতেন, বিতানকে নিয়ে আহির সঙ্গে তার কথা হয়েছে। আজ সন্ধেবেলাই হয়েছে। একটু-আধটু কথা নয়, অনেকটা কথা। নবনী তাদের উর্বরা অর্গানাইজেশনের কোনও একটা প্রোগ্রামে গিয়েছিল। সেই সুযোগে কমলেশ তার মেয়েকে স্টাডিতে ডাকেন। বিষয় যতই সিরিয়াস হোক, কমলেশ ‘ক্যাজুয়াল মেথড’ ব্যবহার করলেন। ম্যানেজারি কায়দা। কোনও কোনও সময় গুরুগম্ভীর আলোচনার থেকে এই পদ্ধতি বেশি কাজ দেয়।

আহিরী এসে বলে, “বাবা, খুব ব্যস্ত আমি। খাতা দেখছি।”

কমলেশ হালকা গলায় বললেন, “বসতে হবে না। তোকে তিনটে প্রশ্ন করব, ঝটপট উত্তর দিয়ে চলে যাবি। কোনও প্রশ্ন করবি না। পরেও কখনও করবি না। কাউকে বলতেও পারবি না। দেখি তুই কত বড় স্মার্ট হয়েছিস। এগ্রি?”

boierpathshala.blogspot.com

আহিরী মজা পাওয়া গলায় বলে, “এগ্রি।”

“তোর কি বিতান নামে কোনও অকর্মণ্য, হাফ বেকার ছেলের সঙ্গে রিলেশন হয়েছে?”

আহিরী ঘাড় কাত করে বাবার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল। বলল, “হয়েছে। হাফ নয়, দু-এক দিনের মধ্যে ফুল বেকার হয়ে যাবে। ছোটখাটো একটা পার্টটাইম কাজ করছে, সেটাও ছেড়ে দেবে।”

“তুই কি ওই ছেলেকে বিয়ে করতে চাইছিস?”

আহিরী কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, “অবশ্যই চাইছি। বিয়ে করে আমি ওকে পিটিয়ে মানুষ করতে চাই। তবে বিতান চায় না। ও মনে করে, ওর মতো সামান্য এক জন মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে পড়াটা আমার জন্য লজ্জার ও ক্ষতিকর হবে। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। আমি কি উদাহরণ দিতে পারি? এটা কোনও প্রশ্ন নয়।”

কমলেশ গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। ভিতরে ভিতরে চমকেও উঠছেন। কিন্তু ভান দেখালেন অবজ্ঞার। বললেন, “পারিস। তবে সংক্ষেপে।”

আহিরী বলল, “রিসেন্টলি আমাদের কলেজের একটি ব্যাড টাইপ মেয়ে কলেজের গেটে আমাদের দুজনকে দেখতে পায় এবং মোবাইলে ফোটো তোলে। কোনও ভাবে বিতান সেটা দেখেছে। সেটা নিয়েও সে অপরাধবোধে ভুগছে। এতে আমার কতটা ইমেজ নষ্ট হতে পারে তাই নিয়ে ভাবছে।”

কমলেশ একটু চুপ করে থেকে বললেন, “ওই ছেলেটার মোবাইল নম্বরটা আমাকে দে।”

আহিরী অবাক হয়ে বলল, “তুমি কি বিতানকে ফোন করবে?”

boierpathshala.blogspot.com

কমলেশ বললেন, “নো কোয়েশ্চেন।”

আহিরী কঠিন গলায় বলল, “আর যদি আমি না দিই?”

কমলেশ বললেন, “বেশি কিছু হবে না। এক জনের মোবাইল নম্বর জোগাড় করা বিরাট কোনও সমস্যা নয়। তবে তোর সাহস এবং আমার প্রতি বিশ্বাসের একটা পরিচয় পাব। এ বার তুমি কেটে পড়তে পারো।”

একটু পরে আহিরী ফোন নম্বর লেখা একটা কাগজের টুকরো এসে ধরিয়ে দেয়। কমলেশ ছদ্ম গাম্ভীর্য দেখিয়ে বলেন, “আশা করি তোমার এই বন্ধুটিকে তুমি কিছু বলবে না।”

আহিরী বলল, “আমার প্রতি তোমার বিশ্বাসের বহর দেখে অবাক হচ্ছি বাবা।”

কমলেশ হেসে বললেন, “রাইটলি সার্ভড। একেই বলে মুখের মতো জবাব। কার মেয়ে দেখতে হবে তো।”

আহিরী বলল, “আজ শিখলাম, বড় ম্যানেজারদের এটা একটা কায়দা। পেটের কথা বের করতে র‍্যাপিড ফায়ার করে বসে। আমি কলেজে অ্যাপ্লাই করব। এই কলেজে বেশি দিন থাকা হবে বলে মনে হচ্ছে না।”

কমলেশ বললেন, “কেন? তোদের ওই শর্মিষ্ঠা দত্ত না কে আবার জ্বালাচ্ছেন?”

আহিরী বলল, “না। ঘেরাওয়ের ঘটনার পর থেকে আমাকে সমঝে চলে। এক জন আমার পার্কিং-এর জায়গা অকুপাই করেছিল। না বলতেই সে গাড়ি সরিয়ে নিয়েছে। অর্কপ্রভ সেনও এখন ‘ম্যাডাম ম্যাডাম’ করেন। নতুন বাড়ি তৈরির ব্যাপারে কী সব গোলমাল হয়েছে। শর্মিষ্ঠা দত্তকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে।”

boierpathshala.blogspot.com

কমলেশ বললেন, “তা হলে কলেজ ছাড়ার প্রশ্ন উঠছে কেন?”

আহিরী হেসে বলল, “মা আমাকে আমেরিকায় পাঠিয়েই ছাড়বে মনে হচ্ছে। পাত্রটি একটু হ্যাংলা টাইপ, হোয়াটসঅ্যাপ বেশি করে, তবে মন্দ নয়, আমার পাশে মানাবে।”

কমলেশ একটুও দেরি না করে বললেন, “তুই যাবি আহি?”

আহিরী ঠোঁটের কোণে হেসে বলল, “স্যর, আপনার র‍্যাপিড ফায়ারের পালা শেষ। এ সম্পর্কে আর কোনও প্রশ্নের জবাব আপনি পাবেন না। অফিসের জেনারেল ম্যানেজার নয়, এ বার বাবা হিসেবে মেয়ের উত্তর বুঝে নিন।”

পিতা–কন্যার এই গভীর ও গোপন কথোপকথন কি নবনীকে বলা যায়? কখনওই নয়। সে আদিখ্যেতা ভেবে আরও রেগে যেত।

কমলেশ রায় কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলেন।

মুখ তুলে সামনের দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে তাকালেন কমলেশ। তার পর ফাইলপত্র সরিয়ে গাড়ির চাবিটা নিয়ে উঠে পড়লেন।

১৬

বিতান মন দিয়ে খাচ্ছে। তার খাওয়ার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে নতুন কিছুই ঘটেনি, কমলেশ রায় নামের ভদ্রলোকটির সঙ্গে সে মাঝেমধ্যেই লাঞ্চ করে।

কমলেশ রায় একটা চিকেন স্যান্ডউইচ নিয়েছেন। স্যান্ডউইচ শেষ করে কফি নিয়ে বসেছেন। ইচ্ছে করেই বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে এই মাঝারি ধরনের

boierpathshala.blogspot.com

রেস্তরাঁটা বেছেছেন কমলেশ। বড় কোথাও গেলে বিতানের অস্বস্তি হতে পারত।

বিতান রেস্তরাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। কমলেশকে দেখে এগিয়ে আসে।

"আহিরীর মোবাইলে আপনাদের ছবি দেখেছি।"

কমলেশ হেসে বলেন, "আমি কিন্তু ছবি না দেখেই তোমাকে চিনতে পেরেছি। দাড়ির কথাটা তো জানতাম। তা ছাড়া এই মুহূর্তে এখানে হ্যান্ডসাম ইয়ং ম্যান তো এক জনই রয়েছে।"

বিতান বলে, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

বিতানকে আজ সত্যি সুন্দর লাগছে। জিনসের ওপর নীল রঙের হাফ-স্লিভ একটা শার্ট পরেছে। এলোমেলো চুলে লম্বা–চওড়া চেহারার তরুণটিকে সুপুরুষ লাগছে। কমলেশ মনে মনে মেয়ের তারিফ করলেন। ভিতরে যাই থাক, বাইরে থেকে মেয়েদের প্রেমে পড়বার মতোই। ছেলেটি খুব স্মার্টও। প্রেমিকার বাবার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে এত স্বচ্ছন্দ থাকা সহজ নয়। অন্তত গড়পড়তা বাঙালি ছেলের পক্ষে তো নয়ই। আজ সকালে ফোন করেই ছেলেটি সম্পর্কে একটা ভাল ধারণা তৈরি হয়েছিল কমলেশের। নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, "আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই বিতান। কথাটা জরুরি। এখনই বলা দরকার।"

বিতান একটুও না চমকে বলে, "বলুন।"

কমলেশ বলেন, "এ ভাবে হবে না। কথা বেশি নয়, কিন্তু মুখোমুখি বসা দরকার।"

বিতান ঠান্ডা গলায় বলে, "আচ্ছা বসব। আপনি বলুন কোথায় যেতে হবে।"

boierpathshala.blogspot.com

কমলেশ একটু ভেবে নিয়ে বলেন, “আজ দুপুরে তুমি কী ভাবে প্লেসড?”

“চারটে পর্যন্ত কিছু নেই।”

বিতানকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেন, “ফাইন, তুমি আমার সঙ্গে আজ লাঞ্চ করো।”

বিতান অস্ফুটে বলে উঠেছিল, “লাঞ্চ!”

“এনি প্রবলেম?”

বিতান একটু ভেবে বলল, “না, ঠিক আছে। কোথায় যাব?”

সময় আর রেস্তরাঁর ঠিকানা বলে কমলেশ একটু হালকা ঢঙে বললেন, “আমি চাই আমাদের এই সাক্ষাতের ঘটনাটা শুধু আমি আর তুমি জানব।”

বিতান বলল, “অবশ্যই।”

কালই ছেলেটিকে খানিকটা বুঝতে পেরেছিলেন কমলেশ, আজ আরও ভাল করে বুঝছেন। এই ছেলের নিজেকে নিয়ে কোনও রকম কুণ্ঠা নেই। খাওয়ার মাঝখানেই বিতান কথা বলতে চেয়েছিল। কমলেশ হাত তুলে বলেছিলেন, “আগে ধীরেসুস্থে খাও, তার পর।”

বিতান খাওয়া শেষ করে কফির বদলে আইসক্রিম নিল।

“এ বার বলতে পারেন।”

কমলেশ বললেন, “কথা শুরুর আগে আমি কি তোমার ফ্যামিলির বিষয়ে কিছু জানতে পারি? তোমার ব্যাপারে কেবল ওইখানেই আমার একটা ইনফর্মেশন গ্যাপ আছে।”

boierpathshala.blogspot.com

বিতান একটু চুপ করে থাকে। তার পর অল্প কথায় মায়ের মৃত্যু, বাবার আবার বিয়ে, তাকে বাড়ি থেকে কার্যত তাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলে।

“ওই মহিলা এখন অসুস্থ বাবাকে বাড়ি থেকে বার করে দিতে চাইছেন। বাবাও আর থাকতে চান না। আজও আমাকে ফোন করে কান্নাকাটি করলেন। অথচ এক সময় ওই মহিলা আর তাঁর মেয়ের জন্য কী না করেছে মানুষটা।”

বিতান মুখ নামাল। কমলেশ নরম গলায় বললেন, “স্যরি, আমি জানতাম না। ভালবাসা যে শেষ পর্যন্ত কী চেহারা নেয় কে বলতে পারে?”

বিতান মুখ তুলে বলল, “আমার ক্ষতি হল। এই গোলমালে লেখাপড়াটাও ঠিকমতো হল না। জীবনের উৎসাহটাই হারিয়ে ফেললাম। যাক, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বাবাকে আমি আমার কাছে নিয়ে আসব। যে ক’টা দিন বাঁচবেন, আমিই দেখব।” বিতান থেমে একটু হেসে বলল, “যদিও আমার নিজেরই থাকার জায়গা নেই। তা হোক, একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।”

কমলেশ থমকালেন। বিভূতির দেওয়া রিপোর্টে ছেলেটার সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল। কাল আহির কাছে শুনে সেই ধারণা বদলেছে। বুঝতে পেরেছেন, আহি এমন কোনও ছেলেকে ভালবাসতে পারে না, যার কিছু নেই। ঘরবাড়ি, চাকরি না থাকলেও কিছু তো আছে। কমলেশ এখন বুঝতে পারছেন, ছেলেটির মনের জোর আছে। মুমূর্ষু বাবার বিষয়ে যে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সে আহির ব্যাপারে নেবে না কেন? এই জোর ভাঙতে কতটা আঘাত দরকার? নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করলেন কমলেশ। এটা একটা মনের লড়াই হবে। অর্ধেকেরও কম বয়সি যুবকের সঙ্গে মনের লড়াই। কাল অনেক রাত পর্যন্ত ভেবে তিনি বুঝেছেন, বাবা হিসেবে এটাই তাঁর কর্তব্য।

boierpathshala.blogspot.com

পর্ব ৩১

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

কমলেশ রায় বললেন, “বিতান, এ বার কাজের কথায় আসা যাক। আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক হয়েছে। সাধারণ সম্পর্ক নয়, যে সম্পর্ক দুটি ছেলেমেয়েকে সারা জীবন একসঙ্গে থাকার দিকে ঠেলে দেয়, সেই সম্পর্ক। এই সম্পর্কে তারা যুক্তিবুদ্ধি হারায়। বুঝতে পারে না বা চায় না, তারা একসঙ্গে থাকার উপযুক্ত কি না, একে অপরের যোগ্য কি না। তারা অবধারিত ভাবে ভুল করে।”

বিতানের চোখমুখ কঠিন হয় যায়। সে থমথমে গলায় বলে, “আপনি কী বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি।”

কমলেশ একটু ঝুঁকে পড়ে নিচু গলায় বললেন, “আমি আমার মেয়েকে ভালবাসি। সে কোনও কারণ কষ্ট পাক আমি চাই না বিতান। আশা করি তুমিও চাইবে না। যদি চাও, তোমার জীবনে উৎসাহ ফিরিয়ে আনার কিছু দায়িত্ব আমিও নিতে পারি। মুম্বইতে চাকরি, নিজের ফ্ল্যাট, অসুস্থ বাবার চিকিৎসা....”

boierpathshala.blogspot.com

বিতান চোয়াল শক্ত করে বলে, "ব্যস, আর বলতে হবে না। আমার কিছু দরকার নেই। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, অপমানিত হতে আসিনি।"

কমলেশ একটু হেসে বললেন, "এর মধ্যে অপমানের কী দেখলে ইয়ং ম্যান? ডিল খুব পরিষ্কার। হিন্দি সিনেমায় তো এক সময় খুব দেখা যেত। এখনও দেখায় না কি? কত দিন যে সিনেমা–থিয়েটার দেখিনি।"

বিতান দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "আর কথা বাড়াবেন না। আপনার কোনও ডিলে আসবার প্রয়োজন নেই। আপনি আমাকে কী শোনাতে এসেছেন? আমি খুব ভাল করেই জানি, আমার সঙ্গে আহিরীকে মানায় না। কোনও দিক থেকেই আমি ওর যোগ্য নই। আমি ওর মিনিমাম থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাটুকুও করতে পারব না। আমি সে কথা আপনার মেয়েকে জানিয়েও দিয়েছি।"

কমলেশ দু'হাত ছড়িয়ে হাসিমুখে বললেন, "ওহো, জানিয়ে দিয়েছ? দেন ইট'স ওকে।"

বিতান উঠে দাঁড়াল। তার চোখমুখে রাগে, অপমানে থমথম করছে।

"আপনি যখন আজ ফোন করে ডেকেছেন, তখনই বুঝেছিলাম, এ রকম কিছু বলবেন। আমি রেডি হয়েই এসেছি। কিন্তু এতটা নীচে নেমে বলবেন ভাবতে পারিনি। স্যরি, বলতে বাধ্য হচ্ছি, আহিরীর বাবা হিসেবে আপনাকে ঠিক মানাছে না।"

কমলেশ ঠোঁটের কোণে হেসে বললেন, "ইয়ং ম্যান, এত রাগ করে না। প্রেমে পড়া মানুষ হয় দু'রকম। কাপুরুষ, নয় লোভী। তুমি যে লোভী নও সে তো বুঝতে পারছি, কিন্তু তুমি যে দেখছি..."

বিতান বলল, "আপনি কি আমাকে কাপুরুষ বলছেন?"

কমলেশ একই রকম হেসে কাঁধ ঝাঁকালেন। বিতান রাগে কিছুটা কাঁপছে।

boierpathshala.blogspot.com

কমলেশ বুঝতে পারছেন, লড়াইয়ে তিনি জিতে গেছেন। খুব অল্প আয়াসেই জিতেছেন। মনে মনে নিজের পিঠ চাপড়ালেন তিনি।

"ও সব এ বার বাদ দাও বিতান। আমি কি তোমাকে লিফট দেব?"

বিতান চাপা গলায় বলল, "স্যর, অনেক অপমান করলেন, এ বার একটা কথা শুনে নিন। আমি আমার যাবতীয় কনফিউশন ঝেড়ে ফেলে আপনাকে জানিয়ে যাচ্ছি, অহিরী রাজি হলে আমি তাকে বিয়ে করব। থাকা–খাওয়া পরে বুঝে নেওয়া যাবে। অন্তত আপনার কাছে হাত পাতব না।"

বিতান বেরিয়ে গেলে মুচকি হেসে আরও একটা কফির অর্ডার দিলেন কমলেশ। এক ঝটকায় মন ভাল হয়ে গেছে তাঁর। এই ছেলে শেষ পর্যন্ত আহিকে বিয়ে করত হয়তো, কিন্তু দ্বিধা, হীনমন্যতায় যদি দেরি হয়ে যেত? দুজনেই সারা জীবন অসুখী হয়ে থাকত। এই ধাক্কাটার দরকার ছিল। নবনীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হল, কিন্তু মেয়ের ভালবাসার পাশে দাঁড়ানোটা অনেক জরুরি। ওরা ঠিক পারবে। আহিকে পাশে পেলে বিতান জীবনের উৎসাহ খুঁজে পাবে। কফি এল, তাতে একটা চুমুকও না দিয়ে বিল মিটিয়ে উঠে পড়লেন কমলেশ। নিজেকে খানিকটা পাপমুক্ত লাগছে। মনে মনে বললেন, এটা সাধারণ কোনও সম্পর্ক নয়, যে সম্পর্ক দুটি ছেলেমেয়েকে সারা জীবন একসঙ্গে থাকার দিকে ঠেলে দেয়, সেই সম্পর্ক। এতে যুক্তি-বুদ্ধি নেই। তারা অবধারিত ভাবে ভুল করে। ভুল করে তারা সুখী হয়। সারা জীবন অপরাধবোধ নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় না।

মোবাইলে আহিরীর ছবি ফুটে উঠল। কমলেশ এই ফোনটার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

"কী হয়েছে ডার্লিং?"

আহিরী থমথমে গলায় বলল, "বাবা তুমি বিতানকে কী বলেছ? ও বলছে,

boierpathshala.blogspot.com

কালই আমাকে বিয়ে করতে চায়। কী বলেছ তুমি ওকে?”

কমলেশ চুপ করে রইলেন। বহু দিন পর তাঁর চোখের কোণ ভিজে উঠল।

১৭

অফিসে পৌঁছতেই নিলয় একটা মুখবন্ধ খাম এগিয়ে দিল। “স্যর, সৌহার্দ্য বসু এটা আপনার হাতে দিতে বলেছেন।”

কমলেশ ভুরু কঁুচকে বললেন,“আমাকে!”

নিলয়ের মুখ খুশি-খুশি। নিশ্চয়ই তাকে নতুন অ্যাসাইনমেন্টের কথা বলা হয়েছে। বলল,

“হ্যাঁ স্যর।”

নিলয় বেরিয়ে যেতে সাদা লম্বা খামটা খুললেন কমলেশ। সৌহার্দ্যর খাম বলেই এত তাড়াতাড়ি খুললেন। এই ছেলে তাকে কী লিখেছে? ইংরেজিতে লেখা চিঠি। তাড়াহুড়ো করে লেখা। কমলেশ দ্রুত পড়তে লাগলেন।

‘স্যর, আপনার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করে কথা বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু এই মুহূর্তে সম্ভব হল না। একটু আগে বাড়ি থেকে ফোন করে জানিয়েছে, মা ভয়ঙ্কর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মনে হচ্ছে, হাসপাতালে নিতে হবে। আমি বাড়ি যাচ্ছি।

‘স্যর, আমি এই কোম্পানি ছেড়ে দিচ্ছি। মেলে রেজ়িগনেশন পাঠিয়ে দিলাম। অল্প দিনের জন্য হলেও অফিসের দিনগুলো আমার ভাল কাটল। এই অফিসে জয়েন করে আপনার নাম জানতে পারি। চমকে উঠি। কারণ কমলেশ রায় নামটির সঙ্গে আমি আগে থেকেই পরিচিত। ভেবেছিলাম নেহাতই নামের মিল। পরে জানলাম, না, মানুষটাও এক। কোম্পানির সাইট থেকে আপনার অতীত অনেকটাই জেনেছি। কোথায় পড়েছেন, কত দিন বিদেশে ছিলেন, তার পর

boierpathshala.blogspot.com

কলকাতায় না ফিরে কোথায় চাকরি করলেন, এই সব।

'স্যর, আপনার শিক্ষা, কেরিয়ার, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। যে দিন আমি জানতে পারলাম, আপনি সব কর্মীদের পার্সোনাল ডেটাবেসে মায়ের নাম জানানো বাধ্যতামূলক করতে চেয়েছেন, আমার খুব আনন্দ হল। তার কারণ আমি আমার মা'কে খুব ভালবাসি। তিনি আমার বন্ধু। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন কষ্ট আর অপমানের। কোনও অপরাধ ছাড়াই তাঁকে শাস্তি পেতে হয়েছে। অথচ তাঁকে যখন প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বলি, তিনি আমাকে বকাবকি করে ঘর থেকে বার করে দেন। আমার মা শ্রীকণা বসু এতটাই ভাল।

'স্যর, বলতে খুবই লজ্জা করছে, যে মানুষটা মাকে কষ্ট দিয়েছিল, অপমান করেছিল, অপেক্ষা করতে বলে পালিয়ে গিয়েছিল, তার নামও কমলেশ রায়। কী আশ্চর্য না? এই রাগে প্রথম দিন আপনার ঘরে একটা দামি কাপ ভেঙে ফেলেছিলাম।

আমাকে মাপ করবেন।'

চিঠি হাতে দীর্ঘ ক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন কমলেশ রায়। ঘোর কাটল ত্রিপাঠীর ইন্টারকমে। ত্রিপাঠী সৌহার্দ্যর রেজ়িগনেশনের খবর দিলেন। আর বললেন, "হিজ় মাদার ইজ় ইন ক্রিটিকাল কন্ডিশন। সিভিয়ার হার্ট অ্যাটাক।" কমলেশ নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কোন হাসপাতাল?"

আহিরী বললেন, "বাবা, তোমাকে হাসপাতালে যেতে হবে।"

"এত রাতে?"

আহিরী বলল, "হ্যাঁ। এত রাতেই যেতে হবে। আমি তোমাকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাব।"

boierpathshala.blogspot.com

“তোর মা...?”

আহিরী বলল, “মা–ই তো বলল, তোর বাবাকে নিয়ে যা। উর্বরা অর্গানাইজেশনের সঙ্গে উনিও জড়িত ছিলেন। সেখান থেকেই মা সব কিছু জেনেছিল।”

কমলেশ বসে আছেন মেয়ের ঘরে। তিনি মেয়েকে বলেছেন। শ্রীকণার সঙ্গে প্রেম, তার পর বিদেশে পালিয়ে যাওয়া, সৌহার্দ্যর অফিসে জয়েন করা, আজ শ্রীকণার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া, সবটাই বলেছেন।

“আহি, নিজেকে সর্ব ক্ষণ অপরাধী লাগে। তোর মা আমাকে ছোট চোখে দেখে।”

আহিরী শান্ত ভাবে সব শুনেছে। তার পর বাবার গায়ে হাত রেখে বলেছে, “চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবা, তুমি ওঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবে। আজই যাবে।”

কমলেশ বিহ্বল ভাবে বললেন, “শ্রীকণা কি আমার কথা বুঝতে পারবে?”

আহিরী বলল, “উনি না পারুন, তোমাকে বলতে হবে। তুমি হালকা হবে। মা খুশি হবে।”

হাসপাতালে এই সময়ে কাউকে ঢুকতে দেওয়ার কথা নয়। কন্ডিশন খুব খারাপ বলে সৌহার্দ্য ব্যবস্থা করল। ‘স্যর’ আসায় সে খুবই ছোটাছুটি করতে শুরু করে দেয়। নার্স বললেন, “পেশেন্টকে একদম বিরক্ত করবেন না। দেখে চলে আসবেন।”

সবাই কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, ভিতরে শুধু ঢুকলেন কমলেশ রায়।

boierpathshala.blogspot.com

একটু পরেই সন্ধে নামবে।

মূর্তি নদীর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন কমলেশ আর নবনী। আহিরী আর বিতান হানিমুনে গেছে জুলুক। ওরা ট্রেক করবে, ক্যাম্পে থাকবে, বনফায়ার করে মুরগির রোস্ট খাবে। নবনীর এ সবে খুব আপত্তি। এ কেমন হানিমুনের ছিরি? কমলেশ হেসে বললেন, "রাগ করে কী হবে? চলো আমরাও হানিমুনে যাই।" এ দিক-ও দিক ঘুরে ওঁরা দুজনে আবার মূর্তি নদীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। নবনী স্বামীর হাত ধরে আছেন। কমলেশ নবনীর কাঁধ হাত রাখলেন। সূর্য অস্ত গিয়েছে। কুলকুল আওয়াজে নুড়ি পাথর ধুয়ে চলে যাচ্ছে নদী।

সমাপ্ত

boierpathshala.blogspot.com